KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : ৫০৮/২, যোধপুর পার্ক, কল-৬৮
Collection : KLMLGK	Publisher : সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত
Title : বিভাব (BIVAV)	Size : 5.5"x8.5"
Vol. & Number : 19/3 19/4 20/2 20/4	Year of Publication : Feb - 1998 May - 1998 Oct - 1998 June - 1999
	Condition : Brittle / Good ✓
Editor : সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

এই সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ

ইলিয়ট সম্পর্কে বহু চাঞ্চল্যকর তথ্য সহ সারা পৃথিবীর ইলিয়ট বিশেষজ্ঞদের
অভিনন্দনধন্য চিন্ময় গুহর গবেষণা পত্রের বাংলা সারসংক্ষেপ,
মহাশ্বেতা দেবীর নাটক 'আজীর', প্রশ্নকর্তা হিসাবে বিদ্যাসাগর,
দিনেশচন্দ্র সেন - শিক্ষক হিসাবে রবীন্দ্রনাথ বা পাঠ্যসূচি প্রণয়নে বঙ্কিমচন্দ্র
কেমন ছিলেন - এই সব মহামণীষিদের সঙ্গে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্ক
সম্প্রতি প্রয়াত গীনস্‌বার্গ সম্পর্কে একটি নতুন মূল্যায়ন

ও

আরো বহু আকর্ষণীয় রচনা

বিভাব

সম্পাদক :
সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

বিশেষ শীতকালীন সংখ্যা

বিভাব

১৪০৪

জনগণের
আশা আকাঙ্ক্ষার
সঙ্গে একসুরে বাঁধা
ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া
আপনার ব্যাঙ্ক

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

বিভাব

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক

বিশেষ শীতকালীন সংখ্যা ১৪০৪

সূচি

প্রবন্ধ

এলিয়টে ফরাসী ঋণ ও কিছু অনিবার্য প্রশ্ন ।। চিন্ময় গুহ : ১

প্রথম ভাবনা, শ্রেষ্ঠ ভাবনা : অ্যালেন গীনস্‌বার্গ ।। অমিতাভ চৌধুরী : ৬৯

প্রসঙ্গ : মানুষ নির্মাণ ।। অরুণ মুখোপাধ্যায় : ৫২

অগ্রন্থিত রচনা

লেখক বনাম পাঠক ।। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত : ১২

নাটক

আজীর ।। মহাশ্বেতা দেবী : ১৫

সঙ্কলন

বাঙালীর অতীত শিক্ষা জীবন ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় : ২৮

পুরাতনী

আমার খাতা ।। ক্রোড়পত্র ইন্দিরা দেবী (কল্যাণী দত্তর ভূমিকা সহ) : ৮১

অনুবাদ গল্প

দিশাহারা ।। মূল রচনা : কমলেশ্বর ।। অনুবাদ : অসীম চৌধুরী : ৫৭

সম্পাদকমণ্ডলী :
পবিত্র সরকার। বন্দনা সান্যাল। চন্দ্রশেখর রুদ্র। ধ্রুবজ্যোতি মণ্ডল।
দেবীপ্রসাদ মজুমদার। সাধন সরকার। প্রদীপ দাশগুপ্ত।

সম্পাদক :
সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

প্রধান যোগাযোগকেন্দ্র ও লেখা পাঠাবার ঠিকানা :
সম্পাদকীয় দপ্তর
'বিভাব'
৫০৮/এ, যোধপুর পার্ক। কলকাতা - ৬৮

প্রচ্ছদ : রনেনআয়ন দত্ত

অলংকরণ : শ্যামল সেন

মূল্য : কুড়ি টাকা

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত কর্তৃক ৫০৮/এ, যোধপুর পার্ক, কলকাতা - ৬৮ থেকে প্রকাশিত এবং বর্ণনা, ৬/৭ বিজয়গড়, কলকাতা - ৩২ ও দি শিল্প মুদ্রণ, নিউ বালিগঞ্জ, কলিকাতা - ৩৯ হইতে মুদ্রিত।।

সম্পাদকীয়

বিভাবের সপ্ততম সংখ্যা প্রকাশিত হলো। বাইশ বছর আগে যার যাত্রা শুরু হয়েছিল তার প্রাণশক্তি আজও অটুট। এটা সম্ভব হয়েছিল প্রয়াত সম্পাদক আরতি সেনগুপ্তর অকৃপন অর্থানুকুল্যে ও প্রণোদনায়। তাঁর প্রয়াণের পর এই কাগজটিকে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব আমাদের আরো বেড়েছে। বিভাবের যে বৈশিষ্ট্য শুরু থেকেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল আমাদের বিশ্বাস ভবিষ্যতেও তা বজায় রাখতে পারবো।

প্রায় প্রতিসংখ্যান্তেই আমরা বর্তমানের সঙ্গে অতীতচারণাও করি। গবেষণামনস্ক পাঠকের কাছে এই কারণেই বিভাবের একটি বিশেষ সমাদর রয়েছে। বর্তমান সংখ্যার সিংহভাগই পুরাতনের স্বর্ণসম্পদকে নতুন করে স্মরণ করেছি আমরা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, যার সঙ্গে একদা বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও দিনেশচন্দ্র সেনের মতো মহামনীষারা যুক্ত হয়েছিলেন, তার একটি নির্বাচিত আকর্ষণীয় বিবরণ এ সংখ্যার গৌরব বৃদ্ধি করবে।

রবীন্দ্রোত্তর যুগের অন্যতম মাননীয় কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তর অগ্রন্থিত ক্ষুদ্রায়তন অথচ অনুভববেদ্য রচনাটিও উদ্দীপক।

রবীন্দ্রপরিবারের সঙ্গে পারিবারিক সূত্রে সম্পর্কিত ইন্দিরা দেবীর অতি অল্পবয়সে রচিত 'আমার খাতা' রচনার নির্ভার সারল্য আমাদের মুগ্ধ করে রাখে। এ রচনার নির্বাচিত অংশ প্রকাশিত হলো। ইনি কিন্তু প্রমথ চৌধুরীর জায়া ইন্দিরা নন!

এ সংখ্যার প্রধান আকর্ষণ সম্ভবত চিন্ময় গুহর ' এলিয়টের ফরাসী ঋণ ও কিছু অনিবার্য প্রশ্ন '' রচনাটি। বিদেশে ইংরেজিতে প্রকাশিত হচ্ছে। এই বিস্ফোরক রচনাটি বাইরে প্রকাশিত হবার আগেই তার এক সারসংক্ষেপ প্রথম প্রকাশিত হলো বিভাবে। লেখককে কৃতজ্ঞতা জানাই। মহাশ্বেতা দেবীর বিরল নাটক '' আজীর'' এ সংখ্যার অন্যতম আকর্ষণ।

সকলেই বলেন লিটল ম্যাগাজিনগুলি লেখকসৃষ্টির সূতিকাগার। লেখকপ্রতিভার প্রথম লক্ষণ এখানেই চিহ্নিত হয়। তবে যত দিন যাচ্ছে ততই মনে হচ্ছে লিটল ম্যাগাজিন অভিধাটি এই সব সাহিত্যপ্রধান কাগজগুলির সঠিক পরিপূরক হচ্ছে না। এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আরো সুদূরপ্রসারী। বিদেশের অনুসরণে বুদ্ধদেব বসু কর্তৃক প্রথম ব্যবহৃত এই 'লিটল ম্যাগাজিন' নামের সাহিত্যপত্রগুলি এখন যেন আর তার পূর্ব মর্যাদায় স্থিত নেই। অন্তত বইমেলা কর্তৃপক্ষের কাছে তো নেই-ই। না হলে বইমেলাকে কেন্দ্র করে যে সব কাগজ বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে, তাদের প্রতি বইমেলার পরিচালকমণ্ডলী এতটাই উদাসীন যে মেলার প্রথম দুই দিনেতো নয়ই, তৃতীয় দিনের অপরাহ্নের আগে তারা তাদের জায়গা দিতে পারলেন না কেন? অথচ গতবারের মেলায় অগ্নিকাণ্ডের পর প্রায় অবিশ্বাস্য দ্রুততায় রাতারাতি যেভাবে লিটল ম্যাগাজিনগুলিকে যোগ্য সম্মানের সঙ্গে জায়গা দেওয়া হয়েছিল, তার জন্য বাঙালী

পাঠক শুধু নিকট নয়, দূর ভবিষ্যতেও তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের কাছে চিরঋণী হয়ে থাকবে। মেলা কর্তৃপক্ষকেও আমরা অকুণ্ঠ সাধুবাদ জানিয়েছিলাম এর জন্য। কিন্তু লিটল ম্যাগাজিনের ক্ষেত্রে এবারের ঢিলেঢালা ভাবটি আমাদের ব্যথিত করেছে। সেই সঙ্গে ভবিষ্যতে বইমেলা ও লিটল ম্যাগাজিনগুলোর সম্পর্ক শেষ অবধি কি দাঁড়াবে সে বিষয়ে সন্দিহানও করে তুলেছে।

এ বছরে জীবনানন্দ দাশের শতবর্ষপালনের সূচনা হয়েছে। এই উপলক্ষে কবির ওপর বিভাবের একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হবে বহু অন্যপূর্ব তথ্য ও তত্ত্ব এবং মানুষ জীবনানন্দের এক উপভোগ্য প্রতিবেদনসহ। সম্পাদকমণ্ডলীতে থাকবেন জীবিতকালীন জীবনানন্দের অন্যতম ঘনিষ্ঠ সুহৃদ কবি অরবিন্দ গুহ ও ভূমেন্দ্র গুহ।

দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়া এখন ভূতগ্রস্থ। কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রক নেতাদের দেখলে মনে হয় যে কোনো শ্রেণীতে ফেলার অযোগ্য এরা কারা? যারা ভারতবর্ষের মাটি মানুষতো দূরস্থান, দেশের মানচিত্র সম্বন্ধেও সম্যক অবগত নয়, তারাই শুধু পারিবারিক সূত্রের ক্ষেত্রে বা যোগাযোগের কারণে কোন অর্থনৈতিক অনৈতিকতাকে চাপা দেবার হাস্যকর প্রয়াসে যা খুশি তাই বলার অধিকার পায়! বিদ্যাবোধহীন এই শিকড়হারাদের আর কতকাল আমরা নেতা হিসাবে মেনে নেবো আর নির্বাচনের নামে কোটি কোটি টাকার বিনাশ-প্রহসন শুধু দেখেই যাবো! জানিনা এই নির্বাচন ও তার পরবর্তী রাজনৈতিকক্রম অনতিকালেই আরো একটি নির্বাচনের সম্ভাবনার পথ প্রশস্ত করে দেশকেরসাতলের পথে ঠেলে দেবে কিনা! 'জানিনা' শব্দটি দুঃখের, কিন্তু এ-তাবৎকাল আমরা যা জানি তা হলো স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পরেও রাজনৈতিক নেতারা কোনো বিশ্বাস জাগাতে পারছে না!

বিনীত

বিভাব সম্পাদকমণ্ডলী

এলিয়টের ফরাসি ঋণ ও কিছু অনিবার্য প্রশ্ন

চিন্ময় গুহ

[টি. এস. এলিয়টের ওপর ফরাসি কবিতার প্রভাব বিষয়ে চিন্ময় গুহর গবেষণা - পত্রটি পাশ্চাত্যে সাড়া ফেলেছে। বলা হয়েছে, 'He is a strikingly natural writer of great Ancient - Mariner gifts : he grips one, he convinces.' এলিয়টের নিজস্ব প্রকাশনা-সংস্থা ফেবার অ্যান্ড ফেবারের পরিচালকের মতে, 'It seems certain to cause a rumpus sooner or later.' ইংরেজিতে এই বিস্ফোরক গ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়ার আগেই 'বিভাব' তার একটি সারসংক্ষেপ প্রকাশ করছে, যেখানে চিন্ময়ের মূল বক্তব্যের কিছুটা আভাস পাওয়া যাবে।

— সম্পাদক, 'বিভাব']

এই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে টি.এস. এলিয়ট নামে হারভার্ডের এক মুখচোরা দর্শনের ছাত্র প্রায় রাতারাতি ইংরেজি কবিতার খোলনলচে বদলে দিয়ে তাকে সমকালীন বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন। কবিতার বচনকে ভেঙেচুরে প্রায় শল্যচিকিৎসকের মতো নিপুণতায় তাকে পুনর্নির্মাণ করার এমন চোখ-ধাঁধানো উদাহরণ আর নেই। প্রচলিত প্রতিক্রিয়াকে অস্বীকার, আবেগ সম্পর্কে চাপা শ্লেষ, এক নতুন ঠান্ডা বাক্‌ভঙ্গি, ভঙ্গুর বস্তুজগৎকে ভাঙাচোরা চিত্রকল্পে ধরার চেষ্টা .... সবে মিলে তাঁর হাতে ইংরেজি কবিতা হয়ে উঠেছিল অভ্রান্তভাবে আধুনিক। পরবর্তীকালের লেখকদের ওপর তাঁর একক প্রভাব প্রায় কিংবদন্তীর মতো।

তাঁর বিস্ফোরক কাব্যভাষার আড়ালে যে একটি অতি-নিজস্ব, চমকপ্রদ ও বিতর্কিত কাব্যনির্মাণপদ্ধতি কাজ করছিল তা জানাতে এলিয়ট কখনো দ্বিধা করেননি। শুধু এপিগ্রাফের গুরুগম্ভীর উদ্ধৃতি নয়, কবিতার সর্বাঙ্গে নামাবলীর মতো অপরের বাক্য দেখে বিদগ্ধ পাঠকের মনে জেগে ওঠা কূট সন্দেহকে আরো উসকে দেওয়াই সঠিক পথ বলে মনে হয়েছিল তাঁর। তিনি জানিয়ে দিয়েছিলেন যে মৌলিকতাকে তিনি গুরুত্ব দেন না, 'search for novelty' (SW, পৃঃ ৫৭) একটি নিন্দনীয় জিনিস, 'ordered presentation' ও 'arrangement' -টই আসল রহস্য। বলেছেন,'Immature poets imitate, mature poets steal (SW, পৃঃ১২৫) ও 'No poet, no artist of any art has his complete meaning alone (SP, পৃঃ ৩৮). শেষ পর্যন্ত ১৯২২ সালে প্রকাশিত 'দ্য ওয়েষ্ট ল্যান্ড'-এর শেষে এক দীর্ঘ ও জটিল উল্লেখপঞ্জি জুড়ে দিয়ে (পরে অবশ্য বলেছিলেন পুরো ব্যাপারটা একটা বুজরুকি, পৃষ্ঠা বাড়ানোই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, OPP, পৃঃ ১০৯) উদঘাটিত করতে চেয়েছেন তাঁর কবিতার জন্ম-রহস্য, বোঝাতে চেয়েছেন ইটের পর ইট দিয়ে গড়া এই কোলাজধর্মী নির্মাণ একটা সচেতন ব্যাপার। বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় এলিয়ট তথা হিউম, ফ্লিন্ট, অ্যালডিংটন ও তাঁর নিজের দুঃসাহসিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রসঙ্গে এজরা পাউন্ড 'রাসায়নিক গবেষণাগার' কথাটা ব্যবহার করেছিলেন। এলিয়ট নিজেও তাঁর বিখ্যাত একটি প্রবন্ধে কাব্যনির্মাণকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে তুলনা করে জানিয়েছিলেন যে কবি একজন অনুঘটক মাত্র, তাঁর ব্যক্তিগত জীবনভাবনা সেখানে অনুপস্থিত। গবেষণাগারে যে বিচিত্র উপাদানের মিশ্রণ ঘটবে সে তো বলাই বাহুল্য।

এলিয়টের রচনায় 'অন্যে'র উপস্থিতি নিয়ে ইতস্তত গবেষণা হলেও (এ প্রসঙ্গে গ্রোভার স্মিথের নাম করতেই হয়) তাঁর প্রবল খ্যাতির সামনে শেষ পর্যন্ত তা ধামাচাপা পড়ে গেছে।

মোটের ওপর, মেনে নেওয়া হয়েছে যে দান্তে, এলিজাবেথীয় ও মেটাফিজিকাল কবিতের কাছে শিক্ষাগ্রহণ করলেও এঁদের প্রভাব কাটিয়ে উঠতে তাঁর সময় লাগেনি, এবং অচিরেই তিনি তাঁর নিজস্ব কণ্ঠস্বর খুঁজে পেয়েছেন। আমেরিকা থেকে আগত লাজুক ছোকরাটি হয়ে উঠেছেন ইঙ্গ-আমেরিকান কবিতার এক মহৎ প্রতিষ্ঠান।

তবু আলমারীর কঙ্কাল পাল্লা নাড়া দেয়। ১৯৪০ সালে ইয়েট্‌স্ - বিষয়ক বক্তৃতায় এলিয়ট বলে ফেলেন, The kind of poetry that I needed to teach me the use of my own voice did not exist in English at all, it was only to be found in French. OPP, পৃঃ ২৫২) ১৯৪৮ -এ, অর্থাৎ তাঁর অর্ডার অব্ মেরিট ও নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির বছর, এলিয়ট লেখেন, Without the tradition which starts with Baudelaire and culminates in Valery, my own work would be inconceivable.' (NTDC, পৃঃ ১১২) এগুলো কি স্বীকারোক্তি? এর উদ্দেশ্য কী? ভাষ্যকারদের ঠিক পথে চালিত করা? তাঁকে নিয়ে ভুল প্রশস্তির পাহাড় ক্রমশ স্ফীত হচ্ছিল বলে? নাকি কোনো গভীর অপরাধবোধ কয়েক দশক ধরে আধুনিক ইংরেজি কবিতার সবচেয়ে প্রভাবশালী পুরোধাটিকে কুরে কুরে খাচ্ছিল?

১৯৪৯ সালের ১৯শে জানুয়ারি ফরাসি বেতারে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এলিয়ট নিজেকে বোদল্যের - পরবর্তী ফরাসি কবিতার এক 'ক্ষুদ্র উত্তরসূরী' (petit heritier) বলে দাবী করেন।

তাঁর ওপর ফরাসি প্রভাবের এই স্বীকৃতির পরও ইঙ্গ-আমেরিকান সমালোচনা - সাহিত্যের স্থিতাবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়নি সম্ভবত তিনটি কারণে ঃ এক) সাহিত্যিক রাজনীতি (দুই) অন্য দেশ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে ঔদাসীন্য, যা যতটা অবচেতন হয়ত ততটাই সচেতন (তিন) ফরাসিভাষায় যথেষ্ট ব্যুৎপত্তির অভাব, ফরাসি সাহিত্য ও সাহিত্যের ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞতা। এলিয়টের বিকাশ-প্রক্রিয়ার ওপর যবনিকা না তোলার সাহিত্য-বহির্ভূত কারণগুলি সহজেই অনুমান করা যায়।

এলিয়ট - ভক্তেরা জানেন, ১৯০৮ সালের ডিসেম্বর মাসে হারভার্ড ইউনিয়ন লাইব্রেরীতে আর্থার সাইমন্‌স্ -এর 'দ্য সিম্বলিস্ট মুভমেন্ট ইন লিটারেচার' (১৮৯৯, ২য় সং ১৯০৮) বইটি এলিয়টের জীবনের গতিপথ বদলে দেয় ('It changed the course of my life', *Criterion* জানুয়ারি ১৯৩০)। এরপর এলিয়ট প্যারিস থেকে তিন খন্ড লাফর্গ (১৮৬০-১৮৮৭) রচনাবলী আনিয়ে নেন ও সম্পূর্ণ অন্য ধরনের কবিতায় হাত মকশ করতে শুরু করেন। আমেরিকাকে তাঁর মনে হয়েছিল 'মরুভূমি'র মতো, রক্তহীনতার অসুখে ভোগা তৎকালীন ইংরেজি কবিতা ছিল তাঁর কাছে অসহ্য। ফ্রান্সের অদম্য আকর্ষণে ১৯১০ সালে প্যারিসে উপস্থিত হলেন বাইশ বছরের যুবক, যাঁর জনৈক পূর্বপুরুষ ছিলেন ফরাসি (বাট্রান্ড রাসেলকে লেখা এলিয়টের মা'র চিঠি, ২৩শে মে ১৯১৬)। ঘর নিলেন লাতিন কোয়ার্টারের এক বোর্ডিং-য়ে, যেখানে তাঁর সঙ্গে থাকতেন জাঁ ভেরদ্যনাল (১৮৮৯-১৯১৫) নামে এক ফরাসি ডাক্তারীর ছাত্র, যাঁকে পরে তাঁর প্রথম কবিতার বই 'প্রুফ্রক অ্যান্ড আদার অবজারভেশন্‌স্' (১৯১৭) উৎসর্গ করবেন এলিয়ট। ভেরদ্যনালও লাফর্গের ভক্ত, এলিয়টেরই মতো, তিনিও সব সময় সঙ্গে রাখতেন লাফর্গের কবিতা ও গদ্যগ্রন্থ 'মরালিতে লেজাঁদের' । লাফর্গের আরেক অন্ধভক্ত আল্যাঁ ফুর্ণিয়ে (কিছুদিনের মধ্যেই 'ল্য গ্রাঁ মোন' নামক উপন্যাস লিখে যিনি ফ্রান্সকে শিহরিত

THE WASTE LAND

T. S. ELIOT

NAM Sibyllam quidam Cumis ego ipse oculis
meis vidi in ampulla pendere, et cum illi pueri
dicerent, Σίβυλλα, τί θέλεις ; respondebat illa,
ἀποθανεῖν θέλω

PRINTED AND PUBLISHED BY LEONARD
AND VIRGINIA WOOLF AT THE HOGARTH
PRESS HOGARTH HOUSE PARADISE ROAD
RICHMOND SURREY
1923

POEMS

by T. S. ELIOT

NEW YORK

ALFRED · A · KNOPF

1920

করবেন) -র কাছে ফরাসি শিখতেন এলিয়ট, ফুর্ণিয়ের শ্যালক তরুণ সাহিত্যরসিক ও লাফর্গ -প্রেমিক জাক রিভিয়েরের সঙ্গেও তাঁর আলাপ হয়। সেন নদীর ধারে দেখতেন হেঁটে চলেছেন আনাতোল ফ্রাঁস, কিনতেন আঁদ্রে জিদ ও পল ক্লোদেলের নতুন বই, আলোড়ন - সৃষ্টিকারী কবিতার কাগজ ' লা নুভেল রভ্যু ফ্রাঁসেজ ' ও 'কাইয়ে দ্য লা ক্যাঁজেন'। কলেজ দ্য ফ্রাঁস -এ আঁরি বের্গসনের বক্তৃতা শোনার জন্য কখনো কখনো পাঁচ ঘন্টাও অপেক্ষা করতে হয়েছে এলিয়টকে। কবিতা আর ফ্রান্স সমার্থক হয়ে গিয়েছিল তাঁর কাছে। একসময় ইংরেজি ছেড়ে শুধুমাত্র ফরাসিতে কবিতা লেখার কথাও ভেবেছিলেন তিনি।

তবু সায়েব সমালোচকেরা ভেবেচিন্তে এলিয়টের গোড়ার দিকের লেখায় লাফর্গের আত্মশ্লেষ ছাড়া বিশেষ কিছু পাননি। অথচ আজ এতদিন পরেও লাফর্গের কবিতা সংগ্রহ ওলটাতে ওলটাতে হাতপা ঠান্ডা হয়ে যায়! ১৮৮৮ সালে এলিয়টের জন্মের এক বছর আগে মৃত এক সাতাশ বছরের প্লুরিসি- বিধ্বস্ত ফরাসি তরুণ পুনর্জন্ম পেয়ে ফিরে এলেন এক ইওরোপ-প্রেমিক মার্কিনের মধ্যে?

আর্টের ছাত্রেরা যেভাবে মহৎ শিল্পীদের নকল করে মুন্সিয়ানা অর্জন করেন, এলিয়ট তাঁর তরুণ গুরুটিকে সেভাবেই অনুকরণ করতে করতে মোহজাল ছিঁড়ে আর বেরোতে পারেননি।

জ্যুল লার্গ আর টি. এস. এলিয়টের জীবন-সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি অনেকটাই এক। ভীরুতা ও আত্মরসিকতার দিকটিতে তাঁদের অদ্ভুত মিল। এলিয়ট যখন বলেন, 'In short, I was afraid', লাফর্গও তাই বলেন। রোম্যান্টিকতা ও রোম্যান্টিকতা-বিরোধিতার দোলাচলে দোদুল্যমান দুই কবির ভাষাভঙ্গিও একই ধরনের। এলিয়টের ছন্দ ও গদ্যকবিতার মুল ধাঁচ লাফর্গের থেকে নেওয়া। এলিয়ট তাঁর কাছেই শিখেছিলেন পুনরুক্তির যাদুকরী ক্ষমতা। তাঁর বিখ্যাত উদ্ধৃতিপ্রিয়তা - বিশেষ করে বিদেশী সাহিত্য থেকে - লাফর্গেরও একটি প্রিয় বাতিক।

এলিয়টের যেসব ধাক্কা দেওয়া পংক্তি পড়ে এক সময় ইংরেজি কবিতার পাঠকের হৃদস্পন্দন বন্ধ হয়ে যেত, আজও যায়, সেসব অনেক ক্ষেত্রেই ইংরেজিতে লাফর্গের সচেতন ও চেষ্টাকৃত অনুলিখন। যেমন ধরা যাক, সেই অসাধারণ দুটি লাইন 'Women come and go/talking of Michelangelo' লাফর্গের 'On les voit passer, repasser serieux ...deux femmes causent (One watches their coming and going, seriously.... two women talk) থেকে উঠে এসে থাকতে পারে। আর সম্ভবত মাইকেল এঞ্জেলো এসেছে লাফর্গের দা ভিঞ্চি থেকে। 'লাভ সং অব জে অ্যালফ্রেড প্রুফ্রক' - এ সন্ধ্যে নেমে আসার সঙ্গে অপারেশন টেবিলের তুলনা লাফর্গের কবিতায় সূর্যাস্ত ও কশাই - এর tablier (এলিয়ট 'টেবিল' বুঝে থাকবেন, যদিও ফরাসিতে 'তাবলিয়ে' শব্দের অর্থ পোশাক, 'এপ্রন') - র বর্ণনার সংহত ইংরেজি সংস্করণ। এলিয়টের 'tobacco trance' যাঁদের মুগ্ধ করেছে তাঁরা কজন জানেন যে এগুলো লাফর্গের শব্দ!

প্রুফ্রকের স্যাররেয়ালিস্ত পরিসমাপ্তি - মৎস্যকন্যাদের উল্লেখশুদ্ধ - লাফর্গের 'Pretudes autobiographiques'-এর পরিসমাপ্তির মোটামুটি মূলানুগ অনুবাদ বলা চলে। 'ওয়েস্ট ল্যান্ড' - এ যে সব পংক্তি পড়ে ('Goonight Bill, Goonight Lou. Goonight May. Goonight./Ta ta. Goonight. Goonight./Good night, ladies, good night, sweet ladies, good night, good night.') গুণীরা এলিয়টের ক্ষমতার তারিফ করেছেন তা নিঃসন্দেহে - শেক্সপীয়র থেকে

নয় - লাফর্গের গদ্যরচনা 'হ্যামলেট' থেকে সংগৃহীত। এলিয়টে পাগলের জেরানিয়াম নাড়ানোও লাফর্গের জেরানিয়মা থেকে এসেছে। এলিয়টের 'Remark the cat that flattens itself in the gutter' লাফর্গের রাস্তা-পেরোনো বেড়ালের (' un chat traverse la place') ইংরেজি সংস্করণ। 'পোট্রেট অব এ লেডি'তে 'correct our watches by the public cocks' ও হয়ত লাফর্গের লুকসাঁবুর পার্কের ঘড়ি থেকে ধার করা। আমি এখানে দুচারটি উদাহরণ দিলাম মাত্র।

শুরু থেকেই পরিভাষা ও তৈরি-করা শব্দ ব্যবহারের একটা ঝোঁক ছিল এলিয়টের। তাঁর কবিতায় phtistic, protozoic, anfractuous, arboreal, polyphilo - progenitive, origen, piaculative, wistaria, mocha প্রভৃতি শব্দ পড়ে যাঁরা থতমত খেয়েছেন, তাঁরা লাফর্গের plenipotentaire, zaimph, solfatare, argutial, spleenuosite পড়ে আরো অস্বস্তিবোধ করতে পারেন।

ঠিক তেমনিই 'ওয়েস্টল্যান্ডে'র ' Drip drop drip drop drop drop drop' লাফর্গের ` Klip klop klip klop' থেকে গড়া। অবশ্য এসবের চেয়েও যাঁ বেশি গুরুত্বপূর্ণ তা হল তরুণ লাফর্গের হৃস্ব কবিজীবনে যে বিবর্তন (গত সাত দশকে এলিয়টের একজন ভাষ্যকারও যা লক্ষ করেননি) আসছিল : আত্মশ্লেষ ও আত্মকরুণা থেকে যন্ত্রণার গহ্বর পার হয়ে অধ্যাত্মচেতনার দিকে, এলিয়টের দীর্ঘতর কাব্যপরিক্রমার বিবর্তনের সঙ্গে ('প্রুফ্রক' পর্যায়, 'ওয়েষ্ট ল্যান্ডে' ও 'হলো মেন' পর্যায় ও উত্তর - 'হলো মেন' পর্যায়) তা প্রায় নিখুঁতভাবে মিলে যায়। এমনকী 'অ্যাশ-ওয়েডনেজডে'-তে ধর্মের কাছে আত্মনিবেদনও লাফর্গের শেষ পর্যায়ের কাব্যের কথা না মনে করিয়ে দিয়ে পারে না।

এলিয়টের লাফর্গ-মুগ্ধতা এমন ব্যাপক ও গভীরভাবে তাঁর চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল যে বিশের দশকের গোড়ায় লাফর্গের বহিপ্রভাব কাটিয়ে উঠলেও ভূতগ্রস্তের মতো সারা জীবন ধরে তিনি তাঁরই প্রদর্শিত পথে হেঁটে গেছেন। অথচ একজন এলিয়ট বিশারদও তা দেখতে পেলেন না!

প্রথম থেকেই অব্যর্থ শরসন্ধানে অন্যের আবিষ্কারকে নিজের কাজে লাগিয়ে চূড়ান্ত সাফল্য পেয়ে গিয়েছিলেন টি. এস. এলিয়ট। শেষ জীবন পর্যন্ত এ-প্রবণতা তাঁকে ছাড়েনি। পরিণত বয়সেও 'দ্য ট্রায়াম্ফাল মার্চ'- এর শেষ ফরাসি পংক্তিগুলি তাঁর প্রিয় লেখক শার্ল মোরাসের *L'Avenir de l'Intelligence* (১৯০৫) থেকে কমা, ফুলস্টপ, প্রশ্নচিহ্ন পর্যন্ত তোলা। এলিয়টের গভীর দার্শনিক উচ্চারণ 'In my beginning is my end In my end is my beginning' খোদাই করা আছে তাঁর আদি গ্রাম ইস্ট কোকারের সেন্ট মাইকেলস গিজরি স্মৃতিফলকে। সেগুলি পড়তে পড়তে কোনো এলিয়ট - তীর্থযাত্রীর কি মনে পড়বে যক্ষ্মারোগে মৃত এক বিদগ্ধ তরুণের কথা, যাঁর নাম ব্রিস্তাঁ করবিয়ের, যাঁর 'এপিটাফ' কবিতা থেকে সম্ভবত ঐ লাইনদুটির জন্ম? করবিয়েরের (১৮৪৫-১৮৭৫) প্রতি অবশ্য এলিয়ট মৃত্যুর আগেও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন, কিন্তু জানাননি ঠিক কী ঋণ ছিল তাঁর কাছে। ঐ বিশ্ববিশ্রুত পংক্তি দুটি ছাড়াও এলিয়ট করবিয়ারের কাছে শিখেছিলেন তাঁর সেই ছুরির ফলার মতো ধারালো আইরনি, তাঁর পেটেন্ট হিসেবে পরিচিত সেই বিখ্যাত টাইপোগ্রাফিক স্টাইল।

করবিয়েরের Ay panneau o o o o থেকে এলিয়টের o o o o that Shakespeherian Rag এর জন্ম হওয়া মোটেই অসম্ভব নয়, ঠিক যেমন সম্ভব তাঁর

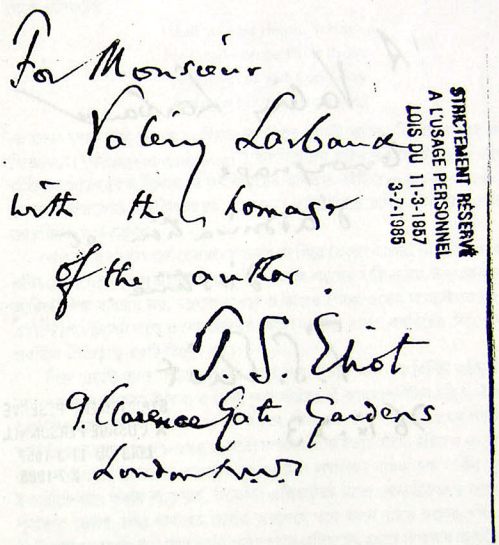

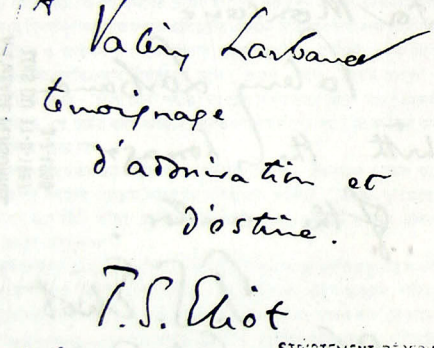

STRICTEMENT RESERVE
A L'USAGE PERSONNEL
LOIS DU 11-3-1957
3-7-1985

Lord Byron, gentleman - vampire
Hysterique du tenebreux
Anglais sec, casse par son rire
Son noble rire de lepreux
(Lord Byron, gentleman - ghoul
Hysteric of the somber
A Briton, dry and shaken
By his noble leprous laughter)

থেকে এলিয়টের

I shall not want Honour in Heaven
For I shall meet Sir Philip Sydney
And have talk with Coriolanus
And other heroes of that kidney

-র মতো স্তবক উঠে আসার। এলিয়ট ফরাসিতে যেকটি কবিতা লিখেছেন তার একটির শিরোনামে (' Melange adultere de tout ') করবিয়েরের লাইন ব্যবহার করেছেন। এলিয়টের ব্যক্তিগত সংক্রহের তালিকায় যে করবিয়েরের কবিতার বইটি (Les Amours jaunes) ছিল তা আমি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বড়লেয়ান লাইব্রেরীতে রক্ষিত ভিভিয়েন এলিয়টের ডায়েরিতে দেখে এসেছি।

বোদল্যে-র ব্যাপক প্রভাবের আলোচনায় না গিয়ে (কারণ এলিয়ট নিজেই একাধিকবার এবিষয়ে লিখেছেন) শুধু এইটুকু বলা যায় যে কেবল শহরের মালিন্য নয়, উপমার আকস্মিক আধিভৌতিক ব্যবহার নয়, যন্ত্রণার অবস্থা ও অশুভ থেকে শুভের মধ্যে উত্তরণের আর্তি এলিয়ট শিখেছিলেন দান্তে ও বোদল্যেরের কাছে। তাছাড়া লাফর্গ করবিয়ের তো বোদল্যের-প্রবর্তিত ঐতিহ্যের একটি বিশেষ ধারা।

কিন্তু 'ওয়েস্ট ল্যান্ড' পড়তে পড়তে বোদল্যের ছাড়াও অন্য এক বিশিষ্ট কণ্ঠস্বরের কথা মনে পড়েছিল আমার। ঐ কথ্য ও কেতাদুরস্ত স্টাইল, ঐ কসমোপলিটান চরিত্র, ঐ গতি, ঐ বহুভাষিক বচন, জটিলতার মধ্যেও ঐ স্বচ্ছতা ঠিক যেন বিশ শতকের প্রথম পর্বের কবি ভালেরি লারবোর (১৮৮১-১৯৫৭) মতো! লারবোর কবিতার প্রধান চরিত্র এ.ও. বারনাবুথ (যার সঙ্গে জে. অ্যালফ্রেড প্রুফ্রকের নামের মিল লক্ষণীয়) নামক এক মার্কিন যুবক, যে ইওরোপে এসে ধাঁধায় পড়ে যায়, অনেকটা এলিয়টেরই মতো। অনাত্মীয়তা ও শেকড়বিহীন শূন্যতার ভেতর, রুক্ষ্ম পাথরের ভেতর অবশেষে তার কানে আসে জলের শব্দ! ফ্রান্সের ভিশী শহরে ভালেরি লারবোর ব্যক্তিগত সংগ্রহে এলিয়টের স্বহস্তে সাক্ষর করা তাঁর দুটি বই দেখে (এলিয়ট ফরাসিতে লিখেছেন : 'To Valery Larboud, as a token of my admiration and esteem') আমি এলিয়টের ঋণ সম্পর্কে নিশ্চিত হই। পরে টি. এস. এলিয়টের গ্রন্থাগারের বইয়ের তালিকাতেও আমি লারবোর কাব্যগ্রন্থটি দেখেছি। ১৯২২ সালেই (যে বছর ' ওয়েস্ট ল্যান্ড' প্রকাশিত হয়) 'ক্রাইটেরিয়ন'-এর প্রথম সংখ্যার জন্য লেখা চাওয়ার সময় একটি

চিঠিতে এলিয়ট তাঁকে 'ইওরোপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মেধা' বলে স্বীকার করলেও 'ওয়েস্টে ল্যান্ডে'র দীর্ঘ উল্লেখপঞ্জিতে লারবোর কথা বেমালুম চেপে গেছেন।

এটা কি নিছক সমাপতন যে এলিয়টের প্রিয় ফরাসি কবিরা সকলেই এলিয়টেরই মতো যন্ত্রণা ও বিচ্ছিন্নতা থেকে আধ্যাত্মিকতার পথে আলোর সন্ধান করেছিলেন? হয়ত সকলে সন্ধান পাননি, তবু। শুধু কাব্যিক প্রকরণের নানা চমকপ্রদ অভিনবত্বের দিক নয়, যা এলিয়টকে এলিয়ট করে তুলেছে, তাঁর জীবনদর্শনের বড় একটা দিকও কি তাঁদের কাছ থেকে ধার করা? জীবনদর্শন তো অভিজ্ঞতার জঠর থেকে উঠে আসে, তা তো কেউ শেখাতে পারে না! তবে ঐ অসম্ভবকে কী করে সম্ভব করলেন এলিয়ট?

সব কৃত্রিমতা তাঁর কাব্যে মিলে গিয়েছেল অকৃত্রিমতার সঙ্গে। অন্যকে আত্মস্থ করতে করতে নিজেকে ক্রমাগত শিক্ষিত ও পরিবর্তিত করে তুলেছিলেন তিনি। কোনো একসময় ফাঁকিগুলি আর ফাঁকি থাকে নি। পল ক্লোদেলের (১৬৬৮-১৯৫৫) মহাকাব্যিক ধর্মোচ্চারণ অল্পবয়সী লাফর্গ-পন্থী এলিয়টের কাজে না লাগলেও বিশের দশকের শেষের দিকে ক্লোদেলীয় দীর্ঘ সাংগীতিক গদ্যই — যা ফরাসিতে verset বলে খ্যাত — হয়ে ওঠে তাঁর প্রধান উপজীব্য। তাঁদের কবিতার দৃশ্যগত (visual) মিল দিখলে চমকে উঠতে হয়। এলিয়ট-বিশারদেরা যখন ' মার্ডার ইন দ্য ক্যাথিড্রাল' ও ' ফোর কোয়ার্টেটস' এর নিজস্ব কণ্ঠস্বর সম্পর্কে নিঃসন্দেহ, সেই সময় অনিবার্যভাবে অন্য এক স্মৃতিজালে জড়িয়ে পড়েছেন কবি। ১৯৫৫ সালে ক্লোদেলের মৃত্যুর পর তিনি ফ্রান্সের'ফিগারো' কাগজে লেখেন : 'The impression that (Claudel) made upon my mind at that time is still very dear in my memory.' ক্লোদেলের 'cherche le centre' ও এলিয়টের 'the still point' - এর ভেতর প্রায় কোনো পার্থক্য নেই। পরম উপলব্ধির মুহূর্তে এই দুই ক্যাথলিক কবির (এলিয়ট ১৯২৭ সালে অ্যাংলিকান চার্চের সদস্য হন) মিল এ-শতাব্দীর কবিতার ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ক্লোদেলের ভাষার প্রসিদ্ধ অনুসারক স্যাঁ-জন পের্সের প্রতি এলিয়টের আকর্ষণের কথাও আমরা জানি।

১৯৩৩ সালে জনস্ হপকিন্স্ বিশ্ববিদ্যালয়ে তৃতীয় টার্নবুল বক্তৃতায় এলিয়ট যখন বলেন যে তাঁর কাব্যে 'ফরাসি প্রভাব তো কমেই নি, বরঞ্চ বেড়েছে' তখন সেকথার অর্থ বুঝতে পারেননি বা বোঝার চেষ্টাও করেননি কেউ। ফরাসি সাহিত্যে মূর্খ দুএকজন সমালোচক মালার্মের প্রভাব খুঁজেছেন!

এলিয়টের প্রিয় সমালোচক রেমি দ্য গুরমঁ (তাঁর তাত্ত্বিকতার সিংহভাগ যাঁর থেকে আহৃত) লিখেছিলেন : 'এক ধরনের নির্দোষ প্লেজিয়ারিজম্ আছে। ...স্মৃতি এক গ্রন্থাগার, যেখানে কিছু জিনিস সুন্দর, কিছু হতশ্রী, কিছু মুছে যায়। ... স্মৃতি যা অনুপ্রেরণা হয়ে ফিরে আসে'। (*Le probleme du style*, ১৯০২, পৃ ১৪২) অন্যত্র লিখেছেন : 'স্মৃতি এক গোপন স্নানপুকুর, যেখানে নিজেদের অজান্তে আমাদের অবচেতন এসে জাল ফেলে।' (*La culture des ideas*, ১৯০০, পৃ ৫১).

এলিয়টের মতো স্থিরমস্তিষ্ক, সজাগ ব্যক্তির পক্ষে পুরোটাই যে অবচেতনের ব্যাপার তা অবশ্য কিছুতেই বিশ্বাস্য নয়। গুরমঁ-র লেখাতেই এলিয়ট শিখেছিলেন : '(লেখকের) অনুকরণ করার অধিকার আছে, বিষয় ও ভাবনাচিন্তা আত্মীকরণের অধিকার আছে।.. কর্ণেই, মলিয়ের,

রাসিন, ভিক্তর য়্যুগো কেউ ধার জিনিসটকে ঘৃণা করেননি। সঠিক পথ খুঁজে পাওয়ার আগে বালজাক ইংরেজি উপন্যাসের নকল করেছেন। আলেকসাঁদ্র দ্যুমা আবার এক কাঠি বাড়া : তাঁর প্রথম নাটকগুলি এখান ওখান থেকে জুড়ে জুড়ে অসাধারণ দক্ষতায় নির্মাণ করা হয়েছিল।' (*Le problems du style*, পৃ ৩০৬) তাঁর প্রবন্ধে এলিয়ট মার্লো থেকে শেক্সপীয়ারের পংক্তি চুরি কিংবা মঁতেঞ থেকে পাসকালের আইডিয়া 'lift' (এলিয়টের শব্দ, EAM, পৃ ১৫০) করাকে প্রায় উচ্চকণ্ঠে সমর্থন করেছেন।

এসব কি সান্ত্বনা এলিয়টের? নাকি এটা তাঁর স্বঘোষিত কর্মসূচী? তিনিই তো বলেছেন, 'অপরিণত কবিরা নকল করে, পরিণতরা চুরি।' তবে তাঁর সৃষ্টির কী মূল্যায়ন করব আমরা? বচনের আন্তর্বয়নের এক অনবদ্য উদাহরণ হিসেবে তাঁকে পড়ব? নাকি তাঁকে অভিহিত করব এক নিপুণ সাহিত্যিক ক্লেপটোমেনিয়াক হিসেবে, যাঁর 'virtues were imposed upon him by his impudent crimes'? এক কালের বন্ধু রিচার্ড অ্যালডিংটনের অনুসরণ করে বলব 'এলিয়টের লেখায় যা কিছু ভাল তা তাঁর নিজস্ব নয়!'

অথবা এক চমৎকৃত 'pattern in the carpet' -এর সামনে দাঁড়িয়ে অভিভূত হয়ে যাব?

আসলে, তাঁর রচনাপ্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সৃজনশীলতা সম্পর্কে কিছু অমোঘ প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেন এলিয়ট। সেগুলিকে অগ্রাহ্য করলে তাঁর সৃষ্টিকর্মের মূল ভিত্তিটাই ধ্বসে যায়। আর ফরাসি কবিতার প্রতি তাঁর ঋণকে অস্বীকার করলে ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাসের প্রতিও সুবিচার করা হয় না।

[এটি একটি চারশ পৃষ্ঠার গবেষণা - গ্রন্থের সরলীকৃত কুক্ষিকা মাত্র। নিবন্ধটিতে এলিয়টের *The Sacred Wood* (১৯২০; ১৯৫২ সং), *Selected Prose* (১৯৫৫), *On Poetry and Poets* (১৯৫৭; ১৯৬৯ সং), *Essays Ancient and Modern* (১৯৩৬; ১৯৪৭) ও *Notes Towards the Definition of Culture* (১৯৪৮) - কে যথাক্রমে SW, SP, OPP, EAM ও NTDC বলে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম বইটির প্রকাশক মেথুয়েন,

লেখক বনাম পাঠক

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

[কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তর অগ্রন্থিত রচনা]

এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বজগৎ যেমন আলো ও ছায়ায় চিত্রিত, শ্যামধূসর সবজি-জগৎ যেমন আদা ও কাঁচকলায় বিযুক্ত, সাহিত্যজগৎ তেমনি লেখকও পাঠকে বিভক্ত। যাঁহারা কেবলমাত্র পড়েন, কিছুই লেখেন না, তাঁহারাই প্রকৃত পাঠক। আর যাঁহারা কেবলমাত্র লেখেন কিছুই পড়েন না, তাঁহারাই অকৃত্রিম লেখক। যাঁহারা লেখেন আবার পড়েন, এক কথায় লেখাপড়ার চর্চা করেন, সাহিত্যধর্মে তাঁহারা নিম্নাধিকারী। প্রাণীজগতে পাতিহাঁস, ভেক প্রভৃতি উভচর জীবের ন্যায়, নষ্টতাঁতি বৈষ্ণবের ন্যায় তাঁহারা হতবল ও অপাংক্তেয়। আর যাঁহারা লেখেনও না পড়েনও না সাহিত্যের কোন সংবাদ রাখেন না, তাঁহারা নিরপেক্ষ। তাঁহাদের পঞ্চায়েৎ দরবারেই সাহিত্যের শেষ বিচার। সমগ্রভাবে লইলে এই বিপুলা পৃথ্বীতে তাঁহারাই অনন্তকাল।

ছায়া না থাকিলে আলো নিরর্থক; কাঁচকলা ভিন্ন আদা অচল; পাঠক ভিন্ন লেখকও বিফল, তথাপি লেখক পাঠকের এই অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ অন্যান্য চিরন্তন দ্বৈত সম্বন্ধের ন্যায় দুর্জ্ঞেয়। আদিতে প্রকৃতি না পুরুষ, বীজ আগে না বৃক্ষ আগে, দই পরে না সন্দেশ পরে, দেশ বড় না রাজা বড়, রামে মরি না রাবণে মরি, শ্যাম রাখি না কুল রাখি, এই সব কঠিন সনাতন প্রশ্নের অবিসংবাদিত মীমাংসা যেমন অদ্যাপি হয় নাই লেখক পাঠকের সঠিক সম্বন্ধ বিচারও তেমনি অমীমাংসিত রহিয়া গিয়াছে। স্থূল দৃষ্টিতে মনে হইতে পারে অগ্রে লেখক পরে পাঠক। কারণ একজন না লিখিলে অন্যে পড়িবে কী? কিন্তু যাহা মোটেই লেখা হয় নাই, তাহা পাঠ করিবার শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিই তো পাঠক। আরও বিবেচনা করিয়া দেখুন মহাভারত অপেক্ষা বড় লেখা তো আজ পর্যন্ত বাহির হয় নাই। সেই মহাভারতকর্তা বেদব্যাস লেখক ছিলেন না পাঠক ছিলেন? সকলেই জানেন ব্যাসদেব অনর্গল শ্লোক আওড়াইয়া গিয়াছিলেন আর সিদ্ধিদাতা গণেশ চারি হস্তে কাগজ, কালি, কলম লইয়া মূর্তিমান টাইপ-রাইটাররূপে অবিরাম লিখিয়া গিয়াছিলেন, তবে তো মহাভারতের সৃষ্টি হইয়াছিল। সুতরাং বেদব্যাস যে লিখিতে জানিতেন না ইহার দ্বিতীয় প্রমাণ অনাবশ্যক; অথচ তিনিই যে মহাভারতলেখক ইহাও সুবিদিত। অন্যপক্ষে দেখুন, লিখিয়া মরিল বেচারী গণেশ, নাম হইল বেদব্যাসের, কারণ গজমুণ্ডপ্রযুক্ত গণেশ সে কথা ব্যক্ত করিতে পারিল না। অতএব আমি ঠিক বুঝিতে না পারিলেও মোটের উপর আপনারা বোধহয় নিশ্চয় বুঝিলেন যে লেখক পাঠকের সঠিক সম্বন্ধ নির্ণয় একান্ত দুরূহ ব্যাপার।

মোটামুটি দেখা যায় লেখক স্রষ্টা আর পাঠ দ্রষ্টা। জগৎসৃষ্টির মূলে ছিল নির্বিকার ব্রহ্মের অহেতুকী যশোলিপ্সা। 'আমি এক, বহু হইব'। সমস্ত সাহিত্য সৃষ্টির মূলেও লেখকের এই নিষ্কাম যশোকামনাই নিহিত রহিয়াছে। আমি নব নব সংস্করণে বহু-বধ্বা বিস্তৃত হইয়া বাজারে প্রকাশিত হইব, বর্তমানে ও ভবিষ্যতে লক্ষ লক্ষ পাঠকের চিত্তমুকুরে এক আমি রবির ন্যায় বহুরূপে প্রতিবিম্বিত হইব, এই অকারণ বিশ্বপ্রেমই সাহিত্যলীলার হেতু। সাধারণ লেখকের কথা ছাড়িয়া দিয়া আদি ঋষিকবির সৃষ্টির কথাই ধরা যাউক। ছাপার অক্ষরের রামায়ণের সুলভ সংস্করণ কলিকাতা মহানগরীতে বটতলা হইতেই প্রথম প্রচারিত হইল কেন? কারণ

আর কিছুই নহে। কবিগুরু ত্রেতাযুগে যখন তৎপ্রণীত রামায়ণ গানের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত করেন তখন তমসাতীরস্থ বটবৃক্ষ মূলেই তাহার মহলা বসিত। তখন মাসিক বা সাপ্তাহিক না থাকায় আদি কবিকে তরুণ লবকুশের সাহায্য লইতে হইয়াছিল। তাহাদের মাধ্যমে গ্রন্থখানি রামচন্দ্রকে উৎসর্গ করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই, যাহাতে রাজসভায় গীত হইয়া আজকালকার ব্যয়বহুল বিজ্ঞাপনের কার্য বিনা খরচে সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় তাহারও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বাল্মীকি তো কেবলমাত্র ঋষি ছিলেন না; তিনি একাধারে ঋষি ও কবি। সুতরাং রামলীলার মধ্য দিয়া নিজেকে প্রচার না করিয়া, এক বধ্বা না হইয়া, তাঁহার উপায়ন্তর ছিল না।

যেমন জগতে, তেমনি সাহিত্যেও স্রষ্টার হাতে সৃষ্টির নানা আকার ও প্রকারভেদ ঘটিতেছে। জগতে জেব্রাও আছে উষ্ট্রও আছে, ফুলও আছে কন্টকও আছে, এই বৈচিত্র্যই সৃষ্টির প্রাণ। আমরা বহুকাল হইতে জানি যে মধু ইচ্ছা করিবার জন্য ষট্‌পদ, ব্রণ ইচ্ছা করিবার জন্য মক্ষিকা ও তামাক ইচ্ছা করিবার জন্য ভদ্রলোকের সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু কি মহৎ উদ্দেশ্যে মশক সৃষ্টি হইয়াছে, কেনই বা সন্ধ্যার প্রাক্কালে লক্ষ লক্ষ প্রাণী কোন এক আর্দ্র পল্বলে জন্মগ্রহণ করিয়া মশারীবিহীন হতভাগ্য মানবশিশুদের অকারণ দংশনপূর্বক বিভুগুণ গান করিতে করিতে অচিরকাল মধ্যে ভবলীলা সাঙ্গ করে, ইহার তত্ত্ব আমাদের সম্পূর্ণ অবিদিত ছিল। বিজ্ঞানের কৃপায় এতদিনে আমরা জ্ঞাত হইয়াছি, নরদেহে ম্যালেরিয়ারূপী একটি কম্পমান তীব্র সত্যকে বহন করিয়া তাহার স্বাস্থ্যহানি করিবার জন্যই মশকের সৃষ্টি। এই আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গেই সিংকোনা বৃক্ষত্বক যে কেন এমন উৎকট তিক্তরসযুক্ত হইয়া সৃষ্ট হইয়াছিল তাহার মর্মও উদ্‌ঘাটিত হইয়া গেল। সাহিত্যেও এমনি সৃষ্টিবৈচিত্র চলিতেছে। সকল লেখকই স্রষ্টা। একটু তলাইয়া দেখিলেই বুঝা যায় কাহারও সৃষ্টি নিরর্থক নহে। ফুল ও কন্টক, মশা ও মশারি, ম্যালেরিয়া ও কুইনাইন পাশাপাশিই চলিবে। জগৎ বা সাহিত্য কোনটাই স্বাস্থ্যনিবাস হইবার জন্য সৃষ্ট হয় নাই। দেশের সকল সংযম ও সাধনা তো বধ্বদিন হইতে দেশ ছাড়িয়া সন্ন্যাসীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ বনে বাসা বাঁধিয়াছে; আবার স্বল্পাবশিষ্ট স্বাস্থ্যটুকুও যদি দেশ ছাড়িয়া সাহিত্যের গুহায় আশ্রয় লয় তবে দেশে বাস করাই অসম্ভব হইবে।

লেখক যদি স্রষ্টা, তবে পাঠক অবশ্যই দ্রষ্টা। দ্রষ্টাত্বও ব্রহ্মারই স্বরূপ। দ্রষ্টা ব্রহ্মা ঠুঁটো। স্রষ্টা অন্ধকারে হাতড়াইয়া যাহা হউক একটা কিছু সৃষ্টি করিয়া দ্রষ্টাকে বলেন, ' দেখত হে!' দ্রষ্টা নুলো হাতে তালি দিয়া বলেন, ' বেশ হয়েছে, বাঃ! কিন্তু সাদাটা কালো করে কালোটা সাদা করলে কি রকম হত বলা যায় না।' দ্রষ্টা অভ্রান্তচিত্তে পুনরায় প্রাণান্ত পরিশ্রমে সাদাকে কালোয় ও কালোকে সাদায় পরিবর্তিত করিয়া করুণভাবে দ্রষ্টার মুখের পানে চক্ষু মেলিয়া থাকেন। দ্রষ্টা ব্রহ্মা তখন হাই তুলিয়া তুড়ি দিতে দিতে তুরীয়ভাবে পৌঁছিয়াছেন। একবার দেখিয়াই বলেন, 'তাইতো হে, এটা ঠিক মৌলিক বোধ হচ্ছে না। যেন কার ফরমাসে গড়েছ মনে হচ্ছে। ফরমাসে সৃষ্টি হয় না; মৌলিক কিছু কর।' স্রষ্টা ব্রহ্মা তখন ক্রুদ্ধ হইয়াছেন কিন্তু তাঁহারও এক বধ্বা না হইলে উপায় নাই। অগত্যা ক্রোধ সম্বরণপূর্বক স্রষ্টা মৌলিক সৃষ্টি করিলেন। দেখা গেল, সৃষ্ট জীব চক্ষু দ্বারা শ্রবণ করে, ত্বক দ্বারা দর্শন করে, মাথা দিয়ে হাঁটে, নাসিকা দ্বারা আহার করে। দ্রষ্টা ঈষৎ চক্ষুরুন্মীলনপূর্বক বলিলেন, 'এ সব অস্বাভাবিক হচ্ছে। গত যুগে যা হয়ে গিয়েছে এ যুগে তুমি তা পারছ না।' স্রষ্টা অতিমাত্র রুষ্ট হইয়া বলিয়া উঠেন, "আমার মনের আনন্দে আমি যা সৃষ্টি করছি তা একান্ত আমারই; তোমার ভালোলাগা

মন্দ লাগায় আমার কিছুই যায় আসে না।' স্রষ্টা হাসিয়া ঘুমাইয়া পড়েন। স্রষ্টা আবার তাঁহাকে ঠেলা দিয়া জাগাইয়া বলেন, 'এইবার দেখত হে, বোধহয় তোমারও ভালো লাগবে।' স্রষ্টার তখন বয়স হইয়াছে। সৃষ্টির মধ্যে ধোঁয়া, কুয়াশা ও নীহারিকার ভাগ বেশী। স্রষ্টারও নেশা জন্মিয়াছে। চোখ না মেলিয়াই বলেন, 'বা: চমৎকার! কিছুই ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, অথচ কত গভীর, কত সুন্দর! এই তো চাই, তোমার সৃষ্টি আর আমার দৃষ্টি অনেকটা মিলে আসছে; আর একটু অপেক্ষা কর, তাহলেই ব্যস্ — ওম্ ওম্ বোম বোম শংকর।' তখন শংকরের চরণতলে পুনর্বার প্রলয়তাণ্ডব আরম্ভ হইয়াছে। ডমরুর ডিমি ডিমি ধ্বনির মধ্যে, মুদ্রিত নেত্রের ঊর্ধ্বে বিশাল ললাটপটে শিশু শশী নূতন সৃষ্টির আনন্দ পাইয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছে।

লেখক-পাঠক তত্ত্ব বিচার করিতে বসিয়া আদা ও কাঁচকলা হইতে প্রলয় পয়োধিতীর পর্যন্ত পৌঁছিয়াছি; ইহার অধিক চেষ্টা করা মানুষের সাধ্যাতীত। তথাপি যদি আপনারা আমার বক্তব্য বিষয় না বুঝিয়া থাকেন তবে আমার বা আপনাদের দোষ কিছুই নাই। দোষ আমাদের বাংলা ভাষার। যত শীঘ্র এ ভাষার মূলোৎপাটনমূলক সংস্কার আরম্ভ হয় ততই শ্রেয়:।

শনিবারের চিঠি, মাঘ ১৩৩৪

কৃতজ্ঞতা স্বীকার — সুব্রত রুদ্র

আজীর

মহাশ্বেতা দেবী

[আজীর প্রথম একটি গল্প হিসাবে লিখিত হয়েছিল। পরে মহাশ্বেতা নিজেই একে নাটকে রূপান্তরিত করেন। খুব বেশি অভিনয় হয়নি। নাটকটি পাওয়াও যায়না। আজ থেকে ১৮ বছর আগে বিভাবের শারদীয় সংখ্যায় এটি প্রকাশিত হয়েছিল। পাঠকদের কাছ থেকে গত কয়েকবছর ধরেই অনুরোধ আসছিল পুনর্মুদ্রনের জন্য। আমরা এ সংখ্যায় এটি প্রকাশ করলাম। মহাশ্বেতা এটি ছাড়া নাটক তেমন আর লেখেননি। তাই এ রচনার একটি বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে — সম্পাদক]

১

(মঞ্চ অন্ধকার। পর্দা উঠবে। একটি কণ্ঠ বিরতি দিয়ে ঘোষণা করবে 'আজীর শব্দের অর্থ অত্যন্ত অল্প টাকার জন্য আত্মবিক্রয়কারী দাস'। মঞ্চের একটি আলো পাতনের ওপর পড়বে। পাতন দর্শককে উদ্দেশ্য করে এখন কথা বলবে।)

পাতন : আমি আজীর। (বিরতি। চীৎকার করে) আমি আজীর হে-এ-এ-এ মাশায়রা। অ্যানে...এ...এ...ক দিন আগে মোদের অযোধ্যা পাহাড় দেশে ভীষণ আকাল হয়ছিল। তখন — (নেচে নেচে, ঢোল বাজাবার ভঙ্গীতে হাত ঠুকে ঘুরে ঘুরে গান গায়।)

প্রথমে দুরান্ত খরা খেতে শুকায় ধান
না খাএগ শতেক প্রাণী হারাল পরাণ
যত ধান যত চাল রাবণ শুঁড়ির ঘরে
আমার পিত্তিপুরুষ গোলক কুড়া জান বাঁচাবার তরে।

(বিরতি। তারপর আর্ত হাহাকারে, গদ্যে) নিজেকে আর পরিবার গৈরবী দাসীকে তিন টাকায় বিচে দিয়েছিল হে—! সকল বংশধররক্যাও বিচে দিল। (বিরতি। আঙুল নির্দেশ করে) এই এমুনি করে! (পেছনে রাবণ শুঁড়ি ও তিনজন লোক মশমশিয়ে ঢোকে, হাতে কাগজ। একজনের গলায় ঢোল। পাতন নির্বোধ উল্লাসে হাসে) দেখেন আপনারা, কেমুন করে মানুষ জন্মদাস হয়। যাই, আমি যেয়ে আমার পিত্তিপুরুষ গোলক কুড়া হইগা! (সে লাফিয়ে মঞ্চের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ায়। রাবণ ও অন্যান্যরা এ সময়ে মঞ্চে গিয়ে ও গোলককে ঘিরে ঘোরে, সমানে ঘুরবে।)

গোলক : (সচিৎকারে) মোরে কিনবে গো! মোরা স্তিপুরুষে লিজেদের বিচব। (নেপথ্যের উদ্দেশ্যে) হেথা আয় মাসী! (গোলকের স্ত্রী এসে দাঁড়ায়। গোলক ও পাতন একই অভিনেতা। গোলকের স্ত্রী ও পাতনের মনিবানী এক অভিনেত্রী। রাবণ ও মাতং এক অভিনেতা।)

রাবণ : লিজেদের বিচবে?
গোলক : কে কিনে মাশায়?
রাবণ : আমি।
গোলক : তবে বেঁচ্যে যাই।
রাবণ : পাট্টা লিখা আছে। সাক্ষী ডাকা আছে।
গোলক : মোরা স্তিপুরুষে বান্দা হব। মোদের সন্তান?
রাবণ : সেও বান্দা হবে।

গোলক : তার বংশ?
রাবণ : সবারে কিনে লিব।
(আনন্দে গোলক হাততালি দেয়। গান গায় ও সস্ত্রীক নাচে।)
গোলক : তুমার বড় দয়া হে তুমার দয়া বড়
অন্নচিন্তা বড় চিন্তা রইল না মোর কারো
কিন্তু মশায় টাকা দিবে কত?
রাবণ : (গান গেয়ে) এক টাকা! এক টাকা!
গোলক ও তার স্ত্রী : হল না হল না! (গান গেয়ে)
রাবণ : একটাকা এক সিকা।
গোলক ও তার স্ত্রী : হল না হল না!
রাবণ : (গদ্যে) লেঃ শালা! তিন টাকা দিব! জেবনে দেখাছিস তিন টাকা দেখতে কেমন?
গোলক ও তার স্ত্রী : (অবিশ্বাস। স্বপ্নাতীত) তি-ন-টা-কা!
রাবণ : তিন টাকা!
গোলক : (আনন্দ উন্মাদ) গিছি রে গিছে গৈরবী!
তিন টাকা দিবে মাশায়! (দর্শকদের উদ্দেশ করে) শুন বেটারা, আকালের পোকপতং যত!
(পয়ারে-সুর টেনে টেনে)
অকালে যমের শিঙা
বুল্যে মর্ বিঙা চিঙা
(চেচিঁয়ে হাসে) তোরা মরগা যা। আমি টেঁকে তিন টাকা লিব, জন্ম জন্ম বংশের সবে মাথায় তেল মাখবে, গায়ে বস্তর দিবে, পেটে ভাত রইবে সবার। আর লেংটাপরা আমানি মেঙে ঘুরে মরব না হে। (রাবণকে) আজীর পাট্টা আনা কর মাশায়!
রাবণ : এই লে:! শুন্!
(ঢোলকধারী লোকটি একপাশে দাঁড়ায়। সে ঢোলকে ঘা দেয় ও চেচিঁয়ে পড়ে। গোলক ও গৈরবী হাঁ করে শোনে। রাবণ ও অন্যরা approval-এ মাথা নাড়ে। ঢোলকধারী public announcement-এর ভঙ্গীতে পড়ে—)
ঢোলকধারী : শুন হে সর্বজন! (ঢোলে ঘা দেয় ও রাবণের হাত থেকে পাট্টা নেয়।) মহামহিম শ্রীযুক্ত রাবণ শুঁড়ি মহাশয়—
রাবণ : (ঘাড় বাড়িয়ে share করে পড়ে) বরাবরেষু লিখিতং!
ঢোলকধারী : গোলক কুড়া ওলদ চেতন কুড়া সাকিনা মৌজে মামুদচক মামুলে পরগণা অযোধ্যা সরকার বাজু হায়।
রাবণ : কস্য মুনিস্য আজীরি পাট্টা পত্রমিদম্ কার্যঞ্চ আগে আমি (গোলকের দিকে পা তোলে) আর আমার স্ত্রী গৈরবী নাম্নী দাসী (গৈরবীর দিকে পা তোলে) এই দুইজন।
ঢোলকধারী : কহত সালিতে ভবিষ্যৎ বংশসহসামিল অস্নেপহতী ও কার্জেপহতী ক্রমে নগদপণ তিন রূপেয়া পাইয়া (রাবণ গোলককে তিনটে টাকা coin দেয়) তোমার স্থানে স্বেচ্ছাপূর্বক বিক্রয় হইলা-আ-আ-ম। (ঢোল বাজায়)

রাবণ : (দ্রুত) ইতি তাং ১১ কার্তিক সন ১১০১ বাঙ্গালা মোতাবেক ১৫ সহর রবিনৌয়ন সন ৩৯ জলুষ।
ঢোলকধারী : শ্রীমতি গৈরবী নাম্নী দাসী কস্যাঃ (গৈরবী দ্রুত মাথা নাড়ে ও গোলকের হাত ধরে)
রাবণ : শ্রী গোলক কুড়া কস্য ছাপ সহি! (গোলকের বাঁ হাত ধরে ও বুড়ো আঙুল কাগজে টিপ ধরে।) লে! হয়া গেল।
গোলক : তবে আজীব হলাম?
রাবণ : হলি। চল্
ঢোলকধারী : তুমি যাও মাশায়। মোরা ওদের লিয়ে একটু রং করে লেই।
রাবণ : কর্‌গা যাঃ। (চলে যায়)
(ঢোলকধারী ও বাকি দুজন, গোলক ও গৈরবীকে আঙুল তুলে দেখিয়ে আধা নেচে গেয়ে।)
Trio : তিন টাকাতে বংশ বিচে দিলি?
গোলক : বছর বছর খরা হবে
বছর বছর আকাল হবে
আমি মোর বংশের হয়া কপাল বেদ্ধে কাজ করলাম!
Trio : (ভেঙায়) আজীর হলাম!
গৈরবী : (ঢোল বাজিয়ে) সকলে দেখ হে! আকালের দেশে জন্মে, আকালের কোলে বড় হয়ে, আকালের ভয়ে গোলক কুড়া বংশটারে আজী-ই-ই-ই র কর্যে দিল! (পর্দা নামবে)

২

(পর্দা সরাতে না সরাতে শোনা যাবে মারের ও আর্তনাদের শব্দ। মাতং শুঁড়ি হাতে পাকানো গামছা নিয়ে ঢুকবে।)
মাতং : ওঃ বেটার চ্যায়রা কি! সা জোয়ান! উরে মারতে আমার হাতটা বেতা হয়া গেল! (হেঁকে) টুক্‌চে ভেলি আর জল দাও গো! বেরোতে হবে!
(মনিবানী ঢোকে। শারীর যুবতী। মাতঙের প্রতি উদাসীন, জল দেয়।)
মনিবানী : লাও হে!
মাতং : ওঃ বেটা হাত বেথা করা দিছে
মনিবানী : পাতনরে মারছিলে?
মাতং : মারব না? বেটা মহাপাতকী!
মনিবানী : কেনী?
মাতং : তু আজীর। তুর পিত্তিপুরুষ তুরে বিচে দিছে। তা ই কথা বিসোঙর হয়্যে তু বিয়া বসবি, সোমসার চাইবি, ছেলার মুখ দেখবি?
মাটিতে থু থু ফেলে) আজীররে মিঞা দেয় কেউ?
মনিবানী : (তীক্ষ্ণ গলায়) কে বিয়া বসবে? উ আজীর?
মাতং : আর কে?
মনিবানী : উর মরণকাঠি না তুমার সিন্ধুকে? সি আজীর পাট্টা?

মাতং : (altert) সিদ্ধুকের কথায় তুমার কাম? (suspicious) হাত দাও না কি তুমি সিদ্ধুকে?

মনিবানী : (Blank eyes) দিলে?

মাতং : সি কি কথা বউ?

মনিবানী : (হাই তোলে) দিলে কি করবা তুমি? মারবা? আমি কি তোমার পুন্নশী যি মারবা মোরে?

মাতং : (seriously shocked) ছি ছি বউ! ই চন্তিরে তুমি শুদ্ধমনে রবে, তব ছেলা হবে, শোঁশানতলার মা বলাছে! আর তুমি উ লষ্ট মেয়েছেলার লাম করলা?

মনিবানী : লষ্ট মেয়ার ঘরে না গেলে ত তুমার মুখে ভাত উঠে না।

মাতং : তুমার তাতে কি?

মনিবানী : লাঃ! মোর আর কি? তবে ভাবি—

মাতং : (অস্বস্তি) কি?

মনিবানী : বড় তুমি চালাক শিয়ল হে! পাতনরে বুঝাও তার অজীরপাট্টা রাখা আছে; সে পলায় না। মোরে বুঝাও গায়ে গয়না—দিয়াছ—ধানজমি বাপরে দিয়াছ—মোবে ছেলা দিবে—জনাকে জানা বুঝায়ে লিজ্যে যেয়ো পুন্নশীর ঘরে লেংটা হয়ে লাচ!

মাতং : হেই দেখ! ছেলা তুর হবে বউ—

মনিবানী : (খেপে উঠেছে) তোমা হতে? তুমার ছেলা?

(মাতং ভয় পায়) তা হলে আগের দুটা বউ বাঁজা মরল কেনী? কেনী তুমি বুড়াটা, হিঝড়াটা, মোরে বিয়া করলে? মোর শরীলে আগুন, বুঝ না? (চেঁচায়) আ—গু—ন! কেনা আমি ত্যাত প্পর তাতে কাদাজলে গড়াই, বুঝ না? (চুড়ি বাজায়) হাতে চুড়ি! ইতে যোবতীর জ্বালা মিটে? (স্থির চোখে) ছেলা হবে! শোঁশানের মা বলাছে? ডাইন বুড়ি কি জানে?

মাতং : হবে হবে, (He wants to believe চেঁচিয়ে ওঠে) এই এত টাকা, মাস্টারের সাথে রিলিফ মাঙেছি, ছেলা লইলে খাবে কে? সব ভেস্যে যাবে?

মনিবানী : (সহসা হেসে ওঠে) হবে হবে! দশটা ছেলা হবে তোমার! লিজের কাজে যাও গা!

মাতং : বাবাঃ! যে দিনকাল! লিজের চক্ষুকে বিশ্বাস লাই। উ আজীরের জেবন মোর হাতে বান্ধা। লয় ত আমি কি উর জেম্মায় তোরে রেখে যাই?

মনিবানী : হা দেখ, তুই মুই কর্যে না।

মাতং : ভুল হয়াছে। তা দেখ, গণক বলাছিল তোমার পেটে মোর ছেলা হবে। আরে ব্বাপোরে! চারটা ছেলা! হো—ই উঠানে আঁতুড়ঘর তুলব, তালপাতা, তালের খুঁটা সামিল কর্যে রেখাছি। গিরি দাই খালাস করবে, তারে লথ দিব লাকে! আর পুরুলিয়া হতে হিজড়া আনব, লাচবে এমুন করে। (কোমর দোলায়। মনিবানী হাসে, মাতং, প্রশ্রয় পায়। হিজড়া কি রকম লাচে বল?

মনিবানী : তুমি বল!

মাতং : লা লা, কে দেখে ফেলাবে কুথা হতে! (হাসে) তবে আমি যাই গা! (কাচে এসে মনিবানীর চিবুক নেড়ে) শোঁশানমার কথা রেথা যায় না।

মনিবানী : লাও, এস গা! (হাই তোলে) কাজ কত! মাহিন্দাররা আসবে ভাতজল দিব। পাতনরে মেরে মোর কাজ বাড়ায়ে গেলা। লয় ত উ মোর সোনার ছেলা, কত কাজ করে দেয়। মাহিন্দাররা খেয়ে যাবে। বেচন খাবে, পাচন খাবে, তবে খাব দুটা!

মাতং : তুমি ত ক্যারেও কিছু করতে দেও না। মোর কি অসাধ? সজনখাল্লের মিঞা ভুনিদাসীরে খেদায় দিল্যে।

মনিবানী : লা, লা, উ মিঞা বিচকুন্নি। ঘরে আন মিঞা ঘুরে ফিরে সি আমার মনে ধরে না।

মাতং : আমি গা, বউ! হা দেখ, বেচন এলে পাতনের রঙ্গে যেমন পাকি মদ মালিশ করে। হারামীরে মেরাছি খুব। (মাতং বেরিয়ে যায়। মনিবানী এগিয়ে যায়)

মনিবানী : (মধুর স্বরে) পাতন! পাতন রে!

(পাতন ঢোকে, মুখ নিচু করে দাঁড়ায়)

মনিবানী : কুথাকে মেরেছে বাপ? (পাতনের গায়ে হাত বোলায়?

সতৃষ্ণ, প্রত্যাশী, মাংসের রমণী সে এখন। পাতন কিন্তু উদাসীন।)

পাতন : বিয়ার কথা বলতে মেরা দিল!

মনিবানী : তোরে কে বিয়া দিবে বাপ? দিলে আমি দিব।

লে, হেথা বস্। মোর কাছেকে আয়।

পাতন : লা, লা! তোমারে আমি মাত্তিভাবে দেখি।

মনিবানী : তবে কাছকে আয়!

পাতন : লাঃ!

মনিবানী : কেনী রে?

পাতন : কাছকে গেলে মনে মাত্তিভাব থাকে না।

মনিবানী : কি ভাব হয়?

পাতন : মোর রঙ্গ জুলে!

মনিবানী : মোর রঙ্গ যে নিত্য জুলে!

পাতন : (উত্তর দিচ্ছে না। নিজের কথার Continuation -এ বলে যাচ্ছে) "শোঁশানের মারে বলাছি! উনি মনিবানী, ওনারে মাত্তিভাবে দেখব, তা কাছে গেলে রঙ্গ জুলে কেনী? তিনি বলল, বাপ! নির্দোষীর কিছু হয় না। দেখ নাই? চড়কে ভক্ত্যারা নিদুষী নিপাপী মনে কুলকাঠের আংরা আগুন দিয়া হাঁটে, পা পুড়ে না। তুমি বাপ! মনে পাপ ভাব এলে রঙ্গ জুলে যদি, মনে ভক্তিভাব এনে রাগুন শেতল কর্যে লিবে।

মনিবানী : (নিশ্বাস ফেলে) লাও সনা! রঙ্গে মদ জল্য দেই! (বোতল আনে ও পাতনের গায়ে মদ মালিশ করে) মোর দেহে নানা ওগ পাতন! তুরে আজীর করাছে মনিব, মোরেও!

পাতন : কেনী?
মনিবানী : সি তুই বুঝবি না। (বিরতি। দীর্ঘশ্বাস) বুঝলে মোর ওগ সারত। রঙ্গ জুড়াতে।
পাতন : মনিব মোরে মারল! আজীর আমি, বিয়া দিবে না ক্যাও! মোর পিত্তিপুরুষ জল না পেয়া লরকে সামিল হবে গো!
মনিবানী : তুর বেথা আমি বুঝি।
পাতন : বুঝ?
মনিবানী : বুঝি না?
পাতন : কি জানি?
মনিবানী : তুরে বিয়া দিব আমি! (চোখ বোজে) বিয়া হবে তুর, জল সইবে আইয়তরা, বিয়ার গান করবে আইয়তরা, ছাঁইচতলে তুরে লাওয়াবে কলস কলস জলে— আমার বিয়ায় কিছু হয় নাই, সবের হয়। বুড়া বরে বিয়া! (নিঃশ্বাস ফেলে) মা কেন্দ্যে মাটি ধরাছিল! (বিরতি) তুরে বিয়া দিব আমি! কি রকম বউ আনব জানিস তু?
পাতন : (অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণে বন্দী) কি রকম?
মনিবানী : মোর মত মিঞা!
পাতন : তুমার মত!
মনিবানী : হাঁ, দলমলা মিঞা! দলমলে যৈবন!
পাতন : তুমার মত!
মনিবানী : (চোখ খোলে) লইলে মন উঠবে তুর?
পাতন : দলমলা মিঞা
মনিবানী : হাঁ রে! গাঁয়ে বেদা-বেদানী এসাছে জানিস?
পাতন : জানি। (উৎসাহিত) মনিব বলে পুলুস লয়ে উদের খেদা করাবে, উরা মদ ভাটি করে, মদ বিচে, তাথে মনিবের বেবসা কানা।
মনিবানী : উরা অষুদ জানে।
পাতন : কিসের অষুদ?
মনিবানী : যে যারে চায় তারে এলে দিবে, চুরির মাল খালাস করাবে, মরুঞ্চে পোয়াতি জেন্তা হবে, সি নানাবিধ অষুদ রে?
পাতন : হাই গ! আমি জানি ওরা মদ বিচে, লাচে, চেঙারি ডালা বিচে!
মানিবানী : তু বেদানীরে লয়্যে আয় এমন দুপারে।
পাতন : কেনী?
মনিবানী : অষুদ লিব।
পাতন : কিসের অষুদ?
মনিবানী : মনিবরে অষুদ করব। খাল ভরা চাবি লিতে ভুলে যাবে।
পাতন : (বুঝেছে। উত্তেজিত) তা বাদে?
মনিবানী : তুর আজীরপাট্টা চুরি করে লয়্যে তুকে দিব।
পাতন : দিবে?

মনিবানী : দিব-দিব-দিব-তিন কয়া!
পাতন : (উঠে দাঁড়ায়। হাসে) আজীর পাট্টা। ছিঁড়া বাতাসে উড়ায়ে দিব! ত্যাখন? (চেঁচিয়ে ওঠে উল্লাসে ও বলতে বলতে বেরিয়ে যায়) ত্যাখন আমি আজীর রব না হে.....ত্যাখন আমি মানুষ হব! ভুনিদাসীরে বিয়া করব! ভুনিদাসীরে! আজীর রব না হে...।

(পর্দা নামবে)

৩

(বেদেনী নাচছে ও গান গাইছে) পাতন দাঁড়িয়ে দেখছে)

বেদেনী : লোহার আসি লোহার কাসি লোহার বাসর ঘর তারি মধ্যে বাসরখাটে বেউলো লাখিন্দর। আ রে লখিন্দরের মা!
আত পুয়ালে কান্‌বে ত্যাখন, এখন কেন্দ্যে না! (গোল থামায়)
কি লো লাগর? আজ সাতদিন মোর পাছু ছাড় না, কি! বেদ্যা হতে সাধ গিয়াছে? (হেসে) তুই না আজীর? জন্ম গোলাম?
পাতন : মোক্ লয়ে চল্ তু।
বেদেনী : কুথা?
পাতন : যেথা বলবি?
বেদেনী : সেথা যাবি?
পাতন : যাব, যাব।
বেদেনী : মোদের খেদা করে কেন গাঁ হতে?
পাতন : জল লাই, শোঁশানের মা জল লামাবে, তা গুপত পূজা হবে বটেক। তাখন ভিনদেশী রইলে মন্তর লষ্ট।
বেদেনী : কি পূজা?
পাতন : (হেসে) সে অঙের পূজা হে! লষ্ট মাগী পুন্নশশী? তারে দেখ নাই?
বেদেনী : সে যে মোর গায়েক গো! তার লাগররা ছিনামিনা করে, শরীল এলে পড়ে। তারে অষুদ দিলাম!
পাতন : মুনির মারে কি অষুদ দিলা?
বেদেনী : (হেসে ঢলে পড়ে। নাচে গানে বলে) তুমারে বশ করবে, তুমা হতে ছেলা লিবে আ গো। গিজদা গিজং।
পাতন : (নাচে ও গানে বলে) হেই, চুবো যা! হেই চুবো যা! তারে মাত্তিভাবে দেখি!
বেদেনী : তুকে তার মনে ধরাছে।
পাতন : হেই, চুবো যা!
বেদেনী : তো হতে তার ছেলা হবে!
পাতন : (কানে আঙুল ও নাচ) শুনব না, শুনব না।
বেদেনী : লয়ত তোরে বাণ মারা কর্যে দিবে বেশ করবে, ডাঙর মাগী, তোর পারা যৈবন!
পাতন : (গদ্যে) তারে কে চায়?

বেদেনী : (গদ্যে) তবে?

পাতন : তু মোরে লিয়ে চল্।

বেদেনী : আজীর লয়ে কুথাক্ যাব? যেথা যাবি তোরে সেথা হতে লয়্যে এসে ডাং মারা করবে।

পাতন : তুরে দেখ্যে আমি পাগল হয়াছি হে! (নিজেকে সবিস্ময়ে) কেন হলম? উ মুনিব মা মোর রঙ্গে রঙ্গ ডলে মোরে জ্বালায়ে রাখে। তাথে তুরে দেখে পাগল হলম।

বেদেনী : একে আজীর! তায় পাগল!

পাতন : চ, চল্যে যাব!

বেদেনী : (Takes him seriously) কুথা?

পাতন : ঘর করব, ছেলা হবে, পিত্তিপুরষকে জল দিব।

বেদেনী : তু আজীর!

পাতন : ঘর করব, ছেলা হবে, পিত্তিপুরুষকে জল দিব।

বেদেনী : খাবি কি? লাকি তু ক্যাঙাল পেটা লাগব?

পাতন : মনিবের য্যাত টাকা সব আমি আনি গুঁড়িখানা হতে। সি টাকা মনিব মারেও দেয় না। মুনিব মোরে টাকা দিবে। টাকা গেঁজে লয়্যে মুনিব মারে পওরা দিব। তা বাদে ভোম্ আতে পুন্নশশীর ঘরে মাতন করে এসে তবে মুনিব টাকা লিবে।

বেদেনী : কত টাকা?

পাতন : বিশ—পঁচিশ—পঞ্চাশ! ব্বাপো রে, ত্যাত টাকা তু জন্মে দেখিস নাই।

বেদেনী : টাকা লয়ে?

পাতন : আজ অমাবস্যা। আতে পুন্নশশী উদোম লেংটা হয়ে জল মেঙে দোরে দোরে ঘুর‍্যে বুলবে মাথায় সরা লয়্যে। তা বাদে সরা রাজার দীঘিতে রেখ্যে ঘরে ফিরবে। ত্যাখন কেও পথে বেরাবে না।

বেদেনী : তখন?

পাতন : তু যেয়ে দুবোই বাবার মাঠে দাঁড়াবি। আমি তোরে যেয়ে সাথ ধর‍্যে লিব। তা বাদে দুজনে পালাব।

বেদেনী : আজ!

পাতন : হাঁ। আ—মা—ব—স্যা—র আত!

(এখন মঞ্চ অন্ধকার হবে, পাতন ও বেদেনী দুদিক দিয়ে চলে যাবে। মলিন লাল আলোর বৃত্ত মঞ্চের এদিক থেকে ওদিক ছুটে বেড়াবে। যেন কাকে ধরতে চাইছে, পারছে না। আলোর বৃত্তের ঠিক বাইরে পুন্নশশী। তাকে স্পষ্ট দেখা যাবে না Suggestion সে নগ্নিকা। পুন্নশশী কাঁদবে, বিলাপ করবে, মাঝে মাঝে কথা বলবে। তার মাথায় ডালা। সে টলে টলে পড়ে যাচ্ছে।)

পুন্নশশী : আজ সকাল হতে উপাস থাকব—পালনী। তা বাদে সন্‌জেতারা হতে ভুল্‌কো তারা আতভোর ঘুরো বুল্‌ব। পারি না গো! তা জেনাও কাল রাতে তোরা মোরে ছিনামিনা করলি! (কেঁদে) লষ্ট মিঞার শরীল মনিষ্যের শরীল লয়?

ছিনামিনা করলি খালভরারা! তা বাদে নিরম্বু উপাস! জল ডাকা করি! (গান করে)।

ইঁদ আজা জল দাও গো! জল দাও!
দুরান্ত খরায় মাটি শুকায় হে! বতর কর
বেঙা বেঙির বিয়া দিব খেতে রুইব ধান
জল দাওগো ইঁদ আজা বাঁচাও পরান!

মা গো! মাজা বেথা, কাঁকালে বেথা। ছেলা শুধায় মা কুথাক্ যাবি? আর কুথা! লষ্ট মিঞা! (সহসা সচিৎকারে) লষ্ট মিঞা তা সবে এসে লাচিস কেনী বুকের পরে? আঁ? কেনী লাচিস? কেনী উঠানের ধুলা লয়্যে পূজা করিস? আকাল! খরা! সি ত জন্মের সাথী! লষ্ট মিঞা ওলাং হয়্যে জলে ডাকলে তবে জল পাস্ (ডেলাটা তুলে ধরে)। হড়পা বানে সব ভাসায়ে দাও ঠাকুর! সোম্‌সার ভেস্যে যাক! (নেপথ্যে ডিম্ ডিম্ শব্দ) হাঃ কি হল? ঢোল সোহর দেয় কে? আঁ?

(টেপে শোনা যায়)

কণ্ঠ : হোই আজীর পলায়। হোই আজীর পলায়। ধর্ ধর্ ধর্—হই হই হইয়া!

পুন্নশশী : গাঁয়ের সবে তবে বেরালি? (সভয়ে) শোঁশানের মা গো! গাঁবাসী পূজা অচ্ছুত্ করে দিল গো।

(পুন্নশশী চলে যায় ছুটে। মঞ্চ সম্পূর্ণ আলোকিত। লাল আলো। একদল লোক পাতনকে সামনে হাঁটিয়ে মার্চের ভঙ্গীতে ঢোকে। তারা গান গেয়ে কথা বলে। পাতন পড়ে যায়, মার খায়, আবার ওঠে, আবার তাকে হাঁটানো হয়, নেপথ্যে শোনা যায়, মার্ ঢিল, মার্ ইট! পাতন অদৃশ্য ঢিল খায় ও ছিটকে ওঠে।)

লোকেরা : (পাতনকে ঘিরে মারতে মারতে হাঁটায়। ভীষণ হিংস্র ও অমোঘ কণ্ঠ)।
আজীর তুই! আজীর তুই!
পলান্ নাই! পলান্ নাই!

পাতন : আজীর মুই! আজীর মুই!
আমার তরে পলান্ নাই!

সমবেত : জেবন নাই! বিয়া নাই!

পাতন : ছেলা নাই! সুখ নাই!

সমবেত : জন্মদাস! জন্মদাস!

পাতন : (সস্মিতিতে) জন্মদাস, জন্মদাস!

সমবেত : চেরকাল!

পাতন : চেরকাল!

সমবেত : যত কাল দেহে শ্বাস।

পাতন : জন্মদাস, জন্মদাস।

সমবেত : (পাতনকে মাঝে রেখে তার দিকে আঙুল দেখিয়ে উল্লাসে

সমবেত : (পাতনকে মাঝে রেখে তার দিকে আঙুল দেখিয়ে উল্লাসে হেসে)।
ভাবুন তুমার তরে লয় হে

বেদেনী তুমার তরে লয় হে!
যতকাল আজীর পাটা
ততকাল তুমি ঠুঠা
মাতং তুমার ভগবান হে!
বেদেনী তুমার তরে লয় হে—
ভোবন তুমার তরে লয় হে—
জেমন তুমার তরে লয় হে—

পাতন : হা তুমরা ছেড়ে দাও কেনী! বেদেনী মোর তরে— তুমরা জানলা কেমনে, আঁ?

সমবেত : মুনিব মা! মুনিব মা!
বল্যে দিল ধরতে যা!
আজীর পলায় ধরতে যা!

পাতন : (হা হা করে কেঁদে ওঠে) মাত্তি ভাবে দেখলম মুনিব মা গো!
মোরে ধরা করাল্যে?

সমবেত : (ওপর পানে মুখ তুলে)
মাতং শুঁড়ি গো তুমার আজী—ই —ই—ই—র!
হাজি — ই — ই — ই — ই — ই — ই — ই —র!

(মাতং ও মনিবানী মার্চ করে ঢোকে। জনতা পাতনকে দু পা ও দু হাতে ধরে উপুড় অবস্থায় তোলে — নিয়ে গিয়ে দুজনের পায়ের ওপর মাথাটা রাখে)

মাতং : পলাতে সাধ গিয়াছিল? (পা তোলে, ফ্রিজ জনতা গলা বাড়ায়, সাগ্রহভঙ্গী, Torture দেখবে, ফ্রিজ। মনিব মা এগিয়ে আসে।)

মনিব মা : বেদেনীর সাথে যাব! ভোবন দেখব! জেবন সাথক করব ছেলা হবে, কোলে লাচাব!

পাতন : মুনিব মা হে!

মনিব মা : মোর বুকে চিতা জ্বলে রে খালভরা! মুই পলাই? (জনতাকে) দড়ি দিয়ে পাছুড়ে বাঁধ, ছেঁছুড়ে লয়ে চল। উঠানে খুটায় বেঁধে আখব! পিত্তিপুরুষ তোরে জন্মদাস করে দিয়াছে তা জানিস? উঠানে বেঁধে তোরে লতুন গামছা দিয়ে মারব। আমার বড় সাধ তুর লৌ দেখি! তোর লৌয়ে হাত আঙা কর্যে তবে নিদ্দা যাব।

সমবেত : (পাতনকে তোলে) মোরা দেখব হে! খরায় আকালে জেবন জ্বলে। ভোবন জ্বলে। কতকাল লৌ দেখি না, দুয়ার খুঁচাই না, মইষ বলি দিই না, আজীরের লৌ দেখব হে!

(টেপে বহু কণ্ঠ : মোরা দেখব, মোরা দেখব, আ:! বান্ধা হয়া — আজীর মার খাবে দেখব হে! পাতন পশুর মত আর্তনাদ করে।)

৪

(টেপে প্রবল ঝড় ও বৃষ্টির শব্দ। বাতাসের গর্জন। পাতন হাতে মুখ ঢেকে পড়ে আছে। মনিব মা ঢোকে। সতর্ক পদক্ষেপ, গা চাদরে ঢাকা থাকবে।)

মনিব মা : (মধুর, ব্যগ্র কণ্ঠস্বর) পাতন! পাতন! পাতন রে!

পাতন : (অভিমানে গাঢ় গলা) আমি কথা কব না!

মনিব মা : বড় লেগেছিল তুর? দেখ, যিদিন তুরে মারা করাছি, সিদিন হতে দুদিন মুখে কুটি কাটি নাই!

পাতন : কেনী?

মনিব মা : মনস্তাপে! তু মোর জেবন, তু মোর মরণ, তা তু বুঝলি না!

পাতন : কড়কা বাজ হাঁকে, ইঁদ আজার হাতি শুণ্ড উঠায়ে জল ঢালে, লদীতে হড়পা বান, এমন আতে তুমি হেথা কেনী?

মনিব মা : তুরে লয়ে যাব বল্যে।

পাতন : (উঠে বসে) কুথা? (ভাল করে দেখে) দেখ মনিব মা বড় দুজ্জোগা আত! এমুন আতে মোর পিত্তিপুরুষ ডাকে পাতন! জল দে! পাতন! জল দে! মোর দেহে বশ লাই। মোর লৌয়ে রাগুন জ্বলে, তুমি হেথা হতে যাও!

মনিব মা : (এই কথাই শুনতে চেয়েছিল) তুরে লয়্যে যাব!

পাতন : কুথাক?

মনিব মা : ভোবন অ্যানেক, অ্যানেক বড় — তু যে বলিস?

পাতন : এমুন আতে দুবোই বাবা শ্বাস ছাড়ে, ডাইন-পিশাচ শ্বাস পায় না, তারা বা-বাতাসে চুল এলায়ে জেয়ন্ত মানুষের মুলুকে ফিরে। তুমি কে? (ভাল করে দেখে) এমুন সেজাছ?

(মাথায় হাত বোলায়)চুল বেঁধাছ (ঠোঁটে হাত বোলায়) পানের অসে ঠোঁট আঙা, (চাদর ফেলে দেয়) একি!

(মনিব মার সর্বাঙ্গে গয়না, অপরূপা সে, পাথরের দেবী প্রাণ পেয়েছে, চোখে গভীর ও অমোঘ আহ্বান)

পাতন : এ— —ত গয়না! এস — ব মনিবের সিন্ধুকে থাকে। তুমি কে? (নিচে দেখে) না, ছেমা পড়াছে য্যাখন, তুমি মনিব মা! (দু কাঁধে হাত রেখে গর্জায়) এমুন সাজে এলে মোর মন হতে মাত্তিভাব চলা যায়, লৌ গর্জায়, তুমি মোরে পাতকী করবে?

মনিব মা : চল মোর সাথে।

পাতন : চল্ — চল্ — চল্! কুথাক্ যাব? কুথা মনিব নাই, গাঁ বাসী নাই, তুমি নাই, আজীর পাটা নাই? কুথা এমুন দেশ আছে আজীরের লৌ দেখে খরপুড়া মানুষ লাচে না? লাঃ! কুথাক্ যাবক লাই! পিত্তিপুরুষ যা করাছিল — (কান পেতে বাতাসের সোঁ সোঁ শোনে, বাতাস (wailing like siren)

হুই, হুই শুন! পিত্তিপুরুষ সকল জনা জলের লেগো চিল্লায়। (মঞ্চের সামনে ছুটে এসে মুখ তুলে) শালো মড়াখিয়া শোশানবাসীর দল! অত তিষ্টা কেনী? খরা আকালের কোলে জনম, কোলে মরণ, অত তিষ্টা! (বাতাস wail করে) লাঃ! বিয়া করব না আমি। সিজবি না আজীরের বংশ আর। তু শালা গোলক কুড়া তিন টাকায় আজীর পাটা সই করা বংশের সকলের জন্মদাস করা গিছিস, আমি তোরে নির্বংশ করব! আজীর পাটার মরণ থাকে না যদি আমি মরে তারে

বেকল করব!

মনিব মা : (ধমকে ওঠে) পাতন!
(পাতন সামনে, শূন্য পানে মুখ তুলে কান্নায় কাঁপে ও বলে —
না! না! না! — মূক ভাষায়, ঘাড় নেড়ে়ে ।

মনিব মা : পাতন রে! আমি তুরে পাতকী করতে আসি নাই। খালাস করতে এসাছি।
(পাতনকে হাত ধরে টেনে আনে ঝাঁকায়, বিশ্বাস করায়) খালাস করতে এসাছিয

পাতন : (চোখ বোজে, চ'লে যায়, চোখ খোলে)মনিব?

মনিব মা : সি ঘরে লাই। জল হয়াছে বলে পুন্নশশীর ঘরে যেয়ে জুটেছে সব, খুব লাচ-গান- অঙের মাতন! ঘরে ফিরতে ত্যাতপ্পর আত! দুপারে চাবি সরাছিলাম, সিন্দুক খুলে সকল গয়না রঙ্গে পরাছি। সকল টাকা, তোর আজীর পাটা গামছা বান্ধা, পেটকাপড়ে বেঁধে নিয়াছি।

পাতন : লিয়াছ? আজীর পাটা লিয়াছ?

মনিব মা : লিয়াছি রে, চল্ তু! যদি বেচন এসে পড়ো সোম্বাদ দেয়, তোরে-মোরে মইষ কাটা করবে।

পাতন : চল তবে।

মনিব মা : চল্ দুবোইবাবার মাঠে যেয়ে তোরে দিব সব! তা বাদে আতে জঙ্গলে লুক্যে রইব। দিনভোর লুক্যে থেকে কাল সন্ঝের টেন ধরে মোরা পলাব। হুই পুরুল্যা হতে বাস চেপে পলাব মোরা।

পাতন : চল! যেথা লয়্যে যাবে সেথা যাব।

দুজনে হাত ধরে বেরিয়ে যায়। মঞ্চে ঘন ঘন বিদ্যুতের আলো। ওরা দুজনে অন্যদিকে ঢোকে। দুজনেই হাঁপাচ্ছে।)

মনিব মা : পায়ে পাথর বেজা লৌ বুঁঝায়।

পাতন : দাও আজীর পাটা দাও!

মনিব মা : আজীর পাটা লাই!

পাতন : (আতংকে চেঁচিয়ে ওঠে। পণ্ড হয়ে গেছে) আঁ?

মনিব মা : ই দেখ্ তু। গামোছা, (বের করে দেয়, ঝাড়ে়ে) ধুলা হয়ে গেছে করে। লাইরে পাটা!

পাতন : মিছা কথা! পাটা তুমার সিন্দুকে, মোরে মারা করবে বলে এখে এসাছ তুমি!

মনিব মা : পাতন রে! মোর কথা শুন্! (মিনতি) পাটা নাই তোর! সব ছিঁড়া গুড়া ধূলাটা রে! (কাতর) মোর পানে চেয়্যে দেখ! মোর মত দলমলে মিঞা পারি কোথা তু?

পাতন : মহাপাতকী করালে যদি, তবে মোর পাট্টা?

মনিব মা : পাতন.....!
(পাতন ওকে কথা শেষ করতে দেয় না, গলা টিপে ধরে, ঝাঁকায় ও গর্জায়)

পাতন : পাট্টা দে মাগী! বল কুথা চাবি! আমি লিজে দেখব! দে! দে! চাবি দে!
(মনিব মা পড়ে যায়, হাত তুলে বাতাস খামচে নিশ্চল হয়। পাতন ওকে

ঘাঁটতে থাকে! চাবি পায়। উঠে দাঁড়ায়! বাজ পড়ার শব্দ ও সমবেত কণ্ঠ নেপথ্যে।)

Tape : আজীর তুই! আজীর তুই!
পলান নাই! পলান নাই!
জেবন নাই ! ভোবন নাই!
আজীর তুই! পলান নাই!
(পাতন haunted , ভীত পশু)

পাতন : কে? কে? কে তুমরা? আছে আজীরের তবে সব আছে। আজীর পাট্টা মোর মরণ কাঠি! তা ছিঁড়ে ফেলালে স— — ব... (কথা থেমে যায়। মাতং ও অন্যরা ঢুকে পড়ে।)

সকলে : ধরাছি, ধরাছি গো! (পাতনকে ধরে।)

পাতন : না! না! না!

মাতং : (বউয়ের ওপর আছড়ে পড়ে) বউ! বউ! বউ! (পাতনের দিকে চায়। হা হা করে কাঁদে) মেরে ফেলালি?

পাতন : আজীর পাটা দিল না কেনী?

মাতং : কুথায় আজীর পাটা? আমি দেখি নাই, মোর বাপ দেখে নাই, কবে ছিঁড়া গুঁড়া ধূলাটা গামোছায় — (তুলে ধরে) এই গামোছায় ছিল রে পাতন!

পাতন : আজীর পাটা ছিল না?

মাতং : না।

পাতন : ছিল না?

মাতং : না।

পাতন : (ভীষণ চীৎকার) কখুনো ছিল না?

মাতং : ন — না — না — রে।

পাতন : (মুখ তুলে চীৎকার) হা - হা -হা - হা-রে!

(সবাই চুপ, পাতনকে ছেড়ে় দেয়, বিরতি।)

পাতন : (শান্ত) লাও (হাত বাড়ায়) বান্ধা হাত, কি করবে কর। (অদ্ভুত হাসি) পাট্টা নাই, তবে কুনদিন আমি কিনা দাস ছিলাম না?

মাতং : না।

পাতন : ভোবনে সবার মত আমিও মুক্ত মনিষ ছিলাম, (। বিরতি) শুধা আমি ত জানতাম না। (মনিব মার দিকে চায়) এই দলমলা যৈবন আমারি ছিল! আমি জানতাম না। (সকলের দিকে চায়) দেরি কর কেনী? থানা অ্যানেক ধুর লয়? চল।

(সকলে ওর দিকে এগোয়।)

পাতন : শুধা আমি জানি নাই।

(পাতন মাথা তুলে হাত বাড়িয়ে দেয়, যেন রাজার মত কৃপা করছে।)

পর্দা নেমে আসে।

বাঙালীর অতীত শিক্ষাজীবন ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

[নানা নিয়ন্ত্রণ অসাধ্য কারণে আমাদের বর্তমান শিক্ষাধারার অনেকটাই আজ লক্ষ্যহীন। এর পরিপ্রেক্ষিতে সুদূর অতীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার ধরণ কি ছিল এই নিয়ে আমাদের আগ্রহ থাকা স্বাভাবিক। একদা, স্যার আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ স্তরে মাতৃভাষা বাংলায় স্নাতকোত্তর শিক্ষার প্রচলন করে এক মহান গৌরবের সূচনা করেছিলেন। প্রশ্নকর্তা ও শিক্ষাদাতা ও পরামর্শদাতা হিসাবে বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, দীনেশচন্দ্র সেনের মতো বরেণ্য গুণীদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত করতে পেরেছিলেন, যাঁরা শিক্ষা নামক মহান মানবিক ধর্মটিকে এক অবিশ্বাস্য উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিলেন।

প্রক্ষিপ্ত ভাবে তারই কিছু নিদর্শন ও স্মৃতিচারণ এখানে আমরা তুলে ধরলাম। পরীক্ষার প্রশ্নকর্তা হিসাবে বিদ্যাসাগরের ভূমিকা, রবীন্দ্রনাথের শিক্ষক-কর্তব্য পালন, বা পাঠ্যসূচি কি হওয়া উচিত এ বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের পরামর্শ, এই ধরণের আকর্ষণীয় সব নিদর্শন পাবেন পাঠক। প্রায় পঁচিশ বছর আগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে "সুবর্ণলেখা" নামে যে মহামূল্যবান সঙ্কলন গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল, এখানে মুদ্রিত অংশটি সেই সঙ্কলন থেকেই নেওয়া। এর জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও বাংলা বিভাগের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ — সম্পাদক।]

জীবনের পরমতম অধ্যায়

জীবনকৃষ্ণ শেঠ

জানুয়ারি ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দ। আমি তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙলা বিভাগে - (আমাদের সময়ে নাম ছিল ইন্ডিয়ান ভার্নাকুলারস্, বেঙ্গলী) ষষ্ঠশ্রেণীর ছাত্র। বিভাগীয় অধিকর্তা স্বনামখ্যাত বাঙলা সাহিত্যের প্রথম ইতিহাস লেখক প্রধান অধ্যাপক স্বর্গত দীনেশচন্দ্র সেন ডি.লিট. মহোদয় দীর্ঘকালব্যাপী কর্মসাধনার পরে কর্মক্ষেত্র হতে অবসর গ্রহণ করবেন। তাঁর স্থানে অভিষিক্ত হবেন বিশ্ববরেণ্য অমিতলাবণ্য ভারতপথিক ঋষিকল্প মহামানব রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং আর সহকারী অধ্যাপকপদে প্রতিষ্ঠিত হবেন অবসরপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্সী কলেজের দর্শনের অধ্যাপক রায়বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহোদয়।

মানবজীবনে ত্রিবিধ ঋণ পরিশোধ্য। গুরুঋণ, দেবঋষিঋণ ও পিতৃঋণ। গুরুঋণ শোধ করবার (সুযোগ পেয়েছি) — দুর্লভতম সৌভাগ্য লাভ করেছি। অপ্রাসঙ্গিক হলেও এ সুযোগ ছাড়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। পল্লীগ্রাম না হলেও হাওড়া সহর তখনও এতখানি সাবালক হয়ে ওঠেনি। আমি যে অঞ্চলে থাকতাম তা সহর হতে দূরে — শেষপ্রান্তে। সেখানে এমন অঞ্চলও ছিল যেখানে রাত্রে নিরাপত্তা বিপন্ন হতো। স্নাতক পরীক্ষোত্তীর্ণ হয়েও নানা কারণে স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে যোগদান করতে পারিনি। দু'বৎসর পরে সে সুযোগ পেলাম। চোখভরা স্বপ্ন,— বুকভরা ধ্যান নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যশ্রেণীতে এসে পড়লাম।

দীনেশবাবু বৈষ্ণব কবিতা পড়াবেন। স্বপ্ন কী সত্য হয়। অন্যত্র হয় কিনা জানিনে কিন্তু আমার জীবনে সত্য হল। বিশাল-আয়তনেত্র, কুঞ্চিত দীর্ঘকেশলকলাপ - দীর্ঘাকার পুরুষ - পোষাকের বাহুল্য নেই, বৈষ্ণব পদাবলীর একাংশ —

শৈশব যৌবন দুহু মিলি গেলা

শ্রবণকো পথ দুহু লোচন লেলা।। আবৃত্তি করতে করতে শ্রেণীকক্ষে প্রবেশ করলেন। অপূর্ব মিষ্ট কণ্ঠস্বর — উদাত্ত অনুদাত্ত স্বরিত স্বরঝংকারে পড়লো ভেঙ্গে। কৈশোর আর যৌবনের সন্ধিস্থলে এসে দাঁড়িয়েছেন রাধা অপূর্ব নারীমূর্তি। তাঁকে দেখতে পেলাম - রূপের তরঙ্গ উঠছে; আঁখিতট ভরি দৃষ্টির চঞ্চল সমুদ্র। আমি কোথায়। স্বপ্নময় মুহূর্ত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সব যেন দূরে সরে গিয়েছে।

অনেকদিনের কথাই মনে পড়ে। আর একদিনের কথা বলি। সেদিন পদাবলী আবৃত্তি করছেন -

এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা
কেমনে আইলা বাটে।
আঙ্গিনার মাঝে বঁধুয়া ভিজিছে
দেখিয়া পরাণ ফাটে।।

রসোদগারের এই পদটির তুলনা নেই অথবা চণ্ডীদাসের পদেই আছে। সেদিন বর্ষার সমগ্ররূপ, বর্ষার সমগ্র বেদনা হৃদয় আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। এই পদটির ব্যাখ্যা আমি করতে সাহস করিনি। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং 'ভারতী পত্রিকায় যে সুন্দর ব্যাখ্যা করেছিলেন তা উদ্ধৃত করি -

'এইপদের ইঙ্গিত এইরূপ - ভগবান আমাদিগকে কখনই ছাড়েন না; পাপের ঘোর অন্ধকারে যখন আমরা পড়িয়া থাকি; তখনও সেই পাপীর দুঃখের ভার নিজ মাথায় লইয়া তিনি তাহার জন্য অপেক্ষা করেন। সংসারাসক্তচিত্ত আমরা সংসারের সহস্র ঝঞ্ঝাট ছাড়িয়া তাঁহার কাছে যাইতে পারি না। তিনি দুর্গম পন্থায় দাঁড়াইয়া আমাদের জন্য প্রতীক্ষা করিতে থাকেন - পাপীর কাছে আসিতে কন্টকাকীর্ণ পথে তাঁহার পদতল ক্ষতবিক্ষত হইয়া যায়, তথাপি তিনি আমাদের ত্যাগ করেন না।'

এত কথা বুঝিনি। কিন্তু অনুভব করেছিলাম যে কাব্যের সৌন্দর্যলোকের পারে আছে আর এক লোক - যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ - এক অধ্যাত্মলোক। সেদিন, আচার্যদেবের পঠন-পাঠনে আমরা সে পথের যাত্রী হয়েছিলাম। তিনি চলে যাওয়ার পর অনেকক্ষণ পর্যন্ত বিস্ময়ের বিমুগ্ধতা কাটেনি। বৈষ্ণবপদাবলী পড়তে পড়তে আজও যখন সেই অধ্যাত্মলোকে প্রবেশ করি তখন নেত্রযুগে জাগে বহুদূর অতীতের একখানি চিত্র - অপাবৃত অধ্যাত্ম-আলোকে স্পষ্ট দেখতে পাই আচার্যদেব দাঁড়িয়ে আছেন, কণ্ঠে তাঁর সুরের প্রদীপ শিখা, তার দীপ্তমনেকবর্ণং, জ্যোতিঃতে তার ভগবানের চরণ সমুদ্ভাসিত। এ জীবনের পারে দাঁড়িয়ে সমস্তমস্তকে আচার্যদেবকে প্রণাম নিবেদন করি, বুঝতে পারি কেন উপনিষদে বলা হয়েছে 'আচার্যদেবো ভব'।

শ্রেণীসত্তা এখনকার মতো বৃহদায়তন ছিল না; পরিমিতকায়, ছাত্রছাত্রী মিলিয়ে সর্বসাকুল্যে দশবারোজন, পরিমিত পরিসর কিন্তু অপরিমিত আমাদের সম্প্রীতি ও সদ্ভাব। আচার্যগণের স্নেহ এবং নিবিড়তম সংস্পর্শ ও সাহচর্য অন্যান্য শ্রেণীর ঈর্ষার বস্তু ছিল। তাছাড়া আমাদের চোখে ছিল স্বপ্ন, আর আমরা আচার্যগণের কণ্ঠস্বরে এবং সুমিত ভাষণে অনাগত, অভাবিত দূর সৌন্দর্যের পদধ্বনি শুনতে পেতাম। বৌদ্ধগান ও দোঁহায় ফিরে গিয়েছি বাঙলা সাহিত্যের উদ্ভবের পরম লগনে -

ভবণই গহন গম্ভীর বেঁগে বাহী।
দু আন্তে চিখিল মাঝে ন থাহী।।
ধামার্থে চাটিল সাঙ্কম গঢ়ই।
পাকগামি লোঅ ভির তরই।।

আচার্যদেব বসন্তরঞ্জন বিদ্বল্লভের স্নেহমধুর কণ্ঠস্বরে যে ভবনদী চোখে পড়েছিল আজও তার গম্ভীরবেগ দৃষ্টি হতে মুছে যায়নি।

যাক্ আপাতত দীনেশবাবুর পঠন-পাঠনের কথাই শেষ করি অবশ্য অশেষের যদি শেষ থাকে।

দীনেশবাবু 'ময়মনসিংহ-গীতিকা' পড়াবেন। উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষায় স্তব্ধ হয়ে বসে আছি; চোখে অলকার স্বপ্ন, বুকের মধ্যে একটা তোলপাড় সুরু হয়েছে; সে যে আসে আসে, পায়ের ধ্বনি শুনতে পাচ্ছি। দীনেশবাবু শ্রেণীকক্ষে এসে দাঁড়ালেন, পড়াবেন 'মহুয়া'র বেদনামধুর কাহিনী। মহুয়ার সঙ্গে নদের চাঁদের দেখা হয়েছে। এ দেখা তো চোখের দেখা নয়। অন্তরের অন্তরতম সমুদ্রে ঢেউ উঠেছে। ঢেউএর চূড়ায় চূড়ায় সাতরঙা স্বপ্ন - তাকে পেতে হবে —

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর।।
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ পীরিতি লাগি থির নাহি বান্ধে।।

কী করি উপায়? তোমায় না পেলে কন্যা জীবনমরণ সব যে বৃথা হয়ে যায়। মহুয়া হর্ষে ডগমগ হয়ে মুখে বলে, গলায় কলসী বেঁধে জলে ডুবে মর। নদের চাঁদ সহর্ষ বিষাদে উত্তর দেয় -

কোথায় পারো কলসী, কন্যা
কোথায় পাবো দড়ি?
তুমি হও গহীন গাঙ
আমি ডুব্যা মরি।

খাঁটী পূর্ববঙ্গের ভাষা না মানবজীবনের ভাষা তা আজও বুঝে উঠতে পারিনি। এ ভাষা মরমে প্রবেশ করে একটি দিগন্তকে উদঘাটিত করে যেখানে সুখ দুঃখ বেদনার আদি অন্ত নাহি যার — এমন সমুদ্র পারে 'দুঁহু কোরে দুঁহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া'। পড়ানোর ব্যাপারে এমন তন্ময় হতে কাউকে দেখিনি — দীনেশবাবু যেন গীতি-কবিতা প্রাণবন্ত। তাঁর কথা যখন মনে করি নেত্রে ভাসে পল্লীবাংলার দিগন্তবিতত সুদূরলীন প্রান্তর, নদীতে কলধ্বনি উঠেছে, নেমেছে কোমল নীলিম ছায়া শ্যামল বনানী ঘিরে, উঠছে বাঙলার প্রাণমন্ত্র যা কানের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করে আকুল ক'রে তোলে প্রাণ। সেদিন এর পরিচয় পেয়েছিলাম।

শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় ছোটখাটো মানুষটি কৃষ্ণাভ জ্যোতিঃসংহত মূর্তি, সদানন্দ পুরুষ, জ্ঞানস্পৃহা, অনুসন্ধিৎসা ও ভক্তিপ্রবণতার অপূর্ব সমন্বয়। বৌদ্ধগান ও দোঁহা (চর্যাগীতি) পড়াতেন সে কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি — তাঁর কণ্ঠস্বর ও ভাষণের মাঝ দিয়ে একটি ভক্তির স্রোত প্রবাহিত হ'তো। একদিন পড়ালেন —

এ ধন যৌবন বড়ায়ি সবঈ আসার।
ছিণ্ডিআঁ পেলাইবোঁ গজমুকুতার হার।।

মুছিআঁ পেলাইবোঁ মোয়ে সিসের সিন্দূর।
বাহুর বলয়া মো করিবো শঙ্খচুর।।
মুণ্ডিআঁ পেলাইবোঁ কেশ জাইবোঁ সাগর।
যোগীনীরূপ ধরী লইবোঁ দেশান্তর।।
যবেঁ কাহ্ন না মিলিহে করমের ফলে।
হাতে তুলিআ মো খাইবোঁ করলে।।
মাথে শম্ভুসম খোঁপা শিসতে সিন্দুর।
এহা দেখি কেহ্নে কাহ্ন গেলান্ত বিদূর।।

ভগবানকে পাবার জন্য এই যে চিত্তের বেদনাময় আকুতি এর তুলনা কোথায়? নারীজীবনের পরম সম্পদ, আমৃত্যু কামনা সিঁথির সিঁদুর মুছতে এবং হাতের শাঁখাচুরমার করে ভাঙতে চাইছেন -যোগিনীর মূর্তি ধরে দেশান্তর যেতে চাইছেন।

আচার্যদেব ' যোগিনী' শব্দটির উপর জোর দিলেন। সামাজিক বর্ত্ম অতিক্রম করে এখানে কবিতার আধ্যাত্মিক বর্ত্মে উন্নয়ন ঘটলো। এই সূত্রে দ্বিজ চণ্ডীদাসের 'পূর্বরাগ ও অনুরাগ' শীর্ষক পদাবলীর একাংশ -

বিরতি আহারে রাঙ্গাবাস পরে
যেমতি যোগিনী পারা।।

অনুবৃত্তি করলেন। অবশ্য শেষোক্ত পদটির সৌন্দর্যের ও অধ্যাত্ম-ঐশ্বর্যের তুলনা বিরল। 'এই পদে চণ্ডীদাস রাধার পূর্বরাগের যে অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন মহাপ্রভুর জীবনে অনেকটা সেইরূপ দেখা গিয়াছিল। ভগবৎ-প্রেমের উদয় হইতেই মহাপ্রভু একা নির্জনে বসিয়া কাঁদিতেছেন - চৈতন্যভাগবত, চৈতন্যমঙ্গল প্রভৃতি গ্রন্থে সেই ভাবের বিস্তৃত বর্ণনা আছে।'

যতদূর মনে পড়ে দীনেশবাবুও এই যোগিনীমূর্তির দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। বৈষ্ণব পদাবলীর অনুবর্তন সংসারবর্ত্মে এবং সমাবর্তন অধ্যাত্মমার্গে। বলাবাহুল্য সমস্ত শ্রেষ্ঠ গীতিকবিতার - গীতিকবিতার কেন সমস্ত শ্রেষ্ঠ কাব্যের ইহাই পরম সত্য। এখানে অহং-এর আত্মা-পরিণাম ঘটে বিশ্ব এখানে বিশ্বেশ্বরের পদে লুণ্ঠিত - সান্ত এখানে অনন্তের যাত্রী। কবিগুরুর ভাষায় Art is an expression of aspiration to infinity.

আচার্যদেবকে প্রণাম নিবেদন করি।

হস্তলিখিত পুঁথিশালার ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক শ্রী মণীন্দ্রমোহন বসু পড়াবেন মেঘনাদবধ কাব্য। যথাসময়ে শ্রেণীকক্ষে এসে দাঁড়ালেন - সৌম্যকান্তি গৌরবর্ণ নাতিস্থূল দেহ, হাতে ' মেঘনাদবধ কাব্য'। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শশাঙ্কমোহন সেনের মধুসূদন সম্পর্কে মনোজ্ঞ এবং অতুলনীয় আলোচনা পড়েছি। পরম আগ্রহে অপেক্ষা করছি এই অমর কাব্য প্রসঙ্গে কী নূতন কথা ইনি বলবেন। মিষ্ট কণ্ঠস্বর, একটু পূর্ববঙ্গের টান আছে। সংক্ষিপ্ত ভূমিকা শেষে কাব্য পড়তে আরম্ভ করলেন। প্রথম কয়েক ছত্রের যে অপূর্ব ব্যাখ্যা রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্যের স্বরূপ' গ্রন্থে আছে তা অতুলনীয়, অনস্বীকার্য সুন্দর। তিনি সহজেই সেই অংশটুকু পার হয়ে এসে দাঁড়ালেন এই ছত্রত্রয়ের কাছে —

কি কৌশলে, রাক্ষসভরসা
ইন্দ্রজিত মেঘনাদে — অজেয় জগতে —

ঊর্মিলাবিলাসী নাশি ইন্দ্রে নিঃশঙ্কিলা?

ঊর্মিলাবিলাসী অর্থাৎ লক্ষ্মণ। এই একটিমাত্র বাক্যাংশে মেঘনাদবধ কাব্যের রামানুজ লক্ষ্মণের পূর্ণ পরিচয় প্রকাশিত হয়েছে। ঊর্মিলাবিলাসী অর্থাৎ ঊর্মিলাতে বিলাস যাঁর - ইনি কী ইক্ষ্বাকুচন্দ্রমা রামচন্দ্রের ত্যাগভূষণ বীরর্ষভ লক্ষ্মণ? কখনই নয়। মেঘনাদবধ কাব্যে লক্ষ্মণের যে চৌর্যবৃত্তি — যে বীরত্বগ্লানি ও কাপুরুষোচিত হীনবৃত্তি অবলম্বন বর্ণিত হয়েছে তার সম্যক্ এবং যথার্থ পরিচয় এই সমস্ত পদে আছে। অস্ত্রহীন মেঘনাদকে তিনি অন্যায় সমরে হত্যা করেছেন — তিনি ক্ষত্রিয়-কুলগ্লানি। তাই তাঁর নামান্তর 'ঊর্মিলাবিলাসী'। শ্রীমধুসূদনের শিল্পসৌন্দর্যে এবং অধ্যাপকবরের ব্যাখ্যায় বিমুগ্ধ না হয়ে পারিনি।

পরবর্তীকালে তাঁর কাছে এই কাব্যের প্রথম ছত্রের 'সম্মুখ সমরে পড়ি বীরচূড়ামণি' এই অংশে 'সম্মুখ' শব্দটির অভূতপূর্ব সার্থকতার কথা উল্লেখ করেছিলাম। বলেছিলাম যে 'সমরে'র বিশেষণরূপে কবি প্রচন্ড বা ভীষণ এই শব্দ ব্যবহার করেননি। বীরসত্তম বীরবাহু তো লক্ষ্মণের মতো কৌশলে যুদ্ধ করেন নি, তিনি বীর যোদ্ধার মতোই 'সম্মুখ সমরে' যুদ্ধ করে দেশের জন্য প্রাণদান করেছেন। তিনি রণক্ষেত্রে প্রবেশ করলেন কবি তা অপূর্ব ভাষায় বর্ণনা করেছেন -

পশিলা বীরেন্দ্রবৃন্দ বীরবাহুসহ
রণে, যূথনাথ সহ গজ যূথ যথা।
ঘন ঘনাকারে ধূলা উঠিল আকাশে,
মেঘদল আসি যেন আবরিলা রুষি
গগনে; বিদ্যুৎ ঝলা-সম চকমকি
উড়িল কলম্বকুল অম্বর প্রদেশে
শনশনে! — ধন্য শিক্ষা বীর বীরবাহু!
কত যে মরিল অরি, কে পারে গণিতে?

আর রামচন্দ্র আহবে প্রবেশ করলেন —

অগ্নিময় চক্ষু: যথা হর্য্যক্ষ, সরোষে
কড়মড়ি ভীম দন্ত, পড়ে লম্ফ দিয়া
বৃষস্কন্ধে, রামচন্দ্র আক্রমিলা রণে
কুমারে!

উভয়ত্রই বীরত্বের শৌর্যের পরাকাষ্ঠা। কবি মধুসূদনের শব্দ ব্যবহারে সংযত মহিমা ও সতর্ক বিচক্ষণতা সর্বত্র লক্ষিতব্য। অধ্যাপক বসুর কাছে এই নির্দেশ পেয়েছিলাম। এ যে কত বড় সম্পদ পরবর্তীকালে দীর্ঘকালব্যাপী অধ্যাপকজীবনে তা উপলব্ধি করেছি। কাব্যপাঠে সুতীক্ষ্ণ অথচ রসময় দৃষ্টিলাভে সমর্থ হয়েছি। বারে বারে তাঁর কথা স্মরণ করে তাঁকে প্রণাম নিবেদন করেছি।

মঙ্গলকাব্যের মাঙ্গল্য সম্পদ এনে দিলেন প্রৌঢ় অধ্যাপক শ্রী তমোনাশ দাশগুপ্ত। শালপ্রাংশু মহাভূজ, বলিষ্ঠ তাঁর দেহ, অবশ্য দুই বাহু লোহার শাবল নয়, স্নেহের নির্ঝর। বলিষ্ঠ মধুর ভাষণ। কালের তমিস্রা ভেদ করে ব্যাধ-দম্পতী কালকেতু-ফুল্লরার সরল দাম্পত্য জীবনের একটি অপূর্ব ছবি চোখে পড়েছে। স্বর্ণ- গোধিকারূপিণী চণ্ডীদেবীকে তালপাতার ছাউনি নড়বড়ে ঘরে বেঁধে রেখে অন্নসংস্থানের উদ্দেশে দু'জনেই বেরিয়ে পড়েছেন। ফুল্লরা গৃহে ফিরে -

কুঁড়্যার দুয়ারে দেখে রাকা চন্দ্রমুখী।

আশ্চর্য হয়ে প্রশ্নের উত্তরে সে যখন শুনলো —

আছিলাম একাকিনী বসিয়া কাননে।
আনিল তোমার স্বামী বাঁধি নিজগুনে।।

সে তো আর বোঝেনি ধনুকের গুণে নয়। সে বুঝলো চারিত্রিক ঐশ্বর্যে। মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়লো, পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেল। দরিদ্রজীবনে একমাত্র সম্পদ স্বামীপ্রেম, আজ বুঝি তাও হারাতে বসেছে। কিছুতেই রমণীকে বোঝাতে পারলো না। তখন 'নয়নের জলেতে মলিন মুখশশী' স্বামীর উদ্দেশে গোলাহাটে ছুটলো। সে বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলো —

শাশুড়ী ননদী নাহি নাহি তোর সতা।
কার সনে দ্বন্দ্ব করি চক্ষু কৈলা রাতা।।

ফুল্লরা উত্তর দিল —

সতা সতীন নাহি প্রভু তুমি মোর সতা।
ফুল্লরারে এবে হৈল বিমুখ বিধাতা।।
পিপীড়ার পাখা উঠে মরিবার তরে।
কাহার ষোড়শী কন্যা আনিয়াছ ঘরে।।
শিয়রে কলিঙ্গ রাজা বড়ই দুর্বার।
তোমারে বধিয়া জাতি লইবে আমার।।

কালকেতু কিছু না বুঝে ক্রুদ্ধ হয়ে উত্তর দিল —

সুব্যক্ত করিয়া বামা কহ সত্য ভাষা।
মিথ্যা হৈলে চিয়াড়ে কাটিব তোর নাসা।।

ফুল্লরা বললে —

সত্য মিথ্যা বচনে আপনি ধর্ম সাক্ষী।
তিন দিবসের চন্দ্র দ্বারে বস্যা দেখি।।

উভয়ে ঘরে ফিরে দেখে —

ভাঙ্গা কুঁড়্যা ঘরখানি করে ঝলমল।

সরল দাম্পত্য-কলহের অপরূপ চিত্র। সেদিন শ্রেণীকক্ষে কালকেতু ফুল্লরারর দাম্পত্য-জীবনের কলহমধুর অপরূপ ছবি নেমে এসেছিল। আর চোখে পড়ছিল কবিকঙ্কণের দুষ্ট মধুর হাসি।

অধ্যাপক-প্রবরের পঠন-পাঠনের গুণেই এমনটি সম্ভব হয়েছিল।

শ্রী বিশ্বপতি চৌধুরী আমাদের সময়ে অধ্যাপনা-কার্যে যোগদান করলেন। ঋজুশির, স্বল্পকায় তারুণ্যের প্রতীক শুভ্র জ্যোতির্ময় মূর্তি, প্রথমদিনেই প্রীতির রসে আমাদের মনকে লুট করে নিয়েছিলেন। এমন মধুবাক্ পুরুষ আমি কম দেখেছি —

মৃদু মধু বাক্যরাশি মিষ্ট ব্যবহার।
মুহূর্তেই লুটে নিল হৃদয় সবার।।

অধ্যাপকের এমন প্রীতিমধুর ব্যবহার সচরাচর লক্ষিত হয় না। তিনি আমাদের 'অত্যাগসহ্যনো' বন্ধুর মতো ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের কাব্য পড়াতেন। তাঁর আবৃত্তি এবং কাব্যালোচনা মুগ্ধভাবে

শ্রবণ করেছি। এককথায় বলা যেতে পারে যে কাব্যামৃত পান করেছি। কবিগুরুর ছন্দোমাধুর্য এমন করে প্রকাশ করতেন যে আমরা সুরের ঝরণাতলায় নেমে আসতাম। একদিনের কথা বলি - তিনি রবীন্দ্রনাথের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা 'সোনার তরী' পড়াচ্ছেন। পড়াতে পড়াতে এক জায়গায় থেমে পড়ে বললেন, 'কাব্যের এমন সুরমাধুর্য তোমরা শুনেছ?' বলে আবৃত্তি করলেন -

'ভরা পালে চলে যায়
কোন দিকে নাহি চায়,
ঢেউগুলি নিরুপায়
ভাঙ্গে দুধারে।'

এর চিত্রসৌন্দর্য এবং সুরমাধুর্যের তুলনা কোথায়।

প্রসঙ্গক্রমে মনে পড়ে অধ্যাপকজীবনে একদিন বন্ধুবর শ্রী ভবতোষ দত্ত (বর্তমানে তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে বাঙলা সাহিত্যের কার্যে নিযুক্ত আছেন) মহাশয়ের সঙ্গে কবি মোহিতলালের বাড়িতে গিয়েছিলাম। তিনি তখন বেহালায় 'মুনিবন তরুচ্ছায়া'-ময় তাঁর ভবনে ধ্যানের আসন পেতেছেন। তিনি কবিগুরু সম্পর্কে অপূর্ব ভাষার মর্মস্পর্শী আলোচনা করলেন। আলোচনা-শেষে চিত্রাকাব্যের 'দিনশেষে' কবিতার অংশবিশেষ আবৃত্তি করে শোনালেন —

নামিছে নীরব ছায়া ঘন বনশয়নে
এ দেশ লেগেছে ভালো নয়নে।
স্থির জলে নাহি সাড়া,
পাতাগুলি গতিহারা,
পাখি যত ঘুমে সারা কাননে...
এ দেশ লেগেছে ভালো নয়নে।

নিদাঘের পরিণামরমণীয় দিবস, সন্ধ্যা নামছে, সূর্যাস্তের ক্ষীণতম রশ্মি মিলিয়ে যাচ্ছে। উঠানে ঘন ছায়া ঘনতর হয়ে এলো। চারিদিকে স্তব্ধতার নিঃশব্দ সঞ্চরণ। হঠাৎ আবৃত্তি থামিয়ে মুগ্ধ নেত্রে আমাদের দিকে চেয়ে বলে উঠলেন, এমন সঙ্গীত তোমরা শুনেছ? এমন প্রাণভোলানো ছবি তোমরা দেখেছ? পূজনীয় বিশ্বপতিবাবুর স্মৃতিপূজায় কবি মোহিতলালের কবিপূজা স্মরণ না করে পারি না। তাই কিছুটা অবান্তর হলেও ঘটনাটি উদ্ধৃত করলাম। সেদিনের সন্ধ্যা আমার জীবনে চিরকালের স্নিগ্ধমধুর ছায়া মেলে আজিও বর্তমান।

অধ্যাপক শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র, এমন অভিজনবান পুরুষ ক্বচিৎ দৃষ্ট হয়। আভিজাত্যের পরম স্পৃহনীয় সম্পদ ভদ্রতা, মাধুর্য এবং ঐশ্বর্যের ত্রিবেণীসঙ্গম তাঁর চরিত্রকে সমুন্নত মহিমায় প্রোজ্জ্বল করে তুলেছিল। তিনি আমাদের পালিভাষা ও গিরিশচন্দ্রের 'প্রফুল্ল' নাটক পড়াতেন। শুভ্রতার প্রতিমূর্তি মৃতদার এই মানুষটিকে দেখে আমার বোধিসত্ত্বের কথা মনে পড়ত। যাক্ সে-কথা। 'প্রফুল্ল' নাটক সম্বন্ধে তাঁর একটি উক্তি আমার চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। কথাটা উঠেছিল রমেশ চরিত্র নিয়ে অর্থাৎ রমেশ খাঁটি শয়তান — absolute villian কিনা? তিনি বললেন, না, রমেশ absolute villian নয়। তাঁর উক্তির সমর্থনকল্পে তিনি নাটকের পঞ্চম অঙ্কের চতুর্থ গর্ভাঙ্ক থেকে (এই দৃশ্যের) একাংশ উদ্ধৃত করলেন। ঘটনাটি বলি, রমেশ

কাঙালীচরণ ও জগমণির সহায়তায় ভ্রাতুষ্পুত্র যাদবের প্রাণনাশ করবার চেষ্টা করছেন। যাদব অত্যন্ত কাতর হয়ে বললে — কাকাবাবু, আমায় একটু জল দাও, জল খেলেও বাঁচবো না কাকাবাবু।

রমেশ - দাও, একটু জল দাও।

Absolute Villian খাঁটি শয়তান, হৃদয়বিহীন। এখানে কি হৃদয়বত্তার ক্ষণিক বিকাশ লক্ষ্য করা যায়? দেহভৃৎ নর হৃদয়বিহীন হতে পারে না। সেকস্‌পীয়রের Iago বা Edmond এর মধ্যেও হৃন্ময়তার পরিচয় একেবারে দুর্লক্ষ্য নয়।

তাঁর সহানুভূতি ও সদাশয়তার অন্ত ছিল না। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পাদক ছিলেন। আমি কোনমাসেই যথাসময়ে বেতন দিতে পারতাম না। কিন্তু কোনদিনই 'অতিরিক্ত' শুল্ক (fine) আমায় দিতে হয়নি। সুদীর্ঘকাল তাঁর অধীনে পরীক্ষক এবং গণকের (Scrutineer) কাজ করেছি। এইটুকু উপলব্ধি করেছি যে তাঁর মতো মানুষ আধুনিক যুগে দুর্লভতর হতে চলেছে। তাঁকে স্মরণ করলে শুভ্রতার পুণ্যদেবালয়ে প্রবেশ করি।

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 'ভারতবিস্ময়' বিশ্বভাষা-রত্নাকর। বিপুল কর্মশক্তি, অনলস অধ্যবসায় ও দুরারোহ বৈদগ্ধ্যের অভূতপূর্ব সমন্বয় — এককথায় তিনি বিরাটের সম্রাট। তাঁর দিকে চেয়ে কেন জানিনে মহাজীবন স্বামীজীকে মনে পড়ে। তাঁর মানস ঘিরে আন্তর্জাতিক ভাষাহোমানলশিখা দূরনভোমুখী তাঁর পুণ্য উপস্থিতিতে শ্রেণীকক্ষ আন্তর্জাতিক শ্রীক্ষেত্রে রূপান্তরিত হতো। তাঁর ভাষণ বিচিত্রধ্বনি মাধুর্য-সম্মেলনে সমুদ্রগর্জন। যখন তাঁর কথা স্মরণ করি তখন মনে পড়ে যে তাঁকে লক্ষ্য করেই ক্রান্তদর্শী ঋষির এই ঔপনিষদিক মহাবাণী উচ্চারিত হয়েছে —

কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ।
এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম লিপ্যতে নরে।।

ঈশোপনিষৎ — শ্লোঃ ২

স্মরি তাঁর পুণ্য নাম
পদতলে রাখিনু প্রণাম।

স্নিগ্ধকান্তিব্যক্তিত্ব অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন সত্যই প্রিয়রঞ্জন। ইংরাজি সাহিত্যের দিকপাল, বাঙলা ও ওড়িয়া সাহিত্যে অসাধারণ তাঁর দক্ষতা। 'বাঙলা সাহিত্যে পাশ্চাত্য প্রভাব' এই ছিল তাঁর আলোচ্য (শিক্ষণীয়) বিষয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙলা সাহিত্যের কায়ানির্মিতিতে এবং ভাববিস্তৃতিতে যে বিশ্বসাহিত্য, বিশেষ করে ইংরাজী সাহিত্যের স্পষ্ট বা অস্পষ্ট ছায়া পড়েছিল তা ঐতিহাসিক সুপরিচিত এবং সুপরীক্ষিত সত্য। শ্রীমধুসূদনের কাব্যে, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে-সমালোচনা সাহিত্যে, কাব্যরচনায় এবং রবীন্দ্রনাথের গীতিকবিতায় ও নাট্যশিল্পে যে পাশ্চাত্ত্যপ্রভাব পড়েছিল তা অনস্বীকার্য। রবীন্দ্রনাথের ভাব ও ভাবনার শিল্পকায়ানির্মাণে সেকস্‌পীয়র, শেলী, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কীটস, ও জার্মান মহাকবি গোটের ভাব ও ভাবনার প্রতিফলন লক্ষিতব্য বিষয়। বালক রবীন্দ্রনাথ ম্যাকবেথ নাটকের অনুবাদ করেছিলেনযে 'রাজা ও রাণী'- নাটকে রেবতীচরিত্রে লেডী ম্যাকবেথের ছায়া আছে। তিনি গোটের ফাউস্ট মূল জার্মানভাষায় পড়েছিলেন। ফাউস্টের শেষ সঙ্গীত Mysticus Chorus এবং রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলির' 'জীবনে যত পূজা হ'ল না সারা' গানটির ভাবগত ঐক্য আছে।

যাক সে কথা। শেলীর অতীন্দ্রিয়বাদ, কীট্‌সের চিত্রকল্প, ওয়ার্ডসওয়ার্থের অধ্যাত্মচেতনা রবীন্দ্রকাব্যে লক্ষণীয় সম্পদ। অধ্যাপক সেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাহিত্যের গঙ্গাযমুনা সঙ্গমে আমাদের পৌঁছে দিয়েছিলেন। সীমাবদ্ধ আমাদের দৃষ্টি সুদূর অসীমের পথে যাত্রা করেছিল — তিনি হাত ধরে আমাদের অসীমের দ্বারে নিয়ে গিয়েছিলেন।

দীনেশবাবুর বিদায়ের ভূমিকায় রায়বাহাদুর শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র বিভাগীয় সহকারী প্রধান অধ্যাপকরূপে বৃত হলেন। তখন কবিগুরুর দূরাগত পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছি। তিনি প্রধান অধ্যাপক (রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক) রূপে বৃত হয়েছেন। কবে যে তাঁকে শ্রেণীকক্ষে আমাদের মাঝে দেখতে পাবো তার স্থিরতা নেই। তাই রায় বাহাদুরের আগমন আমরা প্রসন্নমনে গ্রহণ করতে পারিনি। কিন্তু এই সৌম্যকান্তি মানুষটি আমাদের চিত্ত জয় করেছিলেন তাঁর স্নেহমধুর ভাষণে এবং অধ্যাপনার বিচক্ষণতায়। সৌজন্যের প্রতিমূর্তি ছাত্রবন্ধু এই মানুষটিকে কোনোদিন ভুলতে পারবোনা।

আমার অন্যতম পাঠ্য ছিল মৈথিলী সাহিত্য। অধ্যাপক শ্রী বিনায়ক মিশ্র মহাশয়ের কাছে পাঠ নিতাম। তিনি আমাকে মৈথিলী সাহিত্যের স্বর্ণাভ দিগন্তের সন্ধান দিয়েছিলেন। প্রাকৃতের অধ্যাপক শ্রীমহেশ্বর দাস মহোদয়ের সরস বাচনভঙ্গী প্রাকৃতকে আমাদের কাছে প্রকৃতিমধুর করে তুলেছিল — 'কর্পূরমঞ্জরী'র সুরভি সৌন্দর্যে আমরা বিমুগ্ধ হয়েছিলাম।

ইতিবৃত্ত ও স্মৃতিকথা

২

তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি

' তোরা শুনিস্‌নি কি শুনিস্‌নি কি তাঁর পায়ের ধ্বনি,
ঐ য়ে আসে, আসে, আসে।'

আসছেন, আসছেন, এসে পড়লেন। কান পেতে শোন, হৃদয়খানি বিছিয়ে দাও, পায়ের ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ, ভারতবর্ষ বিশ্বপথিক রবীন্দ্রনাথ আসছেন - আমাদের বলাকা পড়াবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস শ্রেষ্ঠতম অধ্যায় সংযোজিত হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যান-প্রান্তরে 'তৃণে তৃণে' রোমাঞ্চ জাগে; আকাশ কী গাঢ় নীল! প্রসন্নজ্যোতি : আলোকধারা ঝরে ঝরে পড়ছে। এত আগমন নয়, আবির্ভাব। রবীন্দ্রনাথ অভ্যস্ত পরিচ্ছদে আমাদের শ্রেণীকক্ষে এসে দাঁড়ালেন। এত কাছে এও কী সম্ভব? স্বর্গ কী আজ মর্তে নেমে এল? অথবা বিদ্যাঙ্গনে জ্বলে উঠলো সুরভি-সমুজ্জ্বল দূরনভোমুখী হোমাগ্নি শিখা। দেখলাম অপূর্ব মূর্তি —

ব্যূঢ়োরস্কো বৃষস্কন্ধঃ শালপ্রাংশুর্মহাভুজঃ।
আত্মকর্মক্ষমং দেহং 'ব্রাহ্মণো' ধর্ম ইবাশ্রিতঃ।

জীবনের দুঃখদ্বন্দ্ববন্ধুর সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করে আকাঙ্ক্ষিত তীর্থক্ষেত্রে সূর্যকরসমুদ্ভাসিত জাহ্নবীধৌত দেবতাত্মা পাদদেশে এসে দাঁড়িয়েছি। সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে মনে মনে উচ্চারণ করি ভারতবর্ষের পরমতম ধ্যানমন্ত্র —

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি —
ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ।

ধীশক্তি যেন জাগ্রত থাকে। আকাশে মধু, মধু বাতা ঋতায়তে।

সেদিন শ্রেণীকক্ষে উপাচার্য শ্রী শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বিশ্ববিদ্যালয়ের

পরিচালকবৃন্দ এবং অধ্যাপকগণ সমবেত হয়েছিলেন। আর অন্যান্য সহাধ্যায়ী বন্ধুগণের মধ্যে শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্তও সেখানে ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ 'উদাত্ত মধুরকণ্ঠে' 'চঞ্চলা' কবিতাটি আবৃত্তি করলেন। 'নাহি কাল দেশ।' সব হারিয়ে যাচ্ছে — হারিয়ে যাচ্ছে, কেবা আমি? কোথা আমি? কীবা পরিচয়? শুধু গতি অনিবার ধাবমান কালস্রোত — অবিচ্ছিন্ন অবিরল চলে নিরবধি। প্রাণের তরঙ্গ উঠছে, রূপের বুদ্‌বুদ্ ফুটছে, ভেঙ্গে পড়ছে। অবারিত, অনাহত, অনাদ্যন্ত গতিবেগ — 'অতল আঁধারে অকূল আলোতে'। বলা বাহুল্য রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি ঔপনিষদিক, তা পাশ্চাত্য দার্শনিক হেনরি বের্গসঁ'র নিরুদ্দেশ যাত্রী Elan vital নয়। তা নাস্তর্থক নয়, সদর্থক যার শেষ কথা 'আনন্দো ব্রহ্মেতি বাজানাৎ....। তাই 'চঞ্চলা'র শেষ কথা শুধু 'অতল আঁধার' নয় 'অকূল আলো'।

স্তব্ধ হয়ে বসে আছি। ধ্যাননেত্রে মুহূর্তের জন্য ঝলসে গেল অবিরামগতি প্রকৃতির অকূল আলোকাভিমুখী অন্তহীন যাত্রা। শুধু ছেড়ে যাওয়া নয় - শুধু চাওয়া নয়। এ দুয়ের মাঝখানে আছে কোন মিল; তাঁর ভাষাতেই বলি —

'এমন একান্ত করে চাওয়া —
এও সত্য যত
এমন একান্ত ছেড়ে যাওয়া
সত্য সেই মতো।'
এ দুয়ের মাঝে তবু কোনোখানে আছে কোন মিল।'

কেন জানি না পরবর্তীকালে এই কবিতা পাঠকালে উপনিষদের এই পরম মন্ত্র মনে পড়েছে —

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।।
যে মুহূর্তে পূর্ণ তুমি, সে মুহূর্তে কিছু তব নাই,
তুমি তাই
পবিত্র সদাই।

পূর্ণতার ভূমিকায় শূন্যতা এবং পবিত্রতার অপরূপ ছবি।

এবার দ্বিতীয় কবিতা পাঠ করলেন, 'শা-জাহান'। অনেকটা আত্মসংবরণ করেছি, স্থিতধী হয়েছি। অধ্যাপক শ্রী প্রিয়রঞ্জন সেন কবিকে কিছু প্রশ্ন করার ভার আমার উপর দিয়েছিলেন। কবি গন্ধর্ব-কিন্নরকণ্ঠে আবৃত্তি শেষ করলেন। দুঃসাহসে ভর করে উঠে দাঁড়ালাম, মাথা নীচু করে বলে উঠলাম : এই কবিতায় যেখানে আছে —

'ভুলি নাই, ভুলি নাই, ভুলি নাই প্রিয়া।'

তারপরেই আছে —

মিথ্যা কথা! কে বলে যে ভোল নাই?
কে বলে যে খোল নাই
স্মৃতির পিঞ্জর দ্বার?
অতীতের চির অস্ত-অন্ধকার
আজিও হৃদয় তব রেখেছে বাঁধিয়া?

বিস্মৃতির মুক্তিপথ দিয়া
আজিও সে হয় নি বাহির?

কানে যেন খট্ করে বাজে, কেমন যেন বিসদৃশ শোনায়। হয়তো এই বিস্মৃতি জীবনের সত্য, কিন্তু এখানে কি কাব্যের রসাভাস ঘটেনি? কবি চুপ করে শুনলেন। তারপরে স্মিত হেসে স্নিগ্ধকণ্ঠে বললেন, 'কাব্যমূল্য বিচারে তুমি যা বলছো তা হয়তো ভেবে দেখবার মতো, কিন্তু সমগ্র 'বলাকা' কাব্যের মূল সুর যদি বিচার করে দেখো তবে দেখবে তার সঙ্গে এর মিল আছে। মানুষ ভুলে যায়, যাত্রা তার কোনোদিন থামে না।' দ্বিতীয় প্রশ্ন করার সাহস হয়নি। আজ জীবন-সায়াহ্নে দাঁড়িয়ে উপলব্ধি করছি মানুষ ভোলে না, হারায় না কিছুই।

হারানো, হারানো নয় হৃদয়ের ধন,
হারানোর ভূমিকায় প্রাপ্তি চিরন্তন।

তাঁর 'ছবি' কবিতায় আমার উক্তির সমর্থন মিলবে। সুদীর্ঘ জীবনে যে বেদনা উপলব্ধি করেছি তা বিনম্রশিরে নিবেদন করলাম।

পরদিন পাঠভবন স্থানান্তরিত হ'ল। বিশ্ববিদ্যালয় ভবনের উত্তর কোণস্থিত দ্বিতলের প্রশস্ত কক্ষে, আয়োজন সম্পূর্ণ ভারতীয় প্রথায়। মেঝেতে সুদৃশ্য কার্পেট বিছিয়ে দেওয়া হ'ল - ধূপ-সুরভিত কক্ষতল। কবির আসনের পুরোভাগে একখানি প্রশস্ত চৌকি। তদুপরি পুষ্পার্ঘ্য, লেখনী ও মস্যাধার। সময়ও পরিবর্তিত হয়েছে সকাল আট ঘটিকা। পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রবৃন্দ আমরা সমবেত হ'লাম। অন্যান্য বিভাগের ছাত্রদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। অবশ্য অধ্যাপকবৃন্দ অবারিত দ্বার। কক্ষদ্বারে প্রশস্তবক্ষ দীর্ঘকায় প্রসন্নমূর্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন কর্মসচিব পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় দণ্ডায়মান বা ইতস্ততঃ ভ্রাম্যমান পাছে কোনো অত্যুৎসাহী ছাত্রের অতর্কিত আগমন ঘটে।

যথাসময়ে কবিগুরু আবির্ভূত হলেন। প্রভাতের সূর্য বুঝি সহসা প্রকাশ 'আবিরাবীর্ম এধি; বেদস্য ম আনীস্থ:, শ্রুতং মে মা প্রহাসী:'। মনে মনে এই প্রণাম ও প্রার্থনা মন্ত্র উচ্চারণ করে অভ্যর্থনার জন্য এগিয়ে গেলাম। 'আনন্দেরই সাগর থেকে এসেছে আজ বাণ'। কবিগুরু আসন পরিগ্রহ করলেন। বীণাবিনিন্দিত উদাত্ত মধুর কণ্ঠে আলোচনা সুরু করলেন। বিষয়বস্তু তাঁর ' কৈশোর কালের বাঙলাদেশ ও বাঙলাসাহিত্য'। ফিরে গিয়েছি ঊনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম অষ্টম দশকে ভারতবর্ষের পূণ্যতম কালতীর্থে। মধু বাতা ঋতায়তে, আকাশে মধু, বাতাসে মধু, আমাদের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে মধু। কালের যবনিকা সরতে থাকে। চোখে পড়ে বিদ্যাসাগরের করুণাঘন পরমমূর্তি, বঙ্কিমচন্দ্রের খড়্গনাসা ঋজুকায় সমুজ্জ্বলকান্তি প্রতিভার নিঃসংশয়িত স্বাক্ষর। রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের কন্যার বিবাহ সভা, রমেশবাবু বঙ্কিমবাবুর গলায় মালা পরাইতে উদ্যত হইয়াছেন এমন সময়ে আমি সেখানে উপস্থিত হইলাম। বঙ্কিমবাবু তাড়াতাড়ি সে মালা আমার গলায় দিয়া বলিলেন, 'এ মালা ইঁহারই প্রাপ্য। রমেশ, তুমি সন্ধ্যাসঙ্গীত পড়িয়াছ?' মানসনেত্রে ধরা দিল সে যুগের একটি মনোজ্ঞ চিত্র। কবির সুমধুর ভাষণে সে যুগ আমাদের কাছে সজীব মূর্তি পরিগ্রহ করেছিল। সেদিন অনুভব করেছিলাম সুযোগ্য কণ্ঠে বাক্ সত্যই ঋত, সত্যই ব্রহ্ম।

দীর্ঘ আলোচনা শেষ হ'ল। কবি গাত্রোত্থান করলেন। অধ্যাপকবৃন্দের নির্দেশ মতো আমি সম্রম মস্তকে তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়ে অনুরোধ জানালাম - 'আধুনিক সাহিত্য সম্বন্ধে কিছু বলুন'।

স্মিতমুখে প্রসন্ননয়নে আমার দিকে চেয়ে তিনি বললেন, 'আজ আর নয়, চলো তোমাদের সঙ্গে ছবি তুলবো'। সে মুখের দিকে চেয়ে অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। আর কথা বলতে পারিনি।

সে ছবি আমাদের আছে। রত্নখনি - বিশ্ববিদ্যালয়ের মনীষিগণের আলোকচিত্র - মধ্যে মধ্যমণি অমৃতবিন্দু রবীন্দ্রনাথ। জীবনের কাঙ্ক্ষিত স্বর্গ। আমাদের পরিবারের শাশ্বত সম্পদ।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও রবীন্দ্রনাথ

১৮৯৩ ইং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ ছয়জন মনীষী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় অঙ্ক, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি মাতৃভাষার মাধ্যমে অধ্যয়ন উচিত কিনা এই বিষয়ে অভিমত আহ্বান করিয়া তদানীন্তন বাংলার শিক্ষিত ও শিক্ষাব্রতী জনগণের নিকট এক পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন। সেই পত্র ইংরাজী ভাষায় লিখিত হইয়াছিল। ইংরাজী ভাষায় লিখিত এই পত্রের উত্তর ইংরাজী ভাষাতেই প্রদত্ত হইয়াছিল। মূল পত্র ও তাহার উত্তর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ পত্রিকার প্রথম বর্ষের পরিশিষ্টরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। অনেক বাঙ্গালী শিক্ষাব্রতী রবীন্দ্রনাথের এই প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করেন নাই। ফলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাকে প্রবেশিকা পরীক্ষার শিক্ষার বাহন করা সেই সময় সম্ভব হয় নাই। ইহার প্রায় ২০ বৎসর পরে ১৯১৩ ইং রবীন্দ্রনাথ আন্তর্জাতিক সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্মান 'নোবেল পুরস্কার' পাওয়ার পর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে সম্মানিত ডি.লিট. উপাধি দ্বারা ভূষিত করেন। ১৯১৯ ইং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় ভাষাবিভাগ সৃষ্টির পর প্রধান ভাষা বাংলার ছাত্রদের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের কয়েকটি বিশেষ বিষয়ে বক্তৃতা দানের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কয়েকজন সাহিত্যিককে অনুরোধ করিয়াছিলেন। এই সকল আমন্ত্রিত ব্যক্তিদের মধ্যে প্রথম নাম রবীন্দ্রনাথের। তাঁহাকে বাংলা ছন্দসম্পর্কে বক্তৃতাদানের জন্য অনুরোধ করা হইয়াছিল এবং তিনি এই প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৯২২ ইং রবীন্দ্রনাথ এম.এ. বাংলা পরীক্ষার অন্যতম পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৯২৩ ইং 'সাহিত্য' বিষয়ে Special University Readership বক্তৃতা দিয়াছিলেন। ১৯৩০ ইং 'মানুষের ধর্ম' বিষয়ে বাংলা ভাষায় 'কমলা বক্তৃতা' দান করেন। ১৯৩২-১৯৩৪ ইং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিশেষ অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সেই সময় তাঁহাকে পঞ্চম ও ষষ্ঠ বার্ষিক শ্রেণীর বাংলার ছাত্রদের কয়েকটি ক্লাস লইতে হইয়াছিল। সেই 'ক্লাসে' ছাত্রদের বসিবার প্রথম সারি কয়টিতে ছাত্রেরা বসিবার সুযোগ পাইতেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু অধ্যাপক ও সাহিত্যরসিক ব্যক্তি বসিতেন। অধিকাংশ ছাত্রেরা (অন্যান্য বিভাগেরও) ক্লাসের ভিতরে ও বাহিরে ভিড় করিয়া দাঁড়াইতেন। যতদূর মনে হইতেছে অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় সেই ক্লাসে উপস্থিত ছাত্রদের 'রোলকল' করিয়া রেজিষ্টারী খাতায় কে উপস্থিত তাহা চিহ্নিত করিয়া লইয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ক্লাস লওয়া সে এক বিচিত্র ব্যাপার। ছাত্রদের অনুরোধে (উপস্থিত ব্যক্তিদেরও) তাঁহার কবিতাবিশেষের ব্যাখ্যা করিতে হইয়াছে। কবিতাবিশেষ আবৃত্তি করিতে হইয়াছে, সাহিত্যসংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সুবর্ণ জয়ন্তীর এই

শুভ লগ্নে বাংলা বিভাগের গৌরবজ্জ্বল অতীত দিনের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করিতেছি। ইহা বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে সেই যুগের যে দুই ভারতীয় সমগ্র এশিয়ায় নোবেল পুরস্কার লাভের গৌরব অর্জন করিয়াছিলেন তাঁহারা উভয়েই একই সময়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই অধ্যাপকের পদে বৃত ছিলেন। স্যার সি.ভি.রমণ সেই সময় এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। এশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয় - এই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এশিয়াবাসী নোবেল পুরস্কার প্রাপক দুই পণ্ডিত ব্যক্তি একই সময়ে অধ্যাপক। ইহা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে বড় শ্লাঘার কথা। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ 'বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ' (ডিসেম্বর ১৯৩২ ইং) এবং শিক্ষার বিকিরণ (ফেব্রুয়ারী ১৯৩৩ ইং) সম্পর্কে পর পর যে দুইটি বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ১৯৩৩ ইং প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৯৩৭ ইং ১৭ই ফেব্রুয়ারীতে রবীন্দ্রনাথ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম ভাষণ দান করেন। এই বৎসরই রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষায় রচিত পি.এইচ.ডি. থিসিসের অন্যতম পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

বাংলার সংকলন গ্রন্থ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৮৫৭ ইং, গৃহীত প্রথম এন্ট্রান্স পরীক্ষায় রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের জীবনী ও রামায়ণ এবং ১৮৫৮ ইং, গৃহীত দ্বিতীয় পরীক্ষায় রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের জীবনী, রামায়ণ, তোতা ইতিহাস ও আরব্যরজনী বাংলা পাঠ্য ছিল। ১৮৬০ ইং বাংলা পাঠ্য নির্দেশ করিয়া যথাসম্ভব সত্বর বাংলা পাঠ্য সংকলন গ্রন্থ প্রকাশের কথা বলা হইয়াছে। আমরা ১৮৬৭ ইং মুদ্রিত 'Subjects of Examination in the Bengali Language, appointed by the Senate of Calcutta University for the Entrace Examination of 1869.' গ্রন্থের সন্ধান পাইয়াছি। ১৮৬১ ইং হইতে ১৮৬৬ ইং মধ্যে প্রথম কোন্ বৎসর জাতীয় সঙ্কলন প্রকাশিত হইয়াছিল — তাহা জানা বাঞ্ছনীয়। আমি এই অল্প সময়ের মধ্যে তাহার সন্ধান লইতে পারি নাই। ১৮৬৭ ইং প্রকাশিত (১৮৬৯ ইং পরীক্ষার জন্য) সঙ্কলন ব্যতীত ১৮৭৪ ইং প্রকাশিত (১৮৭৫ ইং পরীক্ষার জন্য), ১৮৭৪ ইং প্রকাশিত (১৮৭৬ ইং পরীক্ষার জন্য), ১৮৭৫ ইং প্রকাশিত (১৮৭৭ ইং পরীক্ষার জন্য), ১৮৭৬ ইং প্রকাশিত (১৮৭৮ ইং পরীক্ষার জন্য), ১৮৭৭ ইং প্রকাশিত (১৮৭৯ ইং পরীক্ষার জন্য), ১৮৭৯ ইং প্রকাশিত (১৮৮১ ইং পরীক্ষার জন্য), ১৮৮৪ ইং প্রকাশিত (১৮৮৫ ইং পরীক্ষার জন্য), ১৮৮৫ ইং প্রকাশিত (১৮৮৬ ইং পরীক্ষার জন্য), ১৮৮৯ ইং প্রকাশিত (১৮৯১ ইং পরীক্ষার জন্য), ১৮৯১ ইং প্রকাশিত, ১৮৯২ ইং প্রকাশিত (১৮৯৫ ইং পরীক্ষার জন্য), ১৮৯৩ ইং প্রকাশিত বাংলা সঙ্কলন গ্রন্থের সন্ধান পাইয়াছি। একাধিক সঙ্কলন দেখিবারও সুযোগ হইয়াছে। এই সকল সঙ্কলন গ্রন্থের মধ্যে ১৮৮৯ ইং পর্যন্ত প্রকাশিত সঙ্কলন গ্রন্থসমূহ 'appointed by the Senate of the Calcutta University' — এরূপ লিখা আছে। ১৮৯১ ইং ও তৎপর প্রকাশিত সঙ্কলন গ্রন্থসমূহ 'appointed by the Syndicate of the Calcutta University' — এরূপ উল্লেখ আছে। যে ১৩খানি সঙ্কলন গ্রন্থের সন্ধান পাইয়াছি তন্মধ্যে মাত্র একখানি সঙ্কলন গ্রন্থে সঙ্কলয়িতার নাম আছে। সঙ্কলয়িতার নামযুক্ত সঙ্কলন গ্রন্থখানি ১৮৯৫ ইং এন্ট্রান্স পরীক্ষার জন্য ১৮৯২ ইং মুদ্রিত হইয়াছিল। এই সঙ্কলন গ্রন্থের সঙ্কলয়িতা বঙ্কিমচন্দ্র। এই সঙ্কলন গ্রন্থের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র

লিখিত ১১/২ পৃষ্ঠাব্যাপী এক ইংরাজী ভূমিকা আছে। এই ভূমিকা, সূচীপত্র ও আখ্যাপত্র যথাযথ উদ্ধৃত হইল —

Preface

One of the objects kept in view in this compilation has been to place before the student as great a variety of style as in possible in a small volume like the present. I have admitted on this ground, a few short extracts from the older poets, whose quaint and now antiquated style is as superior to that of their modern successors in vigour and raciness, as it is inferior to it in elegance and refinement.

I have also taken care that the matter should be equally varied, and should enable the young student to form some idea of ancient as well as modern Hindu thought and culture. The passage specially translated from the Mahabharata, Pandit Iswar Chandra Vidyasagar's beautiful renderings from Kalidasa. Babu Bhudeb Mukerjee's masterly studies of modern Bengali life, and Babu RajKrishna Mukerjee's lucid expositions of the most advanced European thought in his singularly charming style, will present the student with reading as varied as useful, and with instruction which, although almost indispensably necessary to him, he cannot expect to obtain from his English text-books. There are many who do not accept the views put forward in some of these extracts, but it is impossible to find anything in Bengali literature, or in any literature, to which all parties will subscribe. The best way of training the minds of young men is not to restrict them to any particular groove of thought. Among the results of education, scarcely anything is more valuable than the capacity to consider questions that arise from different and even opposite points of view.I have not therefore thoght it proper to confine the extracts to what will meet with universal acceptance, to the exclusion of what will best benefit the student.

A word about Grammar, Bengali Grammar is still in some respects in an unsettled state. Purists insist on a rigid adherence to the rules of Sanskrit Grammar in all cases to which they can be made applicable, while others contend that whatever is sanctioned by the usage of the best writers is admissible. In the present volume I have allowed each writer to retain his own Grammar, confining my own duty as Editor to correction of obvious errors and misprints.

I have admitted extracts from my own writings with some reluctance. They had a place in all previous selections; their exclusion now for the first time would have required some explanation, and I had none to offer.

The student will probably find the present volume of selections more difficult than any of its predecessors. But students who do not take the trouble of acquiring a classical language must be prepared to give to their own vernacular, more time and attention that they have hitherto done. They have hitherto enjoyed an unfair advantage over those who take up a classical language, and they must not complain now that the balance is sought to be redressed.

Bankim Chandra Chatterjee

সূচীপত্র

গদ্য

	পৃষ্ঠা
মহাভারত —রুক্ষ-পার্শ্ব নকুল	১
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর —তপোবন, শকুন্তলার বিদায়	৭, ১২
অক্ষয়কুমার দত্ত - স্বপ্ন দর্শন - বিদ্যা-বিষয়ক	১৬
প্যারীচাঁদ মিত্র -প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে স্ত্রীলোকদিগের সম্মান	২৩
ভূদেব মুখোপাধ্যায় -অর্থসঞ্চয়, অতিথিসেবা, বাল্যবিবাহ, বৈধব্যব্রত	২৫, ৩০, ৩৪, ৩৭
রাজাকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় - সভ্যতা, মনুষ্যে ও বাহ্যজগত	৪১,৫৩
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় - মনুষ্যে ভক্তি, ভালবাসার অত্যাচার, একা	৬৮, ৭৬, ৮২

পদ্য

মুকুন্দরাম চক্রবর্তী - প্রকৃতি	৮৯
ভারতচন্দ্র - শিবের দক্ষালয়ে যাত্রা, দক্ষযজ্ঞনাশ, মানসিংহের সৈন্যে ঝড়বৃষ্টি, মানসিংহের যশোর যাত্রা, মানসিংহ ও প্রতাপ-আদিত্যের যুদ্ধ	৯১, ৯২,৯৩,৯৪,৯৫
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত - ঝড়	৯৮
মাইকেল মধুসূদন দত্ত - সীতা ও সরমা	১০১
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় - চাতক পক্ষীর প্রতি, অশোক তরু, দেবনিদ্রা	১০৮,১১২,১১৪
রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় - ঊষা	১২২
এই গ্রন্থের আখ্যা-পত্র —	

Bengali Selections/Appointed by the/Syndicate of the Calcutta University/For the/Entrance Examination/1895/Compiled by/Bankim Chandra Chatterjee/Calcutta/ Thacker, Spink & Co.,/Publishers to the University/1892/ পৃষ্ঠা ৫ + ১২৭ , আকার ২১$^{1}/_{2}$ x ১৪ সেন্টিমিটার।

এন্ট্রান্স, বি.এ. ও এম.এ. বাংলা পরীক্ষার প্রশ্নপত্র

১৮৫৭ ইং ৬ই এপ্রিল সোমবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম এন্ট্রান্স পরীক্ষা আরম্ভ হইয়াছিল। ৭ই এপ্রিল মঙ্গলবার অন্যান্য ভাষার সঙ্গে বাংলা পরীক্ষাও গৃহীত হয়। এই বাংলা পরীক্ষার পরীক্ষক ছিলেন বিশপ কলেজের অধ্যাপক রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। বহু অনুসন্ধান করিয়াও প্রথম এন্ট্রান্স পরীক্ষার কোন প্রশ্নপত্রের সন্ধান পাই নাই। ১৮৫৮ ইং

এন্ট্রান্স পরীক্ষার দ্বিতীয় বৎসর; ১লা মার্চ সোমবার ইংরাজী, ২রা মার্চ মঙ্গলবার বাংলা পরীক্ষা গৃহীত হইয়াছিল। এই বৎসর ৫ই এপ্রিল সোমবার প্রথম বি.এ পরীক্ষা আরম্ভ হয়, ৬ই এপ্রিল মঙ্গলবার বাংলা পরীক্ষা গৃহীত হইয়াছিল। ১৮৫৮ ইং এন্ট্রান্স ও বি.এ. পরীক্ষার বাংলার পরীক্ষক ছিলেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। ১৯২০ ইং প্রথম বাংলা এম.এ. পরীক্ষা গৃহীত হয়। প্রশ্নপত্রের সঙ্গে প্রশ্নকর্তার নামও মুদ্রিত হইত। নিম্নে বিদ্যাসাগর রচিত ১৮৫৮ ইং এন্ট্রান্স ও প্রথম বি.এ. পরীক্ষার বাংলা প্রশ্নপত্র উদ্ধৃত হইল। বিকল্প ভাষা ও মৌলিক ভাষার প্রশ্নপত্র অর্থাৎ পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম পত্রের প্রশ্নপত্র উদ্ধৃত হইল না।

Entrance Examination

1858

Tuesday, March 2nd Morning 10 to 11/2

Bengali

Examiner Pundit Eshwar Chunder Bidyasagur.

রাজ্যখণ্ড ছাড়ি রাম যান বনবাসে। শিরে হাত দিয়া কান্দে সভে নিজ বাসে।।
মাঝে সীতা আগে পিছে দুই মহাবীর। তিনজন হইলেন পুরীর বাহির।।
স্ত্রী পুরুষ কান্দে যত অযোধ্যা নগরী। জানকীর পাছে ধায় অযোধ্যার নারী।।
যে সীতা না দেখিলেন সূর্য্যের কিরণ। হেন সীতা বনে যান দেখে সর্ব্বজন।।
যেই রাম ভ্রমেন সোনার চতুর্দ্দোলে। হেন প্রভু রাম পথ বহেন ভূতলে।।
কোথাও না দেখি হেন কোথাও না শুনি। হাহাকার করে বৃদ্ধ বালক রমণী।।
জগতের নাথ রাম যান তপোবনে। বিদায় হইতে যান পিতার চরণে।।
বুদ্ধি নাহি ভূপতির হরিয়াছে জ্ঞান। রাম বনে গেলে তাঁর কিসে রবে প্রাণ।।
রাজারে পাগল কৈল কৈকেয়ী রাক্ষসী। রাম হেন পুত্র যার হৈল বনবাসী।।
মনে বুঝি রাজার যে নিকট মরণ। বিপরীত বুদ্ধি হয় এই সে কারণ।।
জানকী সহিত রাম যান তপোবন। রাজ্য সুখভোগ ছাড়ি চলিল লক্ষ্মণ।।

Answer the following questions -

a. রাজ্যখণ্ড ছাড়ি রাম যান বনবাসে। — রাম কি জন্যে রাজ্যখণ্ড ছাড়িয়া বনবাসে চলিলেন তাহার সবিশেষ লিখ। b. যে সীতা না দেখিলেন সূর্য্যের কিরণ— ইহার অর্থ ও তাৎপর্য্য কি? c. রাম পথ বহেন ভূতলে। — ইহার অর্থ কি? d. বন ও তপোবন এই উভয়ের বিশেষ কি বল? e. বুদ্ধি নাহি ভূপতির হরিয়াছে জ্ঞান। —এস্থলে হরিয়াছে ক্রিয়ার কর্তা কে? f. রাজারে পাগল কৈল কৈকেয়ী রাক্ষসী — তাহাকে রাক্ষসী বলিল কেন, সেই বা রাজাকে কিরূপে পাগল করিল; এস্থলে পাগল শব্দের অর্থ কি? আর পাগল শব্দের প্রকৃত অর্থের সহিত ঐ অর্থের ভেদ কি? g. মনে বুঝি রাজার যে নিকট মরণ। বিপরীত বুদ্ধি হয় এই সে কারণ। — ইহার অর্থ কি? রাজ্য সুখভোগ ছাড়ি চলিল লক্ষ্মণ। — লক্ষ্মণ কি জন্যে রাজ্য সুখভোগ ছাড়িয়া চলিলেন এবং কোথাই বা চলিলেন বল?

2. Turn the following lines into prose -

পিতৃশোক ভাতৃশোক মায়ের অযশ। ভরত করেন দেখ রজনী দিবস।।
আমা হেতু পিতা মরে ভ্রাতা বনবাসী। এতেক জানিলে কেন দেশে আমি আসি।।
বশিষ্ঠ বলেন তুমি ভরত পণ্ডিত। তোমারে বুঝাব কত এ নহে উচিত।।
সত্য পালি ভূপতি গেলেন স্বর্গবাস। তাহার কারণে কান্দ হয় পুণ্য নাশ।।
রাম হেন পুত্র যার গুণের নিধান। কে বলে মরিল রাজা আছে বিদ্যমান।।
এই রূপে বুঝান বশিষ্ঠ মহামুনি। ভরত না শুনে কিছু কহে খেদ বাণী।।
কিমতে ধরিব প্রাণ পিতার মরণে। কিমতে ধরিব প্রাণ রামের বিহনে।।
কিরূপে হইব স্থির কাহারে নিরখি। দুই শোকে প্রাণ রহে কোথাও না দেখি।।
শশধর যেমন হইলে মেঘাচ্ছন্ন। বিবর্ণ ভরত আমি তেমনি বিষণ্ণ।।

3. পরে রজনীতে আত্মীয়বর্গের সহিত নির্জনস্থানে বসিয়া পাত্রকে আহ্বানপূর্বক সকলকে পত্রার্থ জ্ঞাত করাইয়া কহিলেন তোমরা বিবেচনা কর ইহার কি কর্তব্য।

প্রধান প্রধান সকল মন্ত্রিরা নবাবের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া আমাকে আজ্ঞালিপি লিখিয়াছেন।

ক্ষণেক পরে পাত্র নিবেদন করিলেন মহারাজ! দেশাধিকারীর বিষয়ে অতি সাবধানপূর্বক বিবেচনা করিতে হইবেক। ইহা স্থির হইলে কিঞ্চিৎকালের পর পাত্র প্রেরিত হইলেন। হঠাৎ মহারাজের যাওয়া পরামর্শ সিদ্ধ হয় না।

Answer the following questions -

1. নির্জন, পত্রার্থে, আজ্ঞালিপি, পরামর্শ সিদ্ধ - ইহার মধ্যে কোন পদে কোন সমাস হইয়াছে বল। 2. অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া - এস্থলে অত্যাচারে কোন কারক? 3. অতি সাবধানপূর্বক বিবেচনা করিতে হইবে - এস্থলে হইবে ক্রিয়ার কর্তা কে?আর সাবধানপূর্বক এই প্রয়োগ শুদ্ধ কি অশুদ্ধ; যদি অশুদ্ধ বোধ কর তাহার কারণ বল। 4. পাত্র প্রেরিত হইলেন - ইহা কোন বাচ্যের প্রয়োগ, এই বাচ্যের কর্তা কর্ম ক্রিয়া দেখাইয়া দাও।

Tuesday, March 2nd Afternoon 2 to $5\frac{1}{2}$ Bengali.

Examiner, - Pundit Eshwar Chunder Bidyasagur.

1.Translate the following lines into English -

রাজা বাসায় আসিয়া মহারাজ মহেন্দ্র, রাজা রাজনারায়ণ, রাজা রাজবল্লভ ও জগৎশেঠ এবং মীরজাফর আলিখাঁ, ইহাদিগের সহিত সাক্ষাতের বাসনায় লোক প্রেরণ করিলেন। তাহাতে সকলেই অনুমতি করিলেন রাত্রে আসিতে কহিও। ক্রমে ক্রমে রাজা সকলের নিকট রাত্রে গমন করিয়া আত্মনিবেদন করিলেন। জগৎশেঠ কহিলেন, এ দেশে অত্যন্ত উপদ্রব হইয়াছে, দেশাধিকারী অতি দুরন্ত, কাহারো বাক্য শুনে না, দিন দিন অত্যাচার বৃদ্ধি হইতেছে; অতএব সকলে ঐক্যমত অবলম্বনপূর্বক উপায় চিন্তা না করিলে, কাহারো নিষ্কৃতি নাই, দেশ অচিরাৎ উচ্ছন্ন দশায় নিপতিত হইবেক। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় এতাবদ্বৃত্তান্ত আকর্ণন করিয়া কহিলেন, আপনারা রাজদ্বারের কর্তা, আমি আপনাদিগের মতাবলম্বী; যেরূপ কহিবেন সেইরূপ কার্য করিব। ইহা শুনিয়া জগৎশেঠ কহিলেন, আপনি বাসায় যাউন; আমি মহারাজ মহেন্দ্রের

সহিত পরামর্শ করিয়া নিভৃত স্থানে বসিয়া আপনাকে ডাকাইব। ইহা স্থির হইলে, রাজা বিদায় হইয়া বাসায় গেলেন।।

2. Translate the following sentences in Bengali -

1. The air is really a heavy substance, although it seems to be so light.

2. Every day the sun rises in the sky until noon, and then descends again until evening, when it sets entirely out of sight.

3. At night, after the sun has set, the surface of the earth sends back into the air a great deal of the heat it had received during the day, and consequently then becomes much colder than the air.

4. When solid substances are made intensely hot, they are changed into liquids. If they are subjected to still higher degrees of heat, the liquid becomes vapour.

5. Man has within his throat a little instrument or organ, by means of which he can produce sound whenever he pleases. This is called the organ by voice.

Examination Papers 1858. Bechelor of Arts

Tuesday, April 6th Morning 10 to $1\frac{1}{2}$ Bengali

Examiner, - Pundit Eshwar Chandra Bidyasagar.

Mohabharat

মুনি বলে মহাশয়, শুন শ্রী জনমেজয়, হেন মতে নিবসে পাণ্ডব।
একদিন আচম্বিত, শ্রী নারদ উপনীত, সর্বত্র গমন মনোজব।।
জ্ঞেয় জ্ঞান যোগ্য যুজ্য অমর অসুর পূজ্য, চতুর্বেদ জিহ্বাগ্রেতে বৈসে।
ব্রহ্মার অঙ্গেতে জন্ম, বিজ্ঞ যত ব্রহ্মকর্ম, ব্রহ্মাণ্ড সৃজেন অনায়াসে।।
পরমার্থ অনুবন্ধি, বিজ্ঞেয় বিগ্রহ সন্ধি, কলহ গায়নে বড় প্রীত।
শিরেতে পিঙ্গল জটা, ললাটে পিঙ্গল ফোঁটা, শ্রবণে কুণ্ডল উল্লাসিত।।
মুখে হরি নাম স্রবে, ভুজস্থ বীণার রবে, গতি মন্দ যেমন মাতঙ্গ।
বারিজ নয়ন যুগে, বহে বারি যেন মেঘে, পুলকে কদম্ব পুষ্প অঙ্গ।।
শরদিন্দু মুখাম্বুজ, আজানুলম্বিত ভুজ, প্রজ্বল অনল দীপ্তকায়।
পরিধান কৃষ্ণাজিন, সঙ্গে মুনি কত জন, উপনীত পাণ্ডব সভায়।।
দেখিয়া নারদ ঋষি, যে ছিল সভায় বসি, সম্ভ্রমে উঠিল ততক্ষণে।
আস্তে ব্যস্তে ধর্মসুত, সহোদরগণ যুত, প্রণাম করেন সে চরণে।।
সুগন্ধ উদক দিয়া, পদযুগ পাখালিয়া, বসিতে দিলেন সিংহাসন।
যথা শিষ্ট ব্যবহার, পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া তাঁর, ভক্তিভাবে করেন পূজন।।
তবে মুনি স্নেহবশে, জিজ্ঞাসেন মৃদুভাষে, কহ রাজা ভদ্র আপনার।
কুলের কৌলিক কর্ম, ধন উপার্জন ধর্ম, নির্বিঘ্নেতে হয় কি তোমার।।
সাধু বিজ্ঞ যত জন, অনুরক্ত মন্ত্রিগণ, এসবার রাখ কি বচন।
একক অনেক সহ, বিচার কি না করহ, কার্য্যে না কি রাখ মুখ্যগণ।।

ভক্ষ দ্রব্য যথাযথ, ন্যায় মূলে কিন কত, না রাখত দ্বিজের দক্ষিণা।
তব ত রক্ত যত, ভয়ে কি শরণাগত, দুঃখত না পায় কোন জনা।।
বিজ্ঞ যোগ্য পুরোহিত, দৈবজ্ঞ জ্যোতিষবিত, আছে কি বন্দক বিনোদক।
অনাথ অতিথি লোকে, আগুন ব্রাহ্মণ মুখে, সদা দেহ ঘৃত অন্নোদক।।
রাজ্যের যতেক রাজা, পায় যথোচিত পূজা, সবে অনুগতত তোমার।
ধানা ধন বহুমত, উদক আয়ুধ যত, পূর্ণ করিয়াছত ভাণ্ডার।।
প্রাত:কালে নিদ্রাবেশ, বৈকালেতে ক্রীড়ারস, আলস্য ইন্দ্রিয় নিবারণ।
ধর্ম কর্মে ধন ব্যয়, কর নিত্য উপচয়, পুত্রবৎ পাল প্রজাগণ।।

1. সর্বত্র গমন মনোজব — এ স্থলে মনোজব পদের অর্থ কি? এই পদে সমাস আছে কি না? যদি থাকে সে সমাসের নাম কি ? যে দুই শব্দে সমাস হইয়াছে উহাদিগের পৃথক পৃথক অর্থ লিখ।
2. বিজ্ঞ যত ব্রহ্ম কর্ম - ইহার অর্থ স্পষ্ট করিয়া লিখ।
3. পরমার্থ অনুবন্ধি, বিজ্ঞেয় সন্ধি, কলহ গায়নে বড় প্রীত - এই শ্লোকার্দ্ধের অর্থ কি?
4. বারিজ নয়ন যুগে, বহে বারি যেন মেঘে, পুলকে কদম্ব পুষ্প অঙ্গ বারিজ নয়ন যুগে এই স্থলে বারিজ শব্দের অর্থ কি? এই শব্দে ঐ অর্থ বুঝায় কেন? আর এই শব্দের সহিত নয়ন শব্দের কি রূপে অন্বয় হইবেক? নারদের নয়ন যুগে কি কারণে বারি বহিতেছে? পুলকে কদম্ব পুষ্প অঙ্গ — ইহার অর্থ ও তাৎপর্য কি?
5. শরদিন্দু মুখাম্বুজ, আজানুলম্বিত ভুজ, প্রজ্বল অনল দীপ্তকায় — এই শ্লোকার্দ্ধের অর্থ লিখ, কোন স্থলে কি সমাস আছে বল? এবং যে কয়েকটি শব্দ আছে পৃথক পৃথক লিখিয়া প্রত্যেকের অর্থ লিখ।
6. পরিধান কৃষ্ণাজিন - কৃষ্ণাজিন পদের অর্থ কি? এক শব্দ কি দুই শব্দ? যদি দুই শব্দ হয় তবে পৃথক করিয়া লিখ, আর এই দুই শব্দে কি সমাস আছে, এবং সমাস হইয়া দুই শব্দের কি অবয়ব পরিবর্ত্ত হইয়াছে বল?
7. দেখিয়া নারদ ঋষি, যে ছিল সভায় বসি, সম্ভ্রমে উঠিল ততক্ষণে - এই স্থলে ঋষি পদে কোন কারক আছে বল? উঠিল ক্রিয়ার কর্তা কে? ততক্ষণে এই পদের অর্থ কি?
8. আস্তে ব্যস্তে ধর্মসুত, সহোদরগণ যুত - ধর্মসুত শব্দে কোন ব্যক্তিকে বুঝাইতেছে? এই শব্দে ঐ ব্যক্তিকে বুঝায় কেন?
9. সুগন্ধি উদক দিয়া - এ স্থলে 'দিয়া' ক্রিয়াপদ কি না?
10. যথা শিষ্ট ব্যবহার - এই অংশের অর্থ কি?
11. কার্যে না কি রাখ মুখ্যগণ - ইহার অর্থ লিখ?
12. তব অনুরক্ত যত, ভয়ে কি শরণাগত - ইহার অর্থ কি? আর শরণাগত পদে কি সমাস হইয়াছে বল? এবং এই দুই শব্দের পৃথক পৃথক অর্থ লিখ?
13. বিজ্ঞ যোগ্য পুরোহিত, দৈবজ্ঞ জ্যোতিষবিত, আছে কি বন্দক বিনোদক - দৈবজ্ঞ, বন্দক ও বিনোদক শব্দের অর্থ স্পষ্ট করিয়া লিখ।
14. অনাথ অতিথি লোকে, আগুন ব্রাহ্মণ মুখে, সদা দেহ ঘৃত অন্নোদক - এই শ্লোকার্দ্ধের অর্থ কি?
15. প্রাত:কালে নিদ্রাবেশ —ইত্যাদি এই শ্লোকের অর্থ লিখ।

Pooroosh Parikhya

গোদাবরী নদী তীরে বিশালা নামে এক নগরী তাহাতে সমুদ্র সেন নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্র চন্দ্রসেন নামা তিনি অত্যন্ত সরল হৃদয়। তাঁহাকে দেখিয়া সেই নগরবাসী কোন বঞ্চক বণিক্ রাজপুত্রের ধনাপহরণে চিন্তা করিল। তাহা পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন, যেমত মৃগ সকল ব্যাঘ্রের ভক্ষণীয় হয়, এবং সর্পেরা গরুড়ের ভক্ষ্য হয়, এবং অন্য পক্ষিগণ সাঁচান পক্ষির ভক্ষ্য হয়; সেই প্রকার সাধু লোক কুলোকের ভক্ষণীয় হয়। অতএব বণিক্ বিবেচনা করিল যে এই রাজকুমারের অতি সুপ্রকৃতি ইহার ধন আমার সুখগ্রাহ্য হইবে, সেই কারণ উপাসনা করি। পরে বণিক্ সেই রাজপুত্রের সেবা করিতে লাগিল। তিন্তিড়ী ফলের ন্যায় দুর্জনের প্রকৃতি প্রথম সুরসা পরিণামে বিরসা হয়। বণিক্ সেই প্রকৃতি দ্বারা সেবা করত নানোপসনাতে রাজকুমারকে বশীভূত করিল।

Answer the following questions -

1. সাধুলোক কুলোকের ভক্ষণীয় হয়, — ইহার অর্থ ও তাৎপর্য কি?
2. ইহার ধন আমার সুখগ্রাহ্য হইবে — এ স্থলে সুখগ্রাহ্য শব্দের অর্থ কি বল?
3. তিন্তিড়ী ফলের ন্যায় দুর্জনের প্রকৃতি প্রথম সুরসা পরিণামে বিরসা হয় — ইহার অর্থ ও তাৎপর্য লিখ।

Tuesday April 6th Afternoon 2 to 5½ Bengali

Examiner, - Pundit Eshwar Chandra Bidyasagar.

এক দিবস মাধব্য, প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া, যৎপরোনাস্তি বিরক্ত হইয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, এই মৃগয়াশীল রাজার সহচর হইয়া আমার প্রাণ গেল। প্রতিদিন প্রাত:কালে মৃগয়ায় যাইতে হয়, এবং এই মৃগ, ঐ বরাহ, এই শার্দ্দুল, এই করিয়া মধ্যাহ্ন কাল পর্যন্ত বনে বনে ভ্রমণ করিতে হয়। গ্রীষ্মকালে পল্লল ও নদ নদী সকল শুষ্ক প্রায় হইয়া আইসে; যে অল্প প্রমাণ জল থাকে, তাহাও বৃক্ষের গলিত পত্র সকল অনবরত পতিত হওয়ায়াতে অত্যন্ত কটু ও কষায় হইয়া উঠে। পিপাসা পাইলে সেই বিরস বারি পান করিতে হয়। আহারের সময় নিয়মিত নাই ; প্রতিদিন অনিয়ত সময়েই আহার করিতে হয়। আহার সামগ্রীর মধ্যে শূল্য মাংসেই অধিকাংশ, তাহাও প্রত্যহ সুচারুরূপ পাক করা হয় না। আর প্রাত:কাল অবধি মধ্যাহ্ন কাল পর্যন্ত অশ্ব পৃষ্ঠে পরিভ্রমণ করিয়া সর্ব শরীর বেদনায় এরূপ অভিভূত হইয়া থাকে, যে রাত্রিতেও সুখে নিদ্রা যাইতে পারি না। রাত্রি শেষে নিদ্রার আবেশ হয়; কিন্তু ব্যাধগণের বন গমন কোলাহলে অতি প্রত্যুষেই নিদ্রাভঙ্গ হইয়া যায়; ত্বরায় যে এই সকল ক্লেশের অবসান হইবেক তাহারও সম্ভাবনা দেখিতেছি না। সে দিবস আমরা পশ্চাৎ পড়িলে, একাকী এক মৃগের অনুসরণক্রমে তপোবনে প্রবিষ্ট হইয়া, আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে শকুন্তলা নাম্নী এক তাপস কন্যা নিরীক্ষণ করিয়াছেন। তাহাকে দেখিয়া অবধি আর নগর গমনের কথাও মুখে আনেন না। এই ভাবিতে ভাবিতেই রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল, একবারও চক্ষু মুদি নাই।

Translate the following passage into Bengali -

"Having resided at Agra till there was no more to be learned, I travelled into Persia, where I saw many remains of ancient magnificence, and observed many

new accommodations of life. The Persians are a nation eminently social, and their assemblies afforded me daily opportunities of remarking characters and manners, and of tracing human nature through all its variations. From Persia, I travelled through Syria, and for three years resided in Palestine, where I conversed with great numbers of the Northern and Western nations of Europe; the nations which are now in possession of all power and all knowledge, whose armies are irresistible, and whose fleets command the remotest parts of the globe. When I compared these men with the natives of our own kingdom, and those that surround us, they appeared almost another order of beings. In their countries it is difficult to wish for any thing that may not be obtained; a thousand arts, of which we never heard, are continually labouring for their convenience and pleasure; and whatever their own climate has denied them, is supplied by their commerce."

প্রধান ভাষা বাংলা এম.এ. পরীক্ষার প্রশ্নপত্র (১৯২০ ইং)

History of the Bengali Language and Literature. First Paper - First half

Examiner - Rai Bahadur Dr. Dinesh Chandra Sen, BA., D Litt. Unless otherwise specified candidates may write their answers either in English or in their own Vernaculars.

Only Three Questions to be attempted. The questions carry equal marks.

1. Show how far our language and literature have been influenced by the Islamite conquest.
2. Trace the gradual growth of the Bengali metres from the earliest times down to the 18th Century.
3. Give a brief account of the Yatras of the old school, with a critical review of the works of some of the prominent Yatrawalas.
4. What are the striking literary features of the period dominated by the influence of the court of Krishnachandra? Comment on their peculiar merits and defects.
5. Clearly indicate the literary and religious evolution in Bengal brought about by the Pouranik Renaissance.
6. Give a critical estimate of the poems of Ramprasad, Alwaal, and Nidhu Babu.

Second Half

Examiner - Dr. Abhay Kumar Guha, M.A., Ph.D. Unless otherwise specified, candidates may write their answers either in English or in their own Vernaculars.

Only three questions to be attempted

The questions carry equal marks.

1. Give an estimate of the Vaishnava Theology propounded by Rama Ray to Chaitanya as narrated in the Chaitanya Chartamrita.
2. Show the influnece of Chaitanya's life on the songs of some of the Vaishnava Pada Kartas, particularly on Krishna Kamal Goswami, illustrating your remarks by reference to his Divyanmada.
3. Give a critical estimate of any one of the following works -
   (a) Chaitanya Charitamrita.
   (b) Govinda Dasa's Karcha.
   (c) Prema-Vilasa.
4. Give a full account of the post-Chaitanyic Vaishbava movement in Bengal, with special reference to Sreenivasa, Narottama and Syamananda.
5. Give a comparative review of the lyrical song's of Vidyapati and Chandidasa, illustrating your answer with quotations from each.
6. Mention some of the noteworthy incidents of Chaitanya's tour in the Deccan, with special reference to the Muraris, Naroji, Barmukhi and Bhilpantha.

Old Texts Second Paper -First Half

Unless otherwise specified, candidates may write their answers either in English or in their own Vernacular. The answers to the two halves are to be written in separate books.

Examiner - Rai Bahadur Dr. Dines Chandra Sen B.A., D.Litt.

Only three to be atempted. The questions are of equal value.

1. Explain with reference to the context and unfolding all allusions -
   (a) হিরা মন মাণিক্য লোকে তলিতে শুখাইত। কাহার পুস্কনীর জল কেহ না খাইত।। কাহার বাটীতে কেহ উদার না চাইত। সোনার ঢেপুয়া লৈয়া বাল্লকে খেলাইত।। হাড়াইলে ঢেপুয়া পুনি না চাহিত যার। এমতে গোআইল লোকে হরিষ অপার।। মেহারকুল বেড়ি ছিল মুলি বাশের বেড়া। গৃহস্তের পরিদান সোনার পাছরা।। গরীবে চড়িবে ফিরে খাসা তাজী ঘোড়া। ফকিরের গাহে দিত কাপড় জোড়া।। তোমার বাপের কালেরা সব ছিল ধনী। সোনার কলসি ভরি লোকে খাইত পানী।।
   (b) শেত বান্দা এড়ি যামু হারিয়া ছৌহর।। অদুনা পদুনা এড়ি যাইমু কার ঘর।। দাফারে এড়িয়া যাবে সত্তের কায়ন বেত। গোঞালে এড়িয়া যাবে গাই বার শত।। এইসব এড়ি যাবে আপনে জানিয়া। নএয়ান গড় এড়ি যাবে উনশত বানিয়া।। বাপের মিরাশ এড়ি যাইমু গৈরব সহর। দাদার মিরাশ যাবেক কমলাক নগড়।। তুম্মি মাএর যত বাড়ী কনিকা নগড়া। আম্মি বাড়ী বান্দিয়াছি মেহারকুল সহর।। চল্লিশ রাজাএ কর দেএ আম্মার গোচর। আম্মা হৈতে কোনজন আছয়ে ডাঙ্গর।।

2. Translate into English -

(a) তুড় তুড় করিয়া ময়না হুঙ্কার ছাড়িল। বেয়াল্লিশ ভইস হৈল মুরত বদলাইয়া।। ঐ দরিয়া ভইস পড়িল ঝম্প দিয়া। খার খাইতে খাইতে যমক নি যায় পিটিয়া।। মধ্য দরিয়াত যমক ধরিল ঠাসিয়া। ঐ ত গোদা যম আটিয়া বজ্জর। ডাইন পিড়ের দন্ড ভাঙ্গিয়া উঠিয়া দিল লড়। ঐটে হইতে গোদা যম দিশাহারা হইল। ছেফলাঁ মৎস্য হইয়া জলত ভাঙ্গিবার লাগিল। ওরূপ থুইল ময়না একতর করিয়া।। পান কাউড়ি জানোয়ার হইল মুরত বদলাইয়া।

(b) মাণিকচন্দ্র রাজা ছিল ধর্ম্মী বড় রাজা। ময়নাক বিভা করিল তার ন্যা বুড়ি ভারযা। ময়নাক বিভা করিল রাজার না পুরিল মনের আশ।। তারপরে দ্যাবপুরের পাঁচ কন্যা বিভাকরে পুরি নেল মনের হাবিলায়।

আজি আজি কালি কালি বার বছর হল। দ্যাবপুরের পাঁচকন্যা ডাহিনী ময়না কন্দল লাগিল। দেখিবারে না পারি মহারাজ ব্যাগল করি দিল।

3. (a) Derive the words underlined in the above extracts and give geographical notes in regard to the places mentioned therein.

(b) Prove and account for the extensive popularity of the Mainamati Songs outside Bengal.

4. What historical glimpses of Bengal do you find in the Mainamati Songs in respect of her social, religious and political conditions?

5. (a) Give all up-to-date information regarding Raja Govinda Chandra as a historical character.

(b) Discuss the various allegations made against Mainamati by her son, and account for the great respect for her breathed in the poem inspite of them.

সংবাদ প্রভাকরে এবং সোমপ্রকাশে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গ

১৮৫৭ ইং ২৪শে জানুয়ারী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ার এদেশবাসী শিক্ষিত জনগণ উৎফুল্ল হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই। অনেকে আশা করিয়াছিলেন যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ফলে বাংলা চর্চার ক্ষেত্র প্রশস্ততর হইবে। কিন্তু তাঁহাদের আশা-আকাঙ্ক্ষানুযায়ী বাংলা চর্চার ক্ষেত্রে শ্রীবৃদ্ধি না হওয়ায় ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের তিন বৎসর পরে ১৮৬০ ইং ১১ই ফেব্রুয়ারী (শনিবার ৩০শে মাঘ, ১২৬৬ বাং) তারিখের সংবাদ প্রভাকরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা সম্পর্কে যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা নিম্নে যথাযথ উদ্ধৃত হইল। এই প্রবন্ধে ইংরাজী ও সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণকে যেমন উপাধি দিয়া সম্মানিত করার ব্যবস্থা ছিল অনুরূপ ব্যবস্থা বাংলাভাষা-অভিজ্ঞদের জন্যও প্রর্বত্তনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

'প্রায় তিন বৎসর অতীত হইল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। এই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিয়া তিন বৎসর কালের মধ্যে দেশীয়দের কতদূর উপকার হইয়াছে, তাহা বিবেচনা

করা উচিত। এই তিন বৎসরের মধ্যে বাঙ্গলা দেশে প্রায় ২১০০ জন ইংরেজী ছাত্র প্রবেশ পরীক্ষায় এবং প্রায় ২২ জন কৃতবিদ্য ছাত্র বি.এ. উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ত্রৈবাৎসরিক ফল দেখিয়া বিবেচনা করা উচিত, ইহাতে দেশীয়দের সামাজিক কোন উপকার দর্শিয়াছে কিনা? বিশ্ববিদ্যালয় সমাজের অধ্যক্ষ ও সভ্যেরা ইহার কি উত্তর করিবেন? অবশ্যই বলিবেন, বাঙ্গলা দেশের সৌভাগ্য দিনদিন বর্ধিত হইতেছে দেশীয় ছাত্রবর্গের ভ্রান্তিসঙ্কুল প্রাচীনমত পরিবর্ত্তিত হইয়া সুসংস্কৃত মত প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, এবং ক্রমে ক্রমে সকলেরই মনে বিদ্যাভ্যাসের বাসনা বলবতী হইতেছে। ইহাই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রধান ফল। হে পাঠকবর্গ! আপনারা ইহার কি বিবেচনা করেন? বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ও সভ্যদের এ সিদ্ধান্ত সত্য কিনা? বোধ হয় এ সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ সত্য নহে। বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পূর্ব্বে আমরা যে সকল আশা ভরসা করিয়াছিলাম এক্ষণে দেখিতেছি, সে সকল কোন কার্য্যেরই হইল না। আমরা মনে করিয়াছিলাম রাজধানীতে ইঙ্গলণ্ডীয়রীতি মতে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইলে আমাদের দেশীয় ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সহকারে তাহার আদর ও গৌরববৃদ্ধি হইবে, সকলেই পূর্ব্ববৎ ঘৃণা পরিত্যাগ করিয়া আদরপূর্ব্বক দেশীয় ভাষার অনুশীলন আরম্ভ করিবে, এবং অবিলম্বেই দেশীয় ভাষা ও বিদ্যা সুসংস্কৃত ও সুসম্পন্ন হইয়া উঠিবে। কৈ এক্ষণে তাহার কিছুই দেখিতে পাই না, বরং দিন দিন দেশীয় ভাষার শ্রী হ্রাস সহকারে তাহার সঞ্চিত গৌরবের হানি হইতেছে ইহা সাধারণ দুঃখের বিষয় নহে।

বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন দেশের মঙ্গল সাধনের এক প্রধান উপায়। ইহা আমরা অবশ্য স্বীকার করি। তবে কেন দুর্ভাগ্য বাঙ্গলা দেশে বিশ্ববিদ্যালয়বৃক্ষে এরূপ কুফল ফলিতেছে? হে পাঠকবর্গ! কলিকাতা রাজধানীতে এই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনাবধি বিদ্যালয়ের সমুদায় ছাত্রগণেরই মন ইঙ্গরেজী ভাষার প্রতি আসক্ত হইয়াছে। ইঙ্গরাজী ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইব, ইহাই সকল ছাত্রের ইচ্ছা। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সুবিজ্ঞ অধ্যক্ষ মহাশয়েরা নিয়ম করিয়াছেন, ছাত্রদিগকে দুইটি ভাষায় পরীক্ষা দিতে হইবে। ইঙ্গরেজী ভাষাই পরীক্ষার প্রধান অঙ্গ। ইহা না হইলে চলিবে না। তাহার সঙ্গে অন্য কোন একটি ভাষার আবশ্যক। তাঁহাদের নিয়মানুসারে সকল ছাত্রেরাই অগ্রে কেবল ইঙ্গরেজী ভাষায় নৈপুণ্য লাভ করিতে অগ্রসর হয় দেশীয় ভাষার প্রতি তাহাদের আর তাদৃশ মনোযোগ থাকে না। অতএব যাহাতে দেশীয় ভাষার কোন প্রকারে অবনতি না হইয়া উন্নতি হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষগণের সে বিষয়ে মনোযোগ করা নিতান্ত কর্ত্তব্য।

দেশীয় ভাষার উন্নতি সাধন করা গবর্ণমেন্টের ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্রে কর্ত্তব্য। ইঙ্গরেজী ভাষা ও আমাদের সংস্কৃত ভাষার যেরূপ উপাধি পরীক্ষা ও উপাধি গ্রহণের রীতি আছে, আমাদের মতে বাঙ্গলা ভাষাতেও সেইরূপ রীতি প্রচারিত করা অতি আবশ্যক। বাঙ্গলা ভাষার স্বতন্ত্র রূপে উপাধি পরীক্ষার রীতি প্রচারিত হইলে বড় এক দেশের মঙ্গল সাধনের উপায় হয়। বোধ হয় তাহা হইলে আমাদের দেশীয় দশ বার বৎসরের বালকেরা অনায়াসে প্রথম উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিবে। সেই সকল মাতৃভাষা নিপুণ বালকেরা যদি পরে ইঙ্গরেজী ভাষা নিপুণ হইয়া ইঙ্গরেজী উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় তাহা হইলে কি এক পরমাহ্লাদেরই বিষয় হইবে!

প্রসঙ্গ: মানুষ-নির্মাণ

অরুণ মুখোপাধ্যায়

প্রায় পঁচিশ বছরের অধ্যাপনার জীবনে একটি প্রশ্ন বহুবার শুনতে হয়েছে বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে —'আপনাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কী রকম ছেলে-মেয়ে তৈরী করছেন মশাই আপনারা, শিব গড়তে গিয়ে যে বাঁদর তৈরী হচ্ছে, অথচ প্রকৃত শিক্ষাদানকে ব্রত হিসেবে গ্রহণ করছেন আপনারা।' এ কথা ঠিক যে, আগের দিন হলে এই অভিযোগবহ প্রশ্নটির তাৎপর্য ছিল, কেননা ছাত্রদের ঠিক মত মানুষ করে গড়ে তোলা, তাদের চরিত্র-গঠনের ভার শিক্ষকদের দায়িত্বের ওপর ছেড়ে দিয়ে সমাজ নিশ্চিন্ত থাকত। অন্য দিকে শিক্ষকরাও মনে করতেন— এটা তাঁদেরই দায়িত্ব ও কর্তব্য। কিন্তু সময় বড় পরিবর্তনশীল। কালক্রমে সমাজ-সংসারের সব কিছুই যখন বদলে যায় তেমনি শিক্ষার উদ্দেশ্য, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব ও শিক্ষকদের কর্তব্যের স্বরূপ পরিবর্ত্তিত হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত শিক্ষার লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় জীবিকার জন্য ছাপমারা একখানা কাগজ-সংগ্রহ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি হয়ে যায় ঐ ছাড়পত্র তৈরীর কারখানা আর শিক্ষকরা পরিণত হন ঐ কারখানার বেতনভোগী কর্মীতে। একদা-শিক্ষক সাহিত্যিক মনোজ বসু শিক্ষকদের কর্তব্যস্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছিলেন 'মানুষ গড়ার কারিগর'। কিন্তু আজকাল শিক্ষকরা মানুষ গড়ে না, মানুষ নির্মাণ করতে পারে না, যদিও তাত্ত্বিকভাবে অস্বীকার করার উপায় নেই যে, শিক্ষায়তনের পরিমণ্ডলের মধ্যে শিক্ষকদের এ কাজটি অপরিহার্য ছিল।

কী ভাবে এ পরিবর্তন এল—সমাজবিজ্ঞানীরা দেখতে চাইবেন সমগ্র দেশের বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে। বস্তুত এ পরিবর্তনের ইতিহাস সময়ের দিক থেকেও খুব সংক্ষিপ্ত নয়। এ দেশে এ শতাব্দীর বিভিন্ন দশকে একটার পর একটা যে সব বিস্ফোরক, আলোড়নকারী ঘটনা ঘটতে থাকে তাদের অনিবার্য প্রভাব সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে তীব্রভাবে এসে পড়ে। তাকে এড়ানো সম্ভব নয়, কেননা এ সব ঘটনার ওপর নিয়ন্ত্রণের অবস্থা ও অধিকার সমাজের হাতে থাকে না। খুব বেশী পিছিয়ে যাওয়ার দরকার নেই, এ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে প্রায় পঞ্চম দশকের মধ্যে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের সূত্রে ঘটিত চারটি খুব বড় মাপের ঘটনার উল্লেখ করা যায়—প্রথম মহাযুদ্ধ, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, মহাদুর্ভিক্ষ ও দেশ বিভাগ। এ ঘটনা গুলি একটার পর একটা এসে আঘাতের পর আঘাত হেনে আমাদের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের নৈতিক মূল্যবোধ, সত্যনিষ্ঠা ও মানবিকতাকে প্রায় পঙ্গু করে দিয়ে যায়। আমরা আত্মার ঐশ্বর্যে প্রায় নিঃস্ব হয়ে যাই। আমাদের মনুষ্যত্ব-ভিত্তিক জাতীয় চরিত্র তৈরি হয় না।

যদিও যুদ্ধের প্রবণতা ও প্রক্রিয়া মনুষ্যজাতির আদিম রিপু, তবুও একদিকে যুদ্ধ মনুষ্যজাতির বিরুদ্ধে এক ধনপ্রাণ বিধ্বংসী ক্রিয়াকাণ্ড, অন্যদিকে মনুষ্যত্ব সংহারের হাতিয়ার। তাই সব দেশের ইতিহাসই কমবেশী যুদ্ধের ইতিহাস। পশ্চিম দেশে যুদ্ধ তাদের জীবনের অংশ ছিল। ফলে সে সমাজের মূল্যবোধের অবক্ষয়, জীবনযাপনের অনিশ্চয়তা তাদের জীবনদর্শনেই পালটে দিয়েছে যার প্রতিফলন দেখা গেছে সাহিত্যে, শিল্পে ও জীবনের আয়ত্ত নানা সৃষ্টিকর্মের বিচিত্র ধারায়। প্রাচীন ভারতেও যুদ্ধ হয়েছে, যুদ্ধ ক্ষেত্রেই তা নিবদ্ধ ছিল, সমাজের ওপর তার তীব্র কোন প্রভাব পড়েনি যেটা পড়েছে আধুনিককালের যুদ্ধ, প্রথম

মহাযুদ্ধ থেকে। সে যুদ্ধের প্রত্যক্ষভাবে এক পক্ষ ছিল না ভারত,তবে যুদ্ধলিপ্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শাসনাধীন অন্যতম দেশ বলে সে যুদ্ধের আওতায় পড়ে গিয়েছিল। তবে স্বীকার করতে হয়, যুদ্ধ একটা দেশের সামাজিক জীবনে যে অশুভ ছায়া ফেলে প্রথম মহাযুদ্ধ ভারতের ওপর ততখানি ছায়া ফেলতে পারেনি, কিন্তু সে অশুভ সূচনা একেবারে অস্বীকার করা যাবে না। আসলে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধই ভারতের সামাজিক মেরুদণ্ডটিকে নড়বড়ে করে দিল। এ যুদ্ধের প্রভাব সামাজিক জীবনে প্রবেশ করেছিল নানাভাবে। যুদ্ধের জন্য বিপুল অর্থের প্রয়োজন মেটাতে কৃত্রিমভাবে বিরাট অঙ্কের টাকা ছাপাতে হয় এবং রাস্তাঘাট, ব্রিজ, মিলিটারী ব্যারাক, এয়ার বেস, বাড়িঘর প্রভৃতি তৈরীতে এবং সৈন্য বাহিনী পোষায় ও তাদের হাতিয়ার মেটাতে জলের মত অর্থব্যয় যখন হয় তখন দেশের ব্যবসায়ী, ঠিকাদার প্রভৃতি শ্রেণীর লোক যুদ্ধের কাজ পেয়ে নানা অসাধু উপায়ে প্রচুর টাকা হাতে পেয়ে যায়। সে টাকার স্রোত চলে আসে সমাজের মধ্যে, পরিবরের মধ্যে। অল্পায়াসে অসাধু উপায়ে প্রচুর টাকা যারা তখন হাতে পেত তখন সমাজের লোক ঠাট্টা করে বলত-যুদ্ধের বাজারের বড় লোক! অর্থাৎ অসাধু উপায়ে অর্থোপার্জন সম্ভব হয়েছিল যুদ্ধকালীন টাকা বৃষ্টির সুযোগ নিয়ে। সামাজিক ও পারিবারিক অর্থনীতিতে এই বিপুল ও সহজ অর্থসরবরাহের অনিবার্য ফল হল প্রচণ্ড মুদ্রাস্ফীতি - অধিকাংশ সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস। মুদ্রাস্ফীতিজনিত এ দুরবস্থাকে আরও বাড়িয়ে দিল সমাজের মানুষের অন্নবস্ত্র ও অন্যান্য ব্যবহার্য উপকরণের বিরাট অংশ সৈন্য-পোষণের প্রয়োজনে চলে যাওয়া। সাধারণের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির ঘাটতি থেকে জন্ম নিল কালোবাজার, ভেজাল প্রভৃতির বিবেকহীন অসাধুতা - মানুষ রাতারাতি অমানুষ হয়ে গেল। আজকের কালো টাকা সে দুর্নীতিরই নব্য সংস্করণ। গোপন গুদামে মজুত করে জিনিষপত্রে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে বেশী দামে বিক্রয়ের কালোবাজারী করা ও খাদ্যদ্রব্যে তেলে মশলাপাতিতে ভেজালের ব্যবসা আজও রমরমা। স্বাধীন ভারতে এই সব অসাধু ব্যবসায়ীদর কাউকেও নিকটবর্তী ল্যাম্পপোষ্টে ঝোলানো হলে না আজও। ভেজাল প্রসঙ্গে একটি ভয়ঙ্কর ঘটনার উল্লেখ এখানে খুব জরুরী মনে হয়। কয়েক বছর আগে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল: পশ্চিম জার্মানীর একটি মেশিন টুল তৈরীর কোম্পানী দিল্লীতে ভারত সরকারের দপ্তরে একটি চিঠি ফেরৎ পাঠায়। চিঠিটি লিখেছিল কলকাতার বড়বাজার থেকে এক ব্যবসায়ী নন্দন। সে জানতে চেয়েছিল ঐ কোম্পানী সাদাপাথরকে চালের দানায় তৈরী করার মত কোন মেশিন সরবরাহ করতে পারবে কিনা। কোম্পানী জানিয়েছিল যে, এ চিঠিটি পেয়ে রীতিমত শকড্ হয়েছে তারা। ভেজালি চিন্তা কোন স্তরে পৌঁছে গেছে ভাবলে শিউরে উঠতে হয়। এ সবই হল সমাজের ওপর যুদ্ধকালীন অন্ধকারাচ্ছন্ন ঐতিহ্যের প্রভাব যা প্রজন্মের পর প্রজন্ম পেরিয়ে শুধু এগিয়েই যাচ্ছে না, আরও চক্রবৃদ্ধিহারে তা বেড়েছে, ছড়িয়ে পড়েছে রাজনৈতিক,সামাজিক ও পারিবারিক স্তরে। জাতির এই অন্ধকারকে মাঝপথে আরও ঘনীভূত করে তুলেছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর একটি মহাদুর্ভিক্ষ ও ভারত বিভাগ।

পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষ জাতির জীবনে মনুষ্য-কৃত এক চরম অভিশাপ রূপে দেখা দিয়েছিল। একদিকে খাদ্য ও জীবন ধারণের সব উপকরণের অভাব, চারদিকে শুধু অভাব, অন্যদিকে কোটি কোটি ক্ষুধার্ত মানুষের আর্তনাদ। খাদ্যাভাবে লক্ষ লক্ষ লোকের মৃত্যু শুধু নয়, একটি জাতির আত্মিক মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিয়ে দিয়েছিল ওই মহাদুর্ভিক্ষ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঐতিহ্যবাহী

যত প্রকার নৈতিক অবক্ষয় সম্ভব তা আর হতে বাকি রইল না। কালোবাজারি, ভেজাল, ঘুষ প্রভৃতি দুর্নীতি শুধু অসাধু ব্যবসায়ী, মজুতদার, প্রশাসনিক ক্ষমতায় আসীন মানুষ, টাউট্ ধান্দাবাজদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইল না, অভাবের তাড়নায়, শুধু বেঁচে থাকার তাগিদে সমাজের সর্বসাধারণ ইচ্ছায় অনিচ্ছায় সে অবস্থার শিকার হয়ে গেল, অসততা, দুর্নীতি পরিবারের মধ্যে ঢুকে গেল বেনোজলের মত।

সমাজের গায়ে শেষ কামড় বসাল ভারতের স্বাধীনতার এক অবাঞ্ছিত শর্ত হিসেবে দেশ বিভাগ, ফলত জাতীয় জীবনে এত বড় অভাবনীয় রাষ্ট্র বিপ্লব, কোটি কোটি মানুষের ছিন্নমূল জীবনের ওলট-পালট। ভৌগোলিক অর্থে চিরতরে ভিটেমাটি, সমাজ-সংস্কার হারানো শুধু নয়, এক বিরাট মানব-গোষ্ঠীকে নিক্ষেপ করা হল জীবনযাপনের অনিশ্চয়তা, অমানুষিক ভাবে বেঁচে থাকার প্রবল ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে। এত দিন ধরে ভূমি তো প্রস্তুত হয়েই ছিল, তার মধ্যে দুর্নীতির আগাছা দ্রুত বৃদ্ধি পেল, সম্বলহীন অসহায় মানুষ শুধু বেঁচে থাকার জৈবিক প্রবণতায় ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, সুনীতি-দুর্নীতির সীমারেখা মুছে দিল। সামাজিক বন্ধন, পারিবারিক বন্ধন ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল, পুরুষরা তো বটেই, পেটের জ্বালায় মেয়েরা রাস্তায় নামল, অনেকেই বিপথে চলে গেল, সমাজে অপরাধ প্রবণতা প্রচন্ডভাবে বেড়ে গেল। আজ রাজনীতিতে ও সমাজ জীবনে দুর্বৃত্তায়নের এই রমরমা অবস্থা তারই সন্ত্রসারিত রূপ।

বিজ্ঞানীরা যে সব রকেট আকাশে উৎক্ষেপণ করেন তার নীচের অংশ উপরের অংশকে ধাক্কা মেরে মেরে মহাকাশে পাঠিয়ে দেয়। তেমনি ভাবে দেশের নৈতিক অধোগতি ব্যবসা-বানিজ্যে, অফিস-আদালতে, শিক্ষাব্যবস্থায়, স্বাস্থ্য পরিসেবায়, কল-কারখানায়, রাজনীতির প্রায় প্রতিটি দলে — এক কথায় দুর্নীতি সর্বত্র ছাড়িয়ে গেছে, আজ সামনে দুর্নীতিমুক্ত কোন জায়গাই নেই।

স্বাধীনতোত্তর কালে আর একটি ঘটনা সমাজ ও ব্যক্তি মানসিকতায় এক বড় রকমের অশুভ প্রভাব ফেলেছে। ১৯৫২ সাল থেকে আজ পর্যন্ত ৪৫ বছরে ৮টি পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনায় সরকারী ও বেসরকারী খাতে বিপুল পরিমান অর্থের বিনিয়োগ হয়েছে তার বেশ বড় টাকার অঙ্ক স্ফীত করেছে ব্যবসায়ী, ঠিকাদার সম্প্রদায়কে। এবং এই কালক্রমের মধ্যে ৫টি কেন্দ্রীয় বেতন কমিশনের এবং রাজ্য বেতন কমিশনগুলির সুপারিশের ফলে বেতনভোগীর বেতন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে সমাজের বেশ কিছু মানুষের হাতে প্রচুর টাকা এসে গিয়েছে। এ অর্থ অনেক ভাবেই অনর্থের সৃষ্টি করছে। প্রথমত সকল অর্থই সহজভাবে সৎপথে আসে না বিশেষত, নৈতিক সততার মেরুদন্ডটি যখন আমাদের দুর্বল। দ্বিতীয়ত এ অর্থ আমাদের বস্তুবাদী ভোগবাদকে, আরও অর্থসংগ্রহের উদগ্র লোভকে দিনে দিনে বাড়িয়ে দিয়েছে। আমরা আজ কনজিউমারিজমের শিকার হয়ে পড়েছি। যেন তেন প্রকারেন আরও টাকা চাই, আরও নতুন নতুন ভোগ্যদ্রব্য চাই, আরও জাগতিক সুখ চাই — এ স্থূল মানসিকতা মনুষ্যত্বের মাত্রাকে শুধু ছোটই করে ফেলে না, মানুষকে প্রচন্ড আত্মকেন্দ্রিকও করে, সমাজের প্রতি তার কর্তব্য সম্বন্ধে অন্ধ করে দেয়, সমাজের মানুষের প্রতি নূন্যতম কর্তব্যবোধও সে হারিয়ে ফেলে। সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে এই নেতিবাচক মানসিকতার প্রভাব প্রচন্ডভাবে পড়ে পরবর্তী প্রজন্মের ওপর। তারা তাদের চারদিকের সমাজ নিয়ে ভাবতে শেখে না, কর্তব্যপালন তো দূরের কথা।

গত প্রায় আশি বছরের সামাজিক পরিবর্তনের দূষিত গর্ভ থেকে যে অসুস্থ সমাজের, যে বিকৃত মানুষের জন্ম হল তাদের পরবর্তী প্রজন্মগুলির সন্তান সন্ততিরা যে সে দূষণের শিকার হবে — এ কথা অস্বীকার করার মত বুকে পাটা কারুর নেই জানি। সেই দূষিত সমাজের প্রেক্ষাপটে এ প্রজন্মের মানুষের শৈশব থেকে কৈশোর, তা থেকে যৌবনে 'মানুষ' হয়ে ওঠার পথ পরিক্রমার প্রথমেই সত্যজিৎ রায়ের 'শাখা প্রশাখা' নামের চলচ্চিত্রের মধ্যে উন্মোচিত। সমসাময়িক কালের এক বাস্তব সত্যের কথা স্মরণে আসছে। শ্রীরায় অপূর্ব দক্ষতা ও অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখিয়েছেন — একটি পরিবারের তিন প্রজন্মের মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধের চেহারা কী ভাবে পালটে যাচ্ছে : বাবা সত্যনিষ্ঠ, আদর্শবান মানুষ, তাঁর দুই পুত্রের মধ্যে বাবার সত্যনিষ্ঠার জীন সোচ্চার থাকলেও বাকি দুই পুত্রের মধ্যে সেই নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ধরা পড়ে এবং শেষ প্রজন্মের অতি অল্পবয়স্ক নাতির মধ্যেও সে দূষণ সংক্রামিত হয়ে যায় পিতৃপ্রধান পারিবারিক পরিবেশে। এ কথা অনুমানের অসাধ্য নয় যে, সে নাতিকে কোন স্কুল, কলেজ সত্যনিষ্ঠায় আর দীক্ষিত করতে পারবে না। ভবিষ্যতে সে তার প্রজন্মের প্রতিনিধিত্ব করবে তাতে আর সন্দেহ নেই।

স্বাধীনতার পর যে তিনটি ছাত্র-যুবসম্প্রদায়ের প্রজন্ম বেরিয়ে গেল তারা দেশের সমাজের, পরিবারের যে অসুস্থ চেহারা দেখে বড় হয়েছে, তার চারদিকে অরক্ষিত মূল্যবোধের অজস্র নিদর্শন দেখতে পেয়েছে, তাতে তারা কোন সম্ভাবনা, সদাচারে উদ্বুদ্ধ হওয়ার উৎসাহ পায়নি। বাবা-মায়ের উন্নত মানের জীন, স্কুল কলেজের শিক্ষা তাদের চারিত্রের অবনয়নকে ঠেকাতে পারে নি, যেমন পন্ডিতের ছেলেও মূর্খ হয়, নিরীহ ভালমানুষের ছেলেও দুর্বৃত্ত হয়, — তারা আজ সমাজের অসুস্থ পরিবেশের দাসে পরিণত হয়েছে। তাছাড়া আমাদের সময়ের তুলনায় বর্তমান যুগের ছেলে মেয়েরা মিডিয়ার কল্যাণে নানা বিষয় সম্পর্কে অনেক বেশী ওয়াকিবহাল। ফলে, উদাহরণ স্বরূপ, যখন তারা দেখে বড় বড় রাজনৈতিক নেতারা জন সাধারণের ভোটে জিতে প্রশাসনে এসে কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করে বহালতবিয়তে আছে, কোন শাস্তি হয় না অথবা ভারতের একজন প্রধান মন্ত্রী যখন ভাষণ দেন যে, করাপশন এখন এক গ্লোবাল ইস্যু, এ নিয়ে আমাদের দেশে এত মাতামাতি করার কী আছে, তখন তারা অসাধুতায় অনুপ্রাণিত হবে — এটাই স্বাভাবিক। যেকোন কালেরই আদর্শবান মহাপুরুষের চরিত্র থেকে তারা কোন শিক্ষা গ্রহণ করে না। আজকাল মাঝে মাঝে স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে যে নৈতিক শিক্ষা বা ভ্যালু-ওরিয়েন্টিড শিক্ষার কথা বলা হয় তাদের চরিত্রগঠনের জন্য, সে ধর্মের কাহিনী শোনার মানসিকতা আজ তাদের মধ্যে নেই। কেউ বলবেন, 'ক্যাচ দেম ইয়াং', শৈশব থেকে এ শিক্ষা চালু করুন। কিন্তু এ দিকে বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষক ও অভিভাবক মিলে শিশুদের অশৈশব কেড়ে নিয়েছে, বইখাতার ভারে শিশুর কাঁধ ন্যুব্জ করে দিয়েছে আজ, এই দারুন প্রতিযোগিতার যুগে তাদের আর নীতিজ্ঞান দিয়ে সুবোধ বালক করে তুলতে চায় না, ড্যাশিং পুশিং স্মার্ট করে তুলতে চায় যাতে বড় হয়ে বড় চাকুরি পায়, বেশী অঙ্কের টাকা আয় করে — উপায় সৎ কি অসৎ সেটা গৌন। তাই বড় হয়ে ডাক্তার হলে জনসেবার পবিত্র বৃত্তির মধ্যে অসাধুতা এখন আর বিরল ব্যতিক্রম নয়।

যেহেতু এ সমাজে যে কোন শ্রেণীর, যে কোন বৃত্তির মানুষকেই আজ আর সুস্থতার ঘেরাটোপের মধ্যে ইনস্যুলেট করে বিশুদ্ধ অবস্থায় রাখা সম্ভব নয়, সেহেতু — মানুষ গড়ার

কারিগররাও সে দূষণমুক্ত নয়। তবুও এর মধ্যে দু'-চারজন আদর্শ শিক্ষকও যদি খুঁজে পাওয়া যায় তাঁরাও তাঁদের ছাত্রদের প্রকৃত অর্থে মানুষ করে তুলতে সমর্থ হন না। তার একটা বড় কারণ হল এই যে, একটি ছাত্র তার দিনরাতের ২৪ ঘন্টার মধ্যে ৩/৪ ঘন্টার মত সময় শিক্ষকদের সান্নিধ্য ও উপদেশ পেতে পারে। বাকি সময় তার কাটে বাড়িতে ও বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে মেলামেশায়, যেখান থেকে সে মানসিক ভাবে পড়ে ওঠার ইন্ধন পায় সেই প্রভাবই মূলত তাকে তৈরি করে দেয় — শিব, বাঁদর সে যাই হোক। ড্রাগ, এলকোহলের নেশা, হিংসাত্মক কার্যকলাপ, দুর্নীতি প্রভৃতি তার চরিত্রে ছাপ ফেলে। কলুষিত সমাজের অবদানকে ছাপিয়ে স্কুল-কলেজে শিক্ষকমশায়দের সান্নিধ্য, শিক্ষা ও সৎচরিত্রের মানুষ নির্মানে নূন্যতম প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। তাই ও সমাজ, পরিবারের দূষণমুক্তির প্রয়োজন সর্বাগ্রে।

দিশাহারা

মূল রচনা : কমলেশ্বর

অনুবাদ : অসীম চৌধুরী

[কমলেশ্বর হিন্দী ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক]

কনট প্লেসের রাস্তার মোড়ে রেলিং-এ হেলান দিয়ে চন্দর দাঁড়িয়ে ছিল। রাস্তার দু-ধার দিয়ে কাতারে কাতারে লোকজন চলছে। সন্ধ্যে হয়ে গেছে.. একটু একটু করে রাস্তার, দোকানের আশপাশের বড় বড় বাড়িতে আলো জ্বলে উঠছে। চন্দর ক্লান্ত.. বড় বেশী ক্লান্ত, পা-দুটো আর এগোতে চাইছে না। মাথার আর মনের ক্লান্তি-অবসাদ ধীরে ধীরে দেহে ছড়িয়ে পড়েছে।

আজ সারাদিন কোনো কাজ হয়নি — এই কথাটা ও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছিল। বাড়ি ফিরতেও মন চাইছে না। সামনে একটি সুন্দরী তরুণী চলে গেল তার দিকে তাকাতে ইচ্ছে করল না। মেয়েটি এমন ভাবে চলছে সকলে যেন তাকে দেখে। চন্দরের মনে হ'ল ওর দিকে তাকালে মনের অবসাদ আরও যেন বেড়ে যাবে। চন্দর ঠিক বুঝতে পারছে না ওর ক্ষিধে পেয়েছে... কি না। সকালে শুধু এক কাপ চা খেয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়েছে। কথাটা মনে পড়তেই পেটটা চন চন করে উঠল। ও মুখ তুলে তাকাল ধূসর আকাশের দিকে। আকাশে দু-একটা চিল উড়ছে... খণ্ড খণ্ড কালো মেঘ। মেঘগুলি ঠিক যেন কালো কালো মোজা। অদূরে জামা মসজিদ, মসজিদের গম্বুজ মীনার দেখা যাচ্ছে। দেখতে দেখতে সব কিছুই কেমন যেন অদ্ভুত বলে ওর মনে হ'তে লাগল।

ঠিক পেছনের দোকানে মেয়েদের পোশাকের বিচিত্র বিজ্ঞাপন। রীগল বাসষ্টপের কাছে বড় নিম গাছটা থেকে শুকনো পাতা খসে পড়ছে। ছোট পাতাগুলো মাঝে মাঝে দমকা হাওয়ায় উড়ছে। গাড়ি, অটো রিক্সা ছাড়াও শব্দ করে যাত্রী বোঝাই বাস চলেছে। কোনো কোনো বাস স্টপে সামান্য সময় থামছে। যাত্রি নামছে উঠছে। তাদের ওঠা নামার দরজা আলাদা। চৌ-রাস্তাতে লাল হলুদ সবুজ আলো দেওয়া ট্রাফিক লাইট যান্ত্রিক গতিতে জ্বলছে - নিভছে। চন্দরের চারিপাশে শত শত মানুষ চলছে.. চলার সময় কেউ ওর দিকে তাকাচ্ছে না। সকলেই অপরিচিত। মাঝে মাঝে দু'একজন হয়ত একবার ওর দিকে তাকালো! চন্দরের মনে হ'ল ওদের দৃষ্টি অবিনয়ের। দেখতে দেখতে চন্দরের ওর শহরের কথা মনে হ'ল। সে শহর থেকে তিন বছর হ'ল দিল্লিতে এসেছে। সেই শহরে গঙ্গার ধূ ধূ তীরে যদি কোনো অজানা মানুষের সঙ্গে দেখা হয়ে যেত, তারা হয়তো মুখ ফিরিয়ে ব্যস্ততা দেখিয়ে চলে যেত না! অন্তত: এক ঝলক পরিচিতের দৃষ্টি দিয়ে চলে যেত ভদ্র এবং সম্মান পূর্ণ দৃষ্টি.. মুখে সৌজন্যের হাসি।

ভারতের রাজধানী দিল্লি। এখানে নাকি সবই আমাদের, আমাদের দেশ। তবু যেন এ'শহর আমাদের নয়। এখানে হাজার হাজার ঘর আছে, বাড়ি আছে - বসতি আছে। কিন্তু মন চাইলেও কারও ঘর-বাড়িতে যাওয়া যায় না। প্রতিটি বাড়ির মুখে ফটক। তালা বন্ধ। বেল বাজিয়ে অপেক্ষা করতে হবে দর্শনপ্রার্থীকে। অনেক বাড়ির গেটের একধারে বড় বড় করে লেখা থাকে 'কুকুর হইতে সাবধান', 'ফুল ছিঁড়িবে না'।

চন্দর ভাবে অন্য কেউ না চাইলেও এই বিরাট শহরে একজনই রয়েছে — নির্মলা। হয়তো ও চন্দরের ফেরার অপেক্ষায় রয়েছে। কিন্তু বাড়িতে ঢুকেই তো চন্দর আগের মত

ওকে দু-হাতে জড়িয়ে ভালবাসা জানাতে পারবে না। অতিথির মত বাইরের ঘরে চুপ করে বসে থাকতে হয়। বিছানার উপর তো সংসারের যাবতীয় জিনিস-পত্র নির্মলা বোঝাই করে রাখে। নির্মলাকে দিল্লিতে এসে আর কয়লার উনুন জেলে রান্না করতে হয় না। উনুন জ্বালাবার সময় ধোঁয়াতে ঘর ভরে যায় না। নির্মলা ইলেকট্রিক উনুনে রান্না করে, চা করে। চন্দর ধীরে ধীরে ঘরে ঢোকে। গুপ্তাজীর স্ত্রী ওই সময় নির্মলার সঙ্গে জমিয়ে গল্প করে, উলের প্যাটর্ন শেখে। গুপ্তাজী ওর কারখানার কাজ শেষ করে বাড়ি ফিরলে তবে গুপ্তাজীর স্ত্রী তাদের ঘরে যাবে। দেখা হলে মন না চাইলেও দু-চারটে কথা বলতে হয়। অনেকটা সময় চলে গেলেও ও যখন যেতে চায় না - বাধ্য হয়েই নির্মলা চন্দরকে খেতে দেবার প্রসঙ্গ তোলে। কথাটা শুনে গুপ্তাজীর স্ত্রীর মাথায় ঢোকে ঘরে যাবার কথা। ঘরে ঢুকে চন্দর ওর ঘরের বড় জানালাটার পর্দা টেনে দেবে। কোনো একটা বাহানা করে খুরানার ঘরের দিকে খোলা জানালাটাও বন্ধ করে দেবে। খাবার টেবিলের সামনে বসে নির্মলাকে এক গেলাস জল দিতে বলবে... তখনই তো নির্মলা হাসি মুখে ওর কাছে আসবে। তখন বলতে পারবে আবেগ ভরা কণ্ঠে, আজ বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।

কিন্তু এমন তো আর হয় না। এত লম্বা, এত বড় এক প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে নির্মলাকে কাছে পেতে ওর মন ক্ষিপ্ত হয়ে যায়। বাধ্য কখন কখনও বলে, খেতে দিতে আর কত দেরি হবে? মাঝে মাঝে চুপ করে বসে থাকতে থাকতে মনে হয় ওর জীবন থেকে নির্মলা যেন ওনেক দূরে সরে গেছে। অতীতের চেনা -জানা -ভালবাসা সব যেন কোথায় ভেসে গেছে। কথায় কাজে অদ্ভুত এক পরিস্থিতির মধ্যে ওরা দুজনে রয়েছে।

মাঝে মাঝে ঘরে বসে রাস্তার ও-ধারের পাউরুটি মাখনের দোকান থেকে শুনতে পায় তীব্রস্বরের গান। সেই সব গান কানে এলে দেহ মন আরও যেন অবসাদ ক্লান্তিতে ভেঙ্গে পড়ে। ঝিমিয়ে পড়ে শরীর। .... গুলাটির বাড়ি ফেরার সময় ওর পদশব্দ আরও ক্লান্তিকর মনে হয়।

জানালার কাছে দাঁড়ালে দেখতে পায় সামনের গলিতে একটা স্কুটার আসে। গাড়ি থেকে আরোহী নামে মিটার দেখে স্কুটার চালককে ভাড়া দিয়ে ঘরে ঢুকে যায় মোটর গ্যারেজের মালিক সর্দারজী গ্যারেজের দরজা বন্ধ করে অনেক রাত পর্যন্ত চাবির গোছা নিয়ে বসে থাকে। সর্দার ওর কাজের ছেলেটিকে বিশ্বাস করে না শুনেছি। ছেলেটি প্রায় চৌদ্দবছর ওর কাছে কাজ করছে। সব শেষে শুনতে পায় বিষেণ কাপুরের ঘরে ফেরার পদশব্দ। বিষেণ কাপুরের সঙ্গে চন্দরের পরিচয় নেই। গত দুবছর ধরে দরজায় নেমপ্লেট দেখছে। 'বিষেণ কাপুর পত্রকার' । বিষেণের ঘরে আলো জ্বললে শুধু দেখতে পায় খোলা জানালা দিয়ে বেরিয়ে আসছে সিগারেটের ধোয়া। ছোট ছোট বৃত্ত একটু একটু করে বড় হতে হতে অন্ধকার আকাশে মিশে যাচ্ছে। সকাল বেলা বাইরে দেখতে পায় বিষেণ কাপুরের জানালার তলায় পড়ে রয়েছে আধপোড়া সিগারেট,দেশলাই কাঠি, পাঁউরুটির টুকরো... কাগজ আর ডিমের খোষা। বিষেণ কাপুর একটি নাম, একজন পত্রকার .... তার বেশি কিছু নয়।

অনেক কথা ভাবতে ভাবতে চন্দরের নাকে ধক করে ওর পায়ের ঘামে ভেজা চামসে গন্ধ নাকে এসে লাগল। গন্ধটা শুধু চামসে নয় উৎকট। রেলিং -এ হেলান দিয়ে আর যেন দাঁড়াতে পারছে না। পকেট থেকে ছোট ডায়রিটা বার করে আগামী দিনের কাজের তালিকা দেখল।

এক ইংরেজি দৈনিকের এডিটরের সঙ্গে ফোনে কথা বলে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে দেখা করতে হবে। দেখা হয়তো সহজে হবে না। অনেকটা সময় বাইরে বসে থাকতে হবে। এডিটর তার সময় হলে তবে ওকে ডাকবে। কিছু কথাবার্তা হবে আলোচনা হবে; কিন্তু সবই অর্ধসমাপ্ত থেকে যাবে। কোনোটাই পূর্ণ হবে না।..কিছুদিন আগে একটা চেক রিজার্ভ ব্যাঙ্কে ক্যাশ করাতে হবে।.. ক্যাশ হলে বাড়িতে টাকা পাঠাবার জন্য পোষ্ট অফিসে মনি অর্ডার করতে যেতে হবে। সেখানে বিরাট লাইন। রেডিও অফিসেও সেই একই অবস্থা। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাউন্টারে তো 'এলাহাবাদের অমরনাথ' বসে নেই যে ওর চেক পেয়েই নিজে গিয়ে ক্যাশ করে ওকে টাকা দেবে। পোস্ট অফিসে অফিস চাপরাশি - পিওনদের ভিড়। এক একজনে কম করে দশটা মানি অর্ডার করবে। তারপর টাকার হিসেব কাউন্টারের সামনে করে রিসিট নিয়ে সরে দাঁড়াবে। অযথা সময় নষ্ট। কেউ চেনা জানা থাকলে হয়ত সময় নষ্ট হয়না। পোষ্ট অফিসে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে কারও যদি কিছু লেখার জন্য পেন দরকার হয়ে তখন সামান্য হেসে পেনটা চাইবে। ফেরত দেবার সময় শুধু পেনটা ঢাকনা খোলা অবস্থায় মুখের সামনে এগিয়ে দেবে। একবারও তাকাবে না। হয়ত কেউ সামান্য ধন্যবাদ জানিয়ে স্ট্যাম্প কাউন্টারের দিকে এগিয়ে যাবে। ভাবটা এমন পেনটা নিয়ে এবং ফেরত দিয়ে চন্দরকে কৃতার্থ করেছে। অবাক হ'বার কিছু নেই ওরা তো কেউ চন্দরকে চেনেনা জানেনা। ডায়রিটা হাতেনিয়ে চন্দরের বিক্ষিপ্ত মন আরও বেশি বিক্ষিপ্ত হয়ে গেল। চন্দর ডায়রিটা পকেটে না রেখে হাতে নিয়েই আকাশচুম্বি বাড়িগুলোর দিকে তাকাল। আগামী কাল ওর সারাদিন ব্যাঙ্ক, পত্রিকা অফিস, রেডিও অফিস পোষ্ট অফিসে চলে যাবে। ভাবতেই চন্দরের মন বিরক্তিতে ভরে ওঠে। বাড়ি গুলোতে নিওনলাইটে দোকানের নাম জ্বলছে। দূর থেকে মনে হয় যেন গলায় আলোর মালা পড়ে আছে। মাথায় মুকুট। ঝকমক করছে সব বাড়িগুলি। চন্দর ওদেরও চেনেনা জানেনা। নামও শোনেনি। ওদের না চিনলেও ওর শহর এলাহাবাদের সব চেয়ে বড় কাপড়ের ব্যবসায়ী লালাজীকে ও চেনে। লালাজী আগে খুবই দরিদ্র ছিল! এক সময় কাপড়ের বোঝা মাথায় চাপিয়ে বাড়ি বাড়ি বেচত। সকল গ্রাহকের সঙ্গে ওর আছে ব্যক্তিগত পরিচয়। এখন আর অবশ্য লালাজী দরিদ্র নয়... ধনী। ওর ছেলেরা ভাল পড়াশুনো করে, উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে গেছে। লালাজী অসম্ভব ধর্মভীরু। কপালে চন্দনের ফোঁটা দিয়ে দোকানে আসে। লাভ লোকসানের হিসেব কষে। শোনা যাচ্ছে আগামী কর্পোরেশনের নির্বাচনে লড়বে। তারই প্রস্তুতি চলছে ব্যবসার সঙ্গে সঙ্গে। রাজধানীতে কোনো কিছু বোঝা যায় না। কেউ কারও খোঁজ নেয় না চেনেনা জানেও না। তাহলেও কনট প্লেসটা চন্দরের মন্দ লাগেনা। চওড়া চওড়া পিচ ঢালা চকচকে রাস্তা। সিমেন্ট বাঁধান সুন্দর ফুটপাথ। রাস্তায় সারবন্দি নিম, শিমুল, জাম গাছ.. সবুজ ঘাসে মোড়া লন। গাছের তলায় বসার জন্য নগর নিগমের বেঞ্চ। লোকেরা বেঞ্চে বসে গল্প করে, বাচ্চা ছেলেমেয়েরা লনে খেলা করে। পরিশ্রান্ত লোকেরা বিশ্রাম নেয়। চন্দরের বাচ্চাদের হাসি, খেলা হৈ-চৈ বড় ভাল লাগে। ওর শহরের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বড় মিল।

চন্দর দেখল ময়দানে বাচ্চারা খেলছে, অদূরে তাদের মায়ের গোলগাপ্পা খাচ্ছে। খাওয়াতে এত মগ্ন যে ছেলেমেয়েদের দিকে তাকাতে পারছে না। বাচ্চাদের অবহেলা চন্দরের ভাল লাগে না। দিল্লির মায়েরা যেন বড় বেশী অপরিচিত। তাদের চোখে মুখে না আছে সরলতা, না মাতৃভাব। স্নেহ ঝরে পড়ে না তাদের দুই চোখে। রূপ দেখান ছাড়া সৌন্দর্য নেই। অসম্পূর্ণ

অতৃপ্ততার বৃত্তে যেন ঘুরছে ওরা। ওদের মধ্যে কেউ কেউ গোল হয়ে বসে অনাবশ্যক হাসছে, উচ্চস্বরে কথা বলছে। আশেপাশে লোকেরা কি ভাবছে সে সম্বন্ধে কোন খেয়ালই নেই, নিজেদের নিয়ে এতই মত্ত। অদ্ভুত এই সব মায়েরা, চন্দরের অজানা জগতের লোক। খানিকটা সময় চন্দরের লনে গিয়ে বাচ্চাগুলোর সামনে বসতে ইচ্ছে করল। 'ইচ্ছেটা' মনের ভেতর রেখে দিল! গতকাল ঘাসের উপর বসতে গিয়ে প্যান্ট ভিজে গিয়েছিল। ঘাসের নিচে বেশ জল জমে রয়েছে জানতনা। ঠিক যেন চোরের মত লুকিয়ে থাকা জল। বড় বড় গাছ গুলি দেখে বিষণ্ণতায় মন ভরে গেল। দূরে দূরে আপন আপন শাখা বিস্তার করে দাঁড়িয়ে রয়েছে .. কারও সঙ্গে কারো যেন কোনো সম্পর্ক নেই। আবছা আবছা দেখাচ্ছে গাছগুলো... এই নির্জনতা ওর খুব পরিচিত। গাছগুলোর নির্জনতা বাগানের পাহারাদার লাঠি ঠকঠক করে ভেঙ্গে দিচ্ছে। ময়দানে ঝোপের কাছে গাদা আইসক্রিমের শূন্য কাপ, সিগারেটের প্যাকেট, ঠোঙ্গা, আর শূন্য মদের বোতল পড়ে রয়েছে। হয়ত একজন দু:খী ওই কোণাটায় বসে আকণ্ঠ পান করে মনকে হাল্কা করতে চেয়েছিল। তারপর হয়তো গাছের তলায় ঘুমিয়েও পড়েছিল।

চন্দর আবার ডায়রিটা খুলল। পাতাগুলো উল্টে পাল্টে আকাশের দিকে তাকাল। বিরাট শহরটার চলমান জীবনের সঙ্গে ওর যেন কোনো সংযোগ নেই। লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে ও একা.. নি:সঙ্গ। জীবনের এই তিনটে বছর এমন কিছু ঘটেনি যা মনে রাখা যায়। কোনো রকম দোলা জাগায়। কোনো কিছুর সঙ্গে জড়িত নয় ... কোনো আনন্দ নেই, উৎসাহ নেই। জীবনের এই নি:সঙ্গতা অনেকটা মরুভূমিতে গজিয়ে ওঠা কাঁটা গাছের মত। অজানা বিরাট এক সমুদ্র তটের মত ধূ ধূ করছে.. সেই সমুদ্রের গর্জন নি:সঙ্গতাকে আরও যেন গভীর করে তুলছে। খণ্ড খণ্ড মেঘে ঢাকা আকাশটা বড় অদ্ভুত! মেঘগুলো যেন একটা বিরাট কালো মোজা। অদূরে জামা মসজিদের উপর ঘুরপাক খাচ্ছে বেশ কিছু চিল। ওদের ঘরে ফেরার সময় হয়ে গেছে। রাস্তায় সুসজ্জিতা মেয়েরা কেউ কেউ একা .. কেউ তাদের ভালবাসার পুরুষদের সঙ্গে হাসতে হাসতে চলেছে। গরীব ফুল বিক্রেতারা তাদের ফুল বেচার জন্য কাতর ভাবে বিবিজী, বিবিজী ডেকে পিছু পিছু চলছে। কেউ কিনছে, কেউ ফিরেও তাকাচ্ছে না। ওদের কারও কারও হাতে সান্ধ্য পত্রিকা। আজব আজব সব খবর। ধর্ষণ, চুরি, ডাকাতি.. খুন।

দেখতে দেখতে চন্দরের মনে হ'ল ওর জীবনের একটা যুগ দূরন্ত হাওয়ায় ভেসে গেছে। ও সেই যুগের সঙ্গে মিশে যেতে পারেনি। কারও সঙ্গে সামান্য হেসে জিজ্ঞেস করতে পারেনি, 'কী কেমন আছ'?... কারও কাছে মনের কথাও বলতে পারেনি। ডায়রির শুক্রবারের পাতায় দেখল ও গোটা গোটা অক্ষরে লিখেছে 'নিজের সঙ্গে একান্তে দেখা করতে হবে। সময় সন্ধ্যে সাতটা থেকে নয়টা। আজই তো শুক্রবার। নিজের সঙ্গে দেখা কখন করবে? ও হাতের ঘড়ির দিকে তাকাল! সন্ধ্যে সাতটা প্রায় বাজে। কিন্তু মনের দ্বিধার ভাব ফুটে উঠতেই ভাবল 'টি -হাউজে' গিয়ে এক কাপ চা খেলে কেমন হয়? বিক্ষিপ্ত মন.. নিজের সঙ্গে নিজে যেন মিশতে পারছে না। বুঝতে পারছে না কেন নিজের কাছ থেকে ও পালিয়ে বেড়াচ্ছে। ঠিক সেই সময়ই চোখ পড়ল আনন্দের দিকে। আনন্দ নিশ্চয়ই ওকে দেখেছে, তা 'না হ'লে ওর দিকেই আসছে কেন? আনন্দ ওর স্কুল কলেজের সতীর্থ.. তবু চন্দর আনন্দের সঙ্গে মিশতে চায় না। কথা বলতে ভালবাসে না। আনন্দের হাসি-ঠাট্টা .. কথা বলার ঢং .. চাল চলন কোনোদিন চন্দরের ভালো লাগেনি, আজও লাগেনা। ওর সঙ্গে কথা না বলতে পারলে যেন বেচে যায়।

আনন্দ বন্ধু খুঁজে বেড়ায়। এমন এক বন্ধু - খুব নিকটের নয় তবু তার সঙ্গে বসে গল্প হাসি ঠাট্টা করতে পারে। সময় কাটাতে চায়। ওর কথা বলার মধ্যে অদ্ভুত এক কেতাবি ঢং আছে, শুনলে বোঝা যায় কৃত্রিম। সেই কৃত্রিমতা নিজের মধ্যেও গেঁথে ফেলেছে। অথচ আজ ওকে ভাল না-লাগলেও কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরাট লম্বা সিঁড়িতে পাশাপাশি বসে কতদিন কাব্য-উপন্যাসের চরিত্রের সঙ্গে নিজেদের মিল খোঁজার চেষ্টা করেছে।

আনন্দের দিকে তাকাতে তাকাতে মনে হ'ল ... ও যেন ইচ্ছে করে মূর্খের মত জীবনের সুন্দর এক অংশ ধ্বংসস্তূপের মধ্যে ঘুরে ঘুরে নষ্ট করে ফেলেছে। অনেকটা স্বল্প শিক্ষিত ইতিহাস-না-পড়া গাইডদের মত। দর্শনার্থীদের ওরা একই কথা একই ভাবে বারবার বলে যায়। একবারও ভাবেনা যাদের কাছে বলছে তাদের ইতিহাস সম্বন্ধে জ্ঞান কম নয়। গাইডরা বাদশাদের দূর্গ দেখাতে দেখাতে নাটকীয় ভাবে বলে যায়, এটা দেওয়ানী খাশ .. ওইখানে হীরে জহরতে মোড়া সিংহাসনে মন্ত্রীদের নিয়ে বাদশাহ বসতেন ... এটা বেগমদের স্নান করার জায়গা ছিল - হামাম। আর এই জায়গায় বসে বাদশাহ জনতাকে দর্শন দিতেন।... চলুন দেখে আসি শিসমহল। বর্ষা মহল, গ্রীষ্ম মহল।... হ্যাঁ হ্যাঁ ... চলুন চলুন সাবধানে চলুন। জায়গাটা শুধু ভাঙ্গা নয় অন্ধকারও। এটা সেই জায়গা যেখানে অপরাধীদের ফাঁসি দেওয়া হত। ফাঁসি মহল। আজও রয়েছে অন্ধকার কুয়ো, ফাঁসির মঞ্চ'।.... চন্দরের সেইসব গাইডদের কথা গুলো ভাবতে ভাবতে মনে হ'ল যেন ও টুরিস্ট গাইডের সঙ্গে ধ্বংস স্তূপে ঘুরে ঘুরে জীবনের পঁচিশটা বছর কাটিয়ে দিয়েছে।... হামাম দেওয়ানি খাশ, মহলগুলোর সঙ্গে ওর তো যোগসূত্র ছিল না। ও ফাঁসি মহলে গেছে। সেখানে ভ্যাপসা গন্ধ! মনে হ'ল গাইড ওকে ধ্বংস স্তূপে নিয়ে গিয়ে ফাঁসি মহলের ভাঙ্গা অন্ধকার ঘরে ছেড়ে চলে গেছে। চতুর্দিকে ভ্যাপসা গন্ধ... চামচিকে .... বাদুড়। ফাঁসি মহলে বাদশাহের আদেশ কত শত নিরপরাধ লোকের গলায় ফাঁস বেঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তাদের দেহটা অন্ধকার কূপের মধ্যে ছটফট করেছিল শেষ নিশ্বাস ফেলা পর্যন্ত। এখনও যেন সেখানে তারা প্রাণহীন দেহ নিয়ে ঝুলে রয়েছে। চন্দরকেও যেন ফাঁসি দিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে... সেই মানুষগুলোর সঙ্গে ওর কোনো পার্থক্য নেই।

চন্দর, আনন্দকে না- দেখার ভান করে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেও পারল না। আনন্দ চন্দরের পিছনে এসে দাঁড়াল।

— 'আরে তুই এখানে ? মেয়েগুলো নিশ্চয়ই এখনও তোর পেছনে ছোটে?'

চন্দর আনন্দের কথা শুনে হেসে ফেলল।

—, 'কোথায় যাচ্ছিস'? চন্দর ডায়রিটা পকেটে রেখে বলল।

—, 'আজ আমার হাতে অনেক সময়। কোনো কাজ নেই.. চল কোথায় বসে এক কাপ কফি বা চা খাওয়া যাক'। কথাটা বলে সামান্য নীরব থেকে চোখ ছোট ছোট করে বলল, অন্য কিছু চলবে?

চন্দর জানে আনন্দের অন্য কিছু বস্তুটা কী?

—, 'না'। চন্দর ওর উৎসাহে দাঁড়ি টেনে দিল। কিন্তু আনন্দ ছাড়ার পাত্র নয় বলল, শালা, তাহলে জীবনে কী করলি? ... যাকগে চল এক কাপ কফি হয়ে যাক। কথাটা বলে আনন্দ অনাবশ্যক জোরে হেসে উঠল। —, বুঝলি জীবনে আমাদের কী আছে বল?

চন্দর চুপ করে রইল। যেতে যেতে আনন্দ ওর একটা হাত চেপে ধরে বলল, একটা কথা

বলব কিছু মনে করবি না তো?... কিছু টাকা ধার দিতে পারবি?

খুব সাধারণ কথা। কথার মধ্যে টাকা ধার চাওয়ার আড়ষ্টতা নেই। — পয়সা কম পড়ছে।

চন্দর চুপ করে রইল। আনন্দ চন্দরের মুখটা দেখে সহাস্যে বলল, ওক্কে পার্টনার এখানে দাঁড়া ...একটা ব্যবস্থা করে আসছি।

আনন্দ চলে গেল। চন্দর জানে আনন্দ আর আসবে না।

আনন্দ চলে গেলে চন্দর একটা রেষ্টুরেন্টে ঢুকল। কাউন্টার থেকে এক প্যাকেট সিগারেট কিনে এক কোণে বসল। টেবিলের সামনে দুটো চেয়ার .. ও একা।

- হ্যালো। চন্দর মুখ তুলে একটি ছেলেকে দেখল। মুখটা যেন বড়ই পরিচিত। কিন্তু কোথায় যে ওকে দেখেছে মনে করতে পারছেনা!

- অনেকদিন পর তোমাকে এখানে দেখলাম। ছেলেটি চন্দরের পাশে বসল। দুজনেই জানেনা কোথা থেকে কথা শুরু করবে, কী কথা বলবে।

রেষ্টুরেন্টে লোকেরা চা খাচ্ছে , কফি খাচ্ছে , ... ম্যাকস্ খাচ্ছে। হাসছে হৈ হৈ করছে। দেওয়ালে একটা বড় ঘড়ি ঝুলছে। চন্দর যখনই আসে ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখে সময়ের চেয়ে আগে চলছে ঘড়িটা। রেষ্টুরেন্ট - টি স্টলে চারটে দরজা। তিনটে বাইরে যাবার - চতুর্থটা টয়লেটের। টয়লেটের ইউরিনালে গাদা গাদা গোল গোল ন্যাপথলিন। উগ্র তার গন্ধ। টয়লেটে যারা যাচ্ছে ঢোকার আগে দরজার একধারে দেওয়ালে লটকানো আয়নাতে নিজেদের মুখটা দেখছে - চুল আঁচড়াচ্ছে।

গ্লেলর্ড রেষ্টুরেন্টে একটু পর নাচ শুরু হবে - তারই প্রস্তুতি পর্ব চলেছে।

তিন লাইন চেয়ার সাজিয়ে নাচিয়েদের জন্য জায়গা করা আছে।.... অন্যধারে ভোল্‌গা - সেখানে বিদেশীদের ভিড়।

চন্দর দেখল এক জোড়া তরুণ-তরুণী রেষ্টুরেন্টে ঢুকে পর্দা দেওয়া কেবিনে ঢুকে গেল। পর্দাটা সম্পূর্ণ টানা নয়। ইন্দরের তাকিয়ে দেখল মেয়েটি নিঃসন্দেহে সুন্দরী। সাজ পোষাকও সুন্দর। মেয়েটি কেবিনে ঢোকার আগে হাঁ করে তাকিয়ে থাকা লোকেদের দেখে হাসল। নতুন কিছু নয়, সব পুরুষই চটকদার সুন্দরী মেয়ে দেখতে ভালবাসে।

মেয়েটি চেয়ারে বসার আগেই ছেলেটি ওর কোমরে হাত দিয়ে চেয়ারে বসাল।

মেয়েটি চেয়ারে বসে খোঁপা ঠিক করতে করতে আড় চোখে বাইরে তাকাল। ছেলেটি খাবার অপেক্ষায় কাঁচের টেবিলে উপর রাখা ঠাণ্ডা জলভর্তি গেলাসের দিকে তাকিয়ে রইল। ওদের কে দেখছে, কী ভাবছে তা'নিয়ে মাথা ঘামায় না। চোখ আছে বলেই বারে বারে বাইরে তাকাচ্ছে। চোখ না - থাকলে ভিন্ন কথা। চন্দরের মনে হ'ল এক দৃষ্টিতে একই জিনিস দেখলে চোখে জল আসে, তাই ওরা এধার ওধার তাকাচ্ছে।

বেয়ারা এসে কাঁধে ঝোলা ন্যাপকিন দিয়ে টেবিলটা মুছে খাবার সাজিয়ে দিল।.... তারপর দুজনে মাথা-হেঁট করে খাওয়াতে মশগুল। দুজনেই চুপ চাপ খেয়ে চলেছে । চামচ প্লেটের টুং টাং শব্দ আসছে। খাওয়া শেষ হলে ছেলেটি টুথ পিক্ দিয়ে দাঁত খোঁচাতে লাগল। মেয়েটি পার্স থেকে ছোট রুমাল বার করে ঠোঁটের লিপস্টিক বাঁচিয়ে ঠোঁটের চারধার ওর পার্সে রাখা আয়নায় দেখতে দেখতে আলতোভাবে মুছল। বেয়ারা এসে বিল দিতেই ছেলেটি টাকা বার করে বিলের অঙ্কের চাইতে হয়তো কিছু বেশি টাকা রাখল প্লেটে। না-রাখলে মেয়েটি অমন

রাগত চোখে প্লেটের টাকা দেখবে কেন?

চন্দর দেখল অদূরে বসা একজন বার বার ওর দিকে তাকাচ্ছে। ওর দিকে তাকিয়ে মনে হ'ল লোকটা যেন চেনা। ওকে যেন কোথায় দেখেছে - মনে করতে পারছেনা। খুব চেনা চেনা মুখ অথচ অচেনা।

লোকটা যেন কথা বলতে চায়.... অথচ চেয়ার ছেড়ে এগিয়ে আসতে পারছেনা! শেষ পর্যন্ত ও চন্দরের সামনে এসে দাঁড়াল। বলল, আপনি কী কমার্স মিনিষ্ট্রিতে .....?

চন্দর টান টান হয়ে বসে বলল, না তো।

ও ভুল সংশোধন করার কোনো প্রয়াস না-করে হেসে বলল, অল রাইট পার্টনার। ফের দেখা হবে। লোকটা কথাটা বলে একটা সিগারেট ধরিয়ে লম্বা টান মেরে এক মুখ ধোঁয়া ছাড়ে। ওর নিজের টেবিলের দিকে চলে গেল।

কেবিন থেকে সুন্দরী মেয়েটি ছেলেটির হাত ধরে ভিড়ের মধ্য দিয়ে পাশ কাটিয়ে চলে গেল। পিছন ফিরলে দেখতে পেতো সকলেই ওর দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রয়েছে।

টি-হাউস ছেড়ে চন্দর বাস স্ট্যান্ডের দিকে চলল। ম্যাড্রাস হোটেলের বাস স্ট্যান্ডে বাস ধরার জন্য চার-পাঁচ জন দাঁড়িয়ে ছিল। বাস কখন আসবে ঠিক জানেনা তাই দু-একজন সময় কাটানোর জন্য অবান্তর কথা বলে চলেছে , পরমানন্দে সিগারেট টানছে। চন্দর ধীরে ধীরে ওদের পাশে দাঁড়াল বাসের প্রতীক্ষায়।

অনেকটা সময় দাঁড়াবার পর চন্দর বাস আসছে না দেখে একটা গাছের নিচে গিয়ে দাঁড়াল। যায়গাটা অন্ধকার। গাছের তলাটা হলুদ বর্ণের শুকনো পাতায় ভর্তি। পা ফেলার সঙ্গে সঙ্গে শুকনো পাতার মড়মড় শব্দ .... শুকনো পাতার মড়মড় শব্দ ওকে অনেক বছর আগেকার এক জীবনে ফিরিয়ে নিয়ে গেল। এই শব্দের মধ্যে ও হারিয়ে যাওয়া নিজেকে যেন খুঁজে পায়।.... হ্যাঁ এই রকমই শুকনো পাতা গাছগুলির নিচে পড়েছিল। সেদিন ওর পাশে ছিল ইন্দিরা। ওরা দিশাহীন হাঁটছিল ।... একটা অনিশ্চয়তা সেদিন ধ্বংসস্তূপের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিল যেন। .... হাঁটতে হাঁটতে নীরবতা ভঙ্গ করে ইন্দিরা ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, চন্দর তুমি তো অনেক কিছুই করতে পার। গাছের নিচে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে বহুবছর আগের সেই কণ্ঠস্বর কানে ভেসে এল। তুমি তো অনেক কিছুই করতে পার। ইন্দিরার দু-চোখে ছিল চন্দরের প্রতি অগাধ বিশ্বাস আর অন্তর ভরা ভবলবাসা। চন্দর, ইন্দিরার ভালবাসা জড়িত দুই স্বপ্নময় চোখের দিকে তাকিয়ে বলেছিল , আমার কাছে কি আছে বল? জানিনা শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে দাঁড়াব ইন্দিরা। জানিনা- আমার পরিণতি কোথায়। আমি চাইনা আমার কাছে এসে তোমার জীবনটা নষ্ট কর। কোন তীরে আমি দাঁড়িয়ে আছি তাও জানিনা .... অভুক্ত থেকে মৃত্যু, না পাগল হয়ে যাব.... ইন্দিরার দুই চোখে অকৃত্রিম ভালবাসা যেন উপছে পড়েছিল। ও বলেছিল - এমন কথা কেন বলছো চন্দর ওকে গভীর এক দৃষ্টিতে দেখে। বিশ্বাস ভালবাসা ওর অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে তাকিয়ে। চন্দরের ইচ্ছে করেছিল ইন্দিরাকে কাছে টেনে ওর শুভ্র কপালে ঠোঁট দুটো চেপে ধরে । কিন্তু এগিয়ে গিয়েও থমকে গিয়েছে। ইন্দিরার দুই কানের চকচকে দুটো সোনার দুল দেখতে দেখতে মনে হয়েছিল যেন রূপালি জলে চিক চিক করছে মাছ। চন্দর বলেছিল ' চল ওই গাছটার তলায় । ওরা দুজনে পাশাপাশি হাঁটতে লাগল। অদূরে এক শিরীষ গাছের নিচে একটা সিমেন্টের

বেঞ্চ। রাস্তায় গাছ থেকে হলুদ বর্ণের শুকনো পাতা ঝরে পড়েছে । সেদিনের চলার সময় পায়ের চাপে শুকনো পাতা গুলোর মড় মড় শব্দ ঠিক যেন আজকের মত মনে হ'ল.... সেই অতি পরিচিত মর্মর ধ্বনি।

ওরা বেঞ্চে বসল । চন্দর ধীরে ধীরে ইন্দিরার হাতে আঙুল বোলাচ্ছে। দুজনেই নীরব। অনেক অনেক কথা বলার ছিল .... যা ওরা সেদিন বলতে পারেনি। একটু পরে ইন্দিরা ওর মুখের দিকে ভীরু চোখে তাকিয়ে লজ্জা পেয়ে গিয়েছিল। তারপর নীরবতা ভঙ্গ করে বলল, যেন ওর একটা কথার মধ্যে অন্তরের শেষ কথার লুকোনো ছিল। -' তুমি এসব সব অদ্ভুত কথা ভাবছ কেন চন্দর ? আমার ওপর কী তোমার বিশ্বাস নেই ?

চন্দর বলেছিল ভরসা ' ভরসা-বিশ্বাস যাই বল সব আছে, কিন্তু আমি হয়ত এক ভবঘুরের মত সারাজীবন দিশাহীন হয়ে ঘুরে বেড়াব... সেই সব দু:খ দুর্দশার মধ্যে তোমাকে টেনে নিয়ে যাবো ভাবতে পারছিনা। তুমি ইচ্ছে করলেই সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জীবন কাটাতে পারো। আমি তো যেদিকে তাকাই সেদিকেই অন্ধকার দেখি... আমার এখনো কোনো ঠিকানা হল না।'

'তুমি চাইলে অনেক কিছুই করতে পারো চন্দর, ভালো অথবা খারাপ.. আমার জীবনে দুটোই একই। কতদিন ধরে তোমার অপেক্ষায় রয়েছি চন্দর, আর... তোমার কোনোদিন সময় হবে না।' তারপর স্বল্পক্ষণ নীরব থেকে বলেছিল, কিছু লিখছ এখন' ?

— হ্যাঁ। চন্দর খুব আস্তে বলে।

— দেখাও তবে, ইন্দিরা দেখতে চেয়েছিল।

তারপর ঘাসে ভেজা হাতে ওর লেখার খাতাটা ইন্দিরার দিকে ধরতেই ইন্দিরা খাতাটে টেনে নিয়ে নিজের বই-খাতার মধ্যে রেখে বলেছিল, কাল ফেরত দেবো। অন্ততঃ এটার জন্যও তো তোমাকে কাল আসতে হবে।

— না না ওটা আমি তোমাকে দেবো না। আমাকে ফেরত দাও।

ইন্দিরা খাতাটা ফেরত না দিয়ে চন্দরের দিকে দুষ্টুমি ভরা হাসি মুখে তাকিয়েছিল। সেই দৃষ্টিতে যেন অন্তরের সব ভালবাসা উপছে পড়েছিল।

ইন্দিরা খাতাটা দেয়নি। পরের দিন চন্দর ওর লেখার খাতাটা ইন্দিরার কাছ থেকে নিয়ে আসার জন্য গেলে ইন্দিরা হাসতে হাসতে খাতাটা চন্দরের হাতে দিয়ে বলেছিল, এর মধ্যে আমার কিছু লেখা আছে। পড়া হ'লে ছিঁড়ে ফেলে দিও।

— না, আমি ছিঁড়বো না।

ইন্দিরা বাচ্চা মেয়ের মত ঠোঁট ফুলিয়ে বলেছিল, না দিলে জন্মের শোধ আড়ি। বড় ভাল লেগেছিল ইন্দিরার সেদিনের কথা আর বলার ভঙ্গি।

... তারপর একদিন ইন্দিরা ওদের বাড়ি এসেছিল... একদিনের স্মৃতি। ইন্দিরা এধার ওধার তাকিয়ে চন্দরের ঘরে ঢুকে পড়েছিল। ওকে দেখে চন্দরের মনে হয়েছিল এই প্রথম যেন ইন্দিরা ওর ঘরে এসেছে। চন্দর ওর কাছে গিয়ে অনেকটা সময় ওর মুখের দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকার ওর কপালে ছোট্ট একটা লাল বিন্দু এঁকে দিয়েছিল।... তারপর ইন্দিরা ধীরে ধীরে ওর খুব কাছে এসেছিল। চন্দর ওকে দু-হাতে ধরে ঠোঁট ইন্দিরার কপালে ছুঁইয়েছিল।

ইন্দিরার দুই চোখে আনন্দের ঝিলিক। সারা দেহে কি একটা মিষ্টি গন্ধ! চন্দরের মুঠোতে ইন্দিরার সরু সরু আঙুল থর থর করে কাঁপছিল। কপালের বিন্দু বিন্দু ঘাম চন্দরের দুই ঠোঁট

যেন শুষে নিচ্ছিল। যৌবনের সন্ধিক্ষণে দু-জনে দুজনকে চেপে ধরে সেই নির্জন ঘরে প্রতিজ্ঞা করেছিল... ভাষায় নয়, অন্তরে অন্তরে ... কেউ কাউকে কোনোদিন ছেড়ে থাকবেনা।

সেই দিনটির কথা চন্দর ভোলেনি। চন্দর আপন মনে হেসে উঠল।... কানে ভেসে এল 'তুমি তো অনেক কিছুই করতে পার'। সত্যি কী তাই ?

চন্দরের সামনে দিয়ে আর একটা বাস সামান্য সময় থেমে আবার ঝড়ের বেগে চলে গেল। চন্দর বাস্তবে ফিরে এল মিষ্টি মধুর স্মৃতি থেকে। তখনই মনে পড়ল নির্মলার কথা। বাড়ি ফেরার জন্যই তো বাস স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়েছিল।... হঠাৎ মনে হ'ল ওর সেই প্রথম যৌবনের ভালবাসার মেয়েটিও তো এই শহরে থাকে। মাস দুই আগে তো ওর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তখন চার বছর আগের ফেলে আসা দিনের অন্তরঙ্গতা যেন ওর দুই চোখের মধ্যে দেখেছিল। স্বামীর সামনেই হাসতে হাসতে ও বলেছিল, বড় খামখেয়ালি।... আরে চন্দরের সব পছন্দ অপছন্দ আমি ভাল করেই জানি।

ইন্দিরার স্বামী হো হো করে হেসে বলেছিল, তা'হলে তো চন্দরকে তো খুব খাতির করতে হয়।

ইন্দিরা একটুও বদলায়নি। চার বছর আগের মতই ঠাট্টা করে বলেছিল, এখনও কি তোমার চায়ে দু-চামচ চিনি দিলে গলা বসে যায় ? ইন্দিরা কথাটা বলে চন্দরকে ঠাট্টা করার আনন্দে আগের মতই হেসে উঠেছিল।.. তারপর বলেছিল, কফির গন্ধ বিড়ি-সিগারেটের মত লাগে?

চন্দরের পুরনো দিনের কথা মনে পড়ে গিয়েছিল। সত্যি তো কফির গন্ধ ভাল লাগত না। চায়ে শুধু এক চামচ চিনি।

বিরাট শূন্যতার মধ্যে চন্দরের দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে মনে হ'ল কিছু জানা কিছু অজানা মানুষের ভিড়ে এই শহরের মধ্যে একজন রয়েছে তার নাম ইন্দিরা। ইন্দিরা এখনও ওকে ভুলে যায়নি।...ইন্দিরার কাছে গেলে মনের মধ্য থেকে এই নি:সঙ্গতা — বিচ্ছিন্নতার পাঁচিলটা ভেঙ্গে গেলেও যেতে পারে। ঠিক সেই সময় ওর সামনে এসে দাঁড়াল একটা ফটফটিয়া।

চালক চিৎকার করে করে ভেঙ্গে যাওয়া গলায় বলল, গুরদ্বারা রোড্ - করোল বাগ - গুরদ্বারা রোড। চালক সর্দারজি চন্দরের মুখের দিকে তাকাল। তাকানটা এমন যেন ও চন্দরকে চেনে।

— আইয়ে বাবুজি করোলবাগ .. গুরদ্বারা রোড।

ওর চোখে এক পরিচিত মানুষের দৃষ্টি দেখে চন্দরের মন অনেকটা যেন হাল্কা হয়ে গেল। অন্ততঃ এই বিরাট শহরে লক্ষ লক্ষ লোকের ভিড়ের মধ্য থেকে সর্দারজি ওকে চিনতে পেরেছে। চন্দর সর্দারজির ফটফটিয়াতে চেপে অনেকবার গুরদ্বারা রোডে গেছে। কর্ণট প্লেসে এসেছে। চন্দরের সঙ্গে আরও তিনজন যাত্রী চাপল। সর্দারজি স্টার্ট দিতেই বিরাট গর্জন করে উঠল ফটফটিয়া। মিনিট দশের মধ্যে সর্দারজি গুরদ্বারা রোডের মোড়ে পৌঁছে গেল। ফটফটিয়া থেকে নেমে চন্দর পকেট থেকে একটা চার আনা বার করে সর্দারজির হাতে দিয়ে এগোতে যাবে সেই সময় সর্দারজি বলল বাবুজি কত পয়সা দিয়েছো?... আরও দু-আনা বেশী লাগবে সাব্।

চন্দর কথাটা শুনে একটু আশ্চর্য হয়ে ওর দিকে তাকাল। এখন ওর চোখ মুখ দেখে যেন আর চেনা মনে হচ্ছে না।

— আমি তো বরাবরই তোমাকে চার আনা দিই।

সর্দারজি বলল, শায়েদ অন্য কেউ তোমাকে চার আনাতে নিয়ে আসে। আমি তো কখনো ছ'আনার কম নিই না (কিসি হোরণে লিয়ে হোন্‌গে চারআনে - ম্যায় তো ছ'আনে সে ঘট নহী লিতে বাদশাহ্) চন্দরের কাছ থেকে আরও দু-আনা নিয়ে সর্দারজি বলল!

প্রশ্নটা চার আনা বা ছ'আনার নয়। প্রশ্নটা চেনা মানুষটা ওকে ঠকাল। সেই ঠকানটার কোনো প্রতিবাদ নেই।.. চন্দর ইন্দিরার বাড়ির দিকে চলল।

ইন্দিরা সদর দরজায় ওর স্বামীর ফ্যাক্টরি থেকে ফেরার প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়েছিল। চন্দরকে দেখে খুশি হ'ল ... সাদর অভ্যর্থনা জানাল।

চন্দরকে ড্রইং রুমে বসিয়ে ঠাট্টার ছলে হেসে হেসে বলল, পথ ভুলে? ... তারপরই ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, আশ্চর্য! নটা বাজে এখনও ওর ফেরার নাম নেই। রোজই তো আটটার সময় ফেরে।

চন্দর ইন্দিরার মুখের দিকে তাকাল। স্বামী ঠিক সময় না ফেরার জন্য চোখেমুখে একই সঙ্গে অসন্তোষ ও উদ্বেগের ছাপ! অনেকটা সময় ওকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেও ওর চোখের মধ্যে অতীতের সেই উচ্ছ্বাস ভালবাসা .. বন্ধুত্বের দৃষ্টি দেখতে পেলো না। ইন্দিরাও বদলে গেছে... ইন্দিরার কাছ থেকে সে আজ অনেক দূরে চলে গেছে।

— চা খাবে? ইন্দিরার প্রশ্নে চন্দর চমকে উঠল চন্দর।

অতীতে ফিরে যেতে চাইল। জাঁকিয়ে পা ছড়িয়ে বসে বলল, খাব না কেমন করে বলি। নিঃসঙ্গতা একটু একটু করে যেন হাওয়াতে মেঘের মত উড়ছে।

ইন্দিরার কাজের মেয়েটা ট্রেতে চা রেখে গেল। ইন্দিরা চিনির পটে চামচ দিয়ে মুখ তুলে বল, ক' চামচ?

চন্দর ইন্দিরার নরম নরম হাতের দিকে তাকাল। আজও সেই রকম সুন্দর হাত। সহসা কে যেন সজোরে ধাক্কা দিয়ে ওর অতীতের সুন্দর ভাবনা চূর্ণ করে দিল। ওর গলার ভেতরটা শুকিয়ে গেল। সমস্ত দেহ মন আবার অবসাদ ক্লান্তিতে ভরে গেল। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম।... তবু ইন্দিরার সঙ্গে অতীতের মিষ্টি-মধুর সম্পর্ক জোড়া দেবার চেষ্টা করে বলল, দু চামচ!

ভেবেছিল ইন্দিরা হয়ত কিছুক্ষণের জন্য বর্তমান থেকে অতীতে ফিরে যাবে। ঠাট্টা করে বলবে, দু চামচ চিনিতে তোমার গলা বসে যাবে না?

কিন্তু ইন্দিরা অতি সহজ ভাবে দু- চামচ চিনি মিশিয়ে ভদ্রতা মাখা স্মিত মুখে কাপটা এগিয়ে দিয়ে বলল, ধর।

চন্দর কাপটা হাতে নিয়ে চায়ে চুমুক দিল। মনে হ'ল যেন চা নয় অন্য কিছু খাচ্ছে।

সামনে এসে বসে ইন্দিরা দু-একটা প্রশ্ন করল। নির্মলার কথা ... বাড়ির কথা। কথার মধ্যে পুরনো সুর নেই, নেই আন্তরিকতাও। চন্দরের ইচ্ছে হলো কাপটা টেবিলে শব্দ করে রেখে ইন্দিরার সামনে থেকে ছুটে চলে যায়। যেতে যেতে কোনো একটা শক্ত দেওয়ালে নিজের মাথাটা ঠুকে ঠুকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেয়।

কিন্তু কোনো রকমে চা খাওয়া শেষ করে চন্দর রুমালে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে

রাস্তায় এসে দাঁড়াল। মনে করতে চেষ্টা করলো ইন্দিরা ওকে কী কী প্রশ্ন করেছিল। বাইরে এসে চন্দর গভীর নিঃশ্বাস ফেলে রাস্তার এক কোণে চুপ করে দাঁড়াল। ওর সমস্ত শরীরটা হঠাৎ যেন শুকিয়ে গেছে .. মুখের মধ্যে তিক্ততার স্বাদ।

অদূরে তিন চারটে ট্যাক্সিওয়ালা একটা ট্যাক্সিতে হেলান দিয়ে গেলাসে মদ খাচ্ছে। কোনো পরোয়া নেই। নিজেদের মধ্যে অশ্রাব্য গালি-গালাজ করছে।... একটা রোগা কঙ্কালসার দেশি কুত্তা খাবারের আশায় রাস্তার চলন্ত বাস গাড়ি তুচ্ছ করে ছুটে গেল। একটা পানের দোকানের সামনে তিন-চারটে ছেলে জটলা করছে। রাস্তায় ভিড় কম। তীব্র গতিতে যানবাহন চলছে। বাস স্ট্যান্ডেও দু-একজন দাঁড়িয়ে।... রাস্তার ট্রাফিক লাইটগুলি দপদপ করে জ্বলছে, নিভছে। ... সকলেই প্রাণবন্ত শুধু সে প্রাণহীন! আনন্দ নেই, সুখ নেই, যেন সে রাস্তা হারিয়ে ফেলেছে।

চন্দর পা টেনে টেনে ওর বাড়ির পথ ধরল। পা যেন চলতে চায় না .. এত ক্লান্ত অবসন্ন। পা দুটো টন টন করছে। ঘামে ভেজা মোজা থেকে উৎকট গন্ধ।

এ রাস্তা ও রাস্তা ধরে অলি গলি দিয়ে চন্দর বাড়ি পৌঁছল। নির্মলা একটা চেয়ার টেনে আনল। বাড়ি পৌঁছে এমনি ভাবে ক্লান্ত হয়ে বসে পড়া নতুন কিছু নয়। চামসে গন্ধওয়ালা মোজাদুটো পা থেকে হিঁচড়ে টেনে খুলে ফেলে নির্মলার দিকে তাকাল। নির্মলা রোজই সুন্দর ভাবে সেজে থাকে। চন্দরের পিছনে দাঁড়িয়ে পিঠে হাত রেখে বলল, খুব ক্লান্ত?

—হ্যাঁ। কথাটা বলে চন্দর নির্মলার দিকে মুখ ঘুরিয়ে দেখল। আজ নির্মলাকে খুব ভাল লাগছে। নির্মলা সুন্দরী... নিজেকে সুন্দর করে রাখতেও জানে। সুন্দর করে শাড়ি পরে, রেশমের মত ঘন কালো চুল কেমন করে বাঁধতে হয় জানে। নির্মলা চুল না বেঁধে কালো রেশমের মত চুলের রাশ পিঠে ছড়িয়ে রেখেছে। বড় বড় চোখের পাতাগুলো হাল্কা কাজলে যেন আরও চকচক করছে।

নির্মলার ছিপছিপে চেহারার দিকে চন্দর তাকাল। মনে হল নির্মলাকে বড় বেশি অবহেলা করে চলেছে। আরও মনে হ'ল আজ ওরা যেন এলাহাবাদের বাড়িতে ফিরে গেছে। পুরনো দিনগুলি ফিরে এসেছে। সেখানে গুপ্তাজির বৌ নেই, বিষেণ কাপুর নেই... কেউ নেই। শুধু ওরা দুজনে একটা ঘরে। নির্মলা চন্দরের চুলে আঙ্গুল বুলিয়ে দিতে দিতে বলল, খাবার দেব? ... হাত পা মুখ ধুয়ে নাও।

চন্দর বলল, খেতে ইচ্ছে করছে না।

— কেন? খেতে ইচ্ছে করছে না কেন? সকালে তো মাত্র এককাপ চা খেয়ে বেরিয়েছ।... কোথাও কিছু খেয়েছ? নির্মলা মিষ্টিস্বর প্রশ্ন।

চন্দর মিথ্যে করে বলল, হ্যাঁ... তুমি?

নির্মলার খেতে বেশী সময় লাগে না। চটপট খেয়ে নিয়ে চন্দরের পাশে বসল। একটু যেন ইতস্তত: ভাব। বহুদিন পর চন্দর ওর দিকে ভালবাসার দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে কেন?

চন্দর সামনে এলো চুলে সুসজ্জিতা নির্মলার দিকে তাকাল। কত কাছে থেকেও যেন কত দূরে! নির্মলার ঠিক পিছনে ঘরের উজ্জ্বল বাতিটা জ্বলছে তারই কিরণে ওর রেশমের মত চুল চক চক করছে। চোখের পাতাগুলো যেন নরম কালো পাতলা পাতলা সূঁচ! দুই চোখের নিচে তারই ছায়া পড়েছে।

চন্দরের দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে কব্জিতে নেমে আসা হাতের সোনার চুড়িগুলো ওপরে তুলল নির্মলা।

চন্দরের মন সারা দেহ নির্মলার মধুর স্পর্শের জন্য চঞ্চল হয়ে উঠল। নির্মলার আঙ্গুল, নখ, দুই কানের লতি .. সারা অঙ্গ। চেয়ার থেকে উঠে চন্দর ঘরের জানালার পর্দা টেনে দিয়ে বিছানায় শুয়ে নির্মলার নরম হাল্কা দেহটা চেপে। ধরে ওকে পাশে শুইয়ে দিতে দিতে মনে হ'ল বহু বছর পর সম্পূর্ণ এক অজানা জগৎ থেকে নিজের অতি পরিচিত জগতের ছোট্ট ঘরটায় ফিরে এসেছে। এখানে নির্মলা, ঘরের ফুলদানি, আসবাব পত্র, বই খাতা .. সব কিছুই নিজস্ব। অন্ধকার ঘরটায় ওর চোখ বেঁধে দিলেও কোনো রকম বাধা না পেয়ে অপ্রতিহত গতিতে ঘর-বারান্দা করতে পারবে।

ঠিক সেই সময় গুলাটির পদশব্দ সিঁড়িতে শুনতে পেল। বড় বিরক্তিকর ওর পদশব্দ!

চন্দর পাশে জড়সড় হয়ে শোওয়া নির্মলাকে মৃদুস্বরে কাছে টানলো। নির্মলা খুব কাছ ঘেঁষে শুলে চন্দর ওর উন্নত বুকে হাত রাখল। ওর বুক দুটো হঠাৎ উত্তেজনায় ওঠানামা করছে। নাক দিয়ে ভারী নিঃশ্বাস পড়ছে। চন্দর আরও জোরে ওকে কাছে টেনে এনে সারা শরীরে হাত বোলাতে লাগল। ওর শরীরটা বড় পরিচিত। ... তারপর দু চোখে ঠোঁট রেখে চুম্বন করল। ভেজা ভেজা রাজহংসীর মত গলায় মুখটা চেপে ধরল। ওর গায়ে পরিচিত এক ফুলের গন্ধ পাচ্ছে। নির্মলা চন্দরের আদর ভালবাসার কাছে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে মেলে ধরল। তুলে ধরার মধ্যে কোনো ফাঁক নেই... জড়তা নেই। চির সুন্দর মধুর মেয়ে ও পুরুষের মিলনের সম্পর্ক। যে মিলনে কদর্যতা নেই আছে শুধু প্রেম-ভালবাসা।

নির্মলা একটা হাত চন্দরের বুকে রাখল। আগের মত হাতটা নেই... একটু মাংসল। নির্মলা নিঃশ্বাসের গতি যেন আরও বেড়ে গেল। রক্তের প্রতিটি কণিকা উত্তপ্ত হয়ে উঠল। চন্দর স্বল্প আলোতে নির্মলার প্রায় আবরণ হীন দেহের দিকে তাকাল। কত পরিচিত, কত আপনার। সব কিছুই উজাড় করে দিতে চাইছে ওর উত্তেজক নরম দেহটা।

চন্দর বিষেণ কাপুরের জানালার দিকে তাকাল। ওর ঘরে নিত্যকার মত নিওন লাইট জ্বলছে... জানালা দিয়ে সিগারেটের ধোঁয়া বেরিয়ে এসে অন্ধকারে মিশে যাচ্ছে।... চন্দরের নিঃসঙ্গ মন ... অন্তরের জমে থাকা নিঃসঙ্গতা বহুদিন পর নির্মলার ভালবাসায় বিলীন হয়ে গেল। দেখল নির্মলা এক পাশে শুয়ে, চোখদুটো বন্ধ .. সারা দেহ থেকে অতিপরিচিত সুবাস। ... ওরা দুজনে এক হয়ে গেল।

একটু একটু করে নির্মলা স্বাভাবিক হয়ে গেল। চন্দর তখনও নির্মলাকে জড়িয়ে রেখেছে। নির্মলা পাশ ফিরে শুল। দুজনেই চুপ। চন্দর পাশ ফিরে নির্মলার শুভ্র চকচকে পিঠে হাত রাখল।... একটু একটু করে নির্মলা ঘুমিয়ে পড়ল।

চন্দর আবার নির্মলাকে কাছে আনতে চাইল; কিন্তু পারল না।... হঠাৎ মনে হ'ল ও নির্মলার ভালবাসার কাছে হেরে গেছে।

প্রথম ভাবনা, শ্রেষ্ঠ ভাবনা : অ্যালেন গীনসবার্গ

অমিতাভ চৌধুরী

[অ্যালান কলকাতায় পাঠক ও কবিমহলে অত্যন্ত পরিচিত নাম। ভারতীয়, বিশেষ করে বৌদ্ধ সংস্কৃতির সঙ্গে তাঁর অন্তরের গভীর যোগাযোগ ছিল। যত বড় কবি ছিলেন সম্ভবত খাঁটি মানুষ হিসাবে ছিলেন আরো বড়। সম্প্রতি পরলোক গমন করেছেন। কিন্তু তার কবিতা তাকে বাঁচিয়ে রাখবে বহুকাল। কিছুটা বিলম্বিত হলেও এই প্রবন্ধ পাঠকের ঘনিষ্ঠ অভিনিবেশ দাবী করবে বলেই আমাদের বিশ্বাস — সম্পাদক]

"আপনাদের গাউনের প্রান্তভাগটি ধরে থাকুন ভদ্রমহিলারা, আমরা নরকের পথে চলছি এখন।"

অশ্লীলতার দায়মুক্তি আর আদালতের নিষ্কৃতি পেয়েছে বলে, একটি অট্টহাসিকে নিয়ে যদি আপনার উল্লাস, আমাকে মার্জনা করবেন শ্রী উইলিয়াম কারলোস উইলিয়ামস্, 'হাউল'-এর যে কবিতাগুলি সম্পর্কে আপনি উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন, সে কবিতাগুলির কাব্যগুণ ভারহীন, তুচ্ছ, এবং তাদের প্রকাশ অবশ্যই বীভৎস এবং অশ্লীল - এগুলি কখনই দাম্ভেয় দাবানলের সূচনা করতে পারে না।

এই ছিল আমার সে সময়ের চিন্তা। আড়াই দশক আগে আমি প্রথম যখন গীনস্‌বার্গের কবিতা পড়ি। আধুনিক কবিতা সম্পর্কে আমার ধারণা ছিল অন্য রকম।

হপকিনস্ থেকে শুরু করে (অনেকেই হয়তো বলবেন, ইয়েটস্ থেকে শুরু করা উচিত) এজরা পাউন্ড, টি.এস.এলিয়ট, ডি. এইচ. লরেন্স, এবং পরবর্তীকালের অডেন, স্পেন্ডার, অথবা গীনস্‌বার্গের সমসাময়িক। যেমন ফিলিপ লারকিন, রিচার্ড উইলবার্ড, এনথনি হেস্ট, জন অ্যাসবেরি এবং অন্যান্য 'নিউ লাইন' কবিরা। যেমন জর্জ ম্যাকবেথ, সিলভিয়া প্লাথ, ডগলাস ডান, এবং তাদের পরবর্তী প্রজন্মের উত্তর আধুনিক কবিরা। সবাই সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন, এবং কবিতার বিষয়ও ছিল এই সমস্যাধর্মী। তাদের অনেকেই নৈতিক সমস্যা নিয়েও বিচলিত ছিলেন।

কিন্তু এই সব সমস্যার চিন্তা এবং কবিতায় সেই সংগ্রামের প্রকাশ কখনই গীনস্‌বার্গের কবিতার মত এমন দুর্দশাগ্রস্থ কাঁচা মাংসের ত্বকে পরিণত হয়নি। নরকের বাতাবরণ প্রকাশই জীবনের বিশিষ্টতার একমাত্র অবলম্বন কিম্বা লক্ষণ। এরকম চিত্তবৈকল্য কোন কবির কবিতায় প্রকাশ পায়নি - গীনস্‌বার্গের মতো তো নয়ই। যিনি কিনা খুবই চালাকি করে তার ব্যক্তিগত এবং একান্ত নিজস্ব সমস্যাগুলিকে সর্বজনীন করে তোলার চেষ্টা করেছেন। আর সেই কার্য উপলক্ষে নিষ্ঠা ছড়িয়েছেন কবিতার অলিন্দে।

আর্তনাদই হোক আর গর্জনই হোক। 'হাউল' এবং 'হাউল' পরবর্তী কবিতাগুলিতে দুর্নীতিপরায়ণ রাজনৈতিক নেতার মত যখন তিনি আত্মনিয়োগ করলেন তাঁর সমস্যাগুলির সঙ্গে লড়াইয়ের জন্য। আর সেই লড়াইকে প্রতিষ্ঠা করতে চাইলেন একটি জাতির জাগরণের লড়াইয়ে, তখন যেন তিনি আবিষ্কার করলেন পচন ধরেছে সেই হঙ্কারি সংগ্রামে।

কবিতায় যা স্বাভাবিক, যে জীবনের সংগ্রাম রূপ নেবে একটি অন্তর্দর্শনের প্রকাশে, সে ব্যাপারটি ঘটল না এই কবির ক্ষেত্রে। আর তাই গোপন এক ইচ্ছার মত যেন। তাঁর একান্ত

নিজস্ব সংগ্রাম তাঁকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে একটি শূন্যতার দিকে। সেখানে প্রকাশ পর্যন্ত হয়েছে বিশৃঙ্খলা আর অনির্দিষ্টে। আর স্থূল কামোচ্ছ্বাস কেবলই অঙ্গুলি সংকেত করেছে বিক্ষুব্ধ এবং ভয়ার্ত মানসের একটি ব্যক্তির প্রতি। সুরহীন চিৎকারে সে কেবলই অপমানিত করেছে শালীনতাকে।

এই ছিল আমার বিশ্লেষণ ও প্রত্যয়। আর তাই ষাটের এবং আশির দশকে প্রকাশিত কোনেথ এলট এবং পিটার সম্পাদিত যথাক্রমে পেনগুইন এবং ফেবার প্রকাশিত আধুনিক ও সমকালীন কবিতা সংকলনদুটিতে গীনস্‌বার্গের কবিতা স্থান না পাওয়ায় আমি বিস্মিত হইনি। পোর্টার তো বলেই ফেললেন যে বিটদের অবস্থান কবিতার রাজ্যে নয়।

পঁচিশ বছর আগে প্রথম তাঁর কবিতা পড়ি যখন, তখন 'হাউল', 'কাডিস', 'প্ল্যানেট নিউজ', এবং 'ফাস্ট ব্লু' কাব্যগ্রন্থগুলি প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু সে সময়ে অসহিষ্ণুতা আমাকে ঘিরে রেখেছিল। আর আমার নিজের মধ্যে ছিল তাঁর প্রজন্মের কবিদের প্রতি শ্রদ্ধার অভাব। সে সময়ে তাঁর কবিতাগুলি পড়ে আমি আবিষ্কার করেছিলাম একটি ঠগকে।

আর এখন নীল পরিমিতি এসেছে আমার জীবনে। আর আবার পড়লাম তাঁর সদ্য প্রকাশিত (১৯৯৬) স্ব-নির্বাচিত কবিতা সংকলন। এবারও পায়ে মাড়াতে হয়েছে বিষ্ঠা। তবু শেষ পর্যন্ত হেঁটে এলাম সেই পথে যখন। মনে হ'ল একটি অন্তর্দৃষ্টির হদিশ পেলাম যেন। আর সব কবিতার আপাত হঠকারিতা বিশৃঙ্খলার মধ্যে অন্তর্নিহিত একটি সঙ্গতি যা কবিতাগুলিকে বিশেষ স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে। এইসব দেখার জন্য দৃষ্টির স্থিরতার প্রয়োজন। স্বীকার করতে দ্বিধা করছি না, আগের পাঠে সেই স্থিরতা ছিল না আমার। আর, আজ তাই প্রয়োজন বোধ করছি যা কিছু বলেছি, তার অনেককিছুই না বলার জন্য। এটুকু প্রাপ্য এই ভিক্ষুক কবির।

তাঁর মৃত্যুর পরে তার স্মৃতিফলকে লিপির খোঁজের প্রয়োজন হ'ল যখন, নিজেকে আমার অসহায় মনে হয় নি। কেননা এখন জানি সেই লিপি তের বছর আগের। তাঁর কবিতা সংকলনের মলাটের শেষ পৃষ্ঠায় লিখে রেখেছেন বব ডিলান : 'দুঃখদায়ক এবং চলমান। সহজাত কাব্যপ্রতিভা। সুদক্ষ এবং হুইটম্যানের পরে আমেরিকান কবিদের মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবশালী। ''(সুদক্ষ শব্দটি 'কন ম্যান' শব্দদুটির আক্ষরিক অনুবাদ নয়। তবে ডিলান স্মৃতির ছলে শব্দ দুটি লিখেছেন বলে অনুবাদে 'সুদক্ষ' শব্দটি ব্যবহার করলাম।)

অবশ্যই, নেশাগ্রস্থ, আধো-জাগা, স্বপ্নাবিষ্ট। লেবেল আঁটা -জিন পরা বিশেষ একটি গোষ্ঠীর কাছে জনপ্রিয়তা যে গীনস্‌বার্গের কবি প্রতিভার মাপকাঠি, সেকথাটি ভাবা মুখামিই হবে।

গ্রেগোরি কর্গো, জ্যাক কেরুর এবং উইলিয়াম বারোজ। এদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা এবং বিট প্রজন্মের সাহিত্য আন্দোলনে তাঁর অগ্রণী ও পরিপূরক ভূমিকার কারণেই খুব সম্ভবত: তিনি তাঁর সমকালীন কবি- সাহিত্যিক - সমালোচক, যাঁরা বিট সাহিত্যকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করেছিলেন। তাদের কাছে তিনি তাঁর পাওনা মর্যাদাটি পাননি।

বিট সাহিত্যের প্রতি বৈরিতার কারণেই, তাঁর বুনো কবিতাগুলিতে যে সূক্ষ্ম অনুভূতি ও চিন্তার প্রকাশ ঘটেছে, সেটি যে বিট প্রজন্মের নিষ্ক্রিয় সাহিত্যের বাঁধা সূত্রে আবদ্ধ ছিল না— এই সহজ উপলব্ধির প্রচেষ্টাও তাঁরা করেননি। এছাড়াও চিলি থেকে শুরু করে চীন পর্যন্ত অসংখ্য কবি, গায়ক এবং মঞ্চশিল্পীরা, যারা তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, সেই সংখ্যাতীত শিল্পীদের অধিকাংশেরই যে বিট আন্দোলনের সাথে কোন সংশ্রব ছিল না, এ সত্যটিও

সমালোচকেরা স্বীকার করতে ভুলে গিয়েছিলেন।

একথাটি অস্বীকার করার উপায় নেই যে ভাষা সম্পর্কে বিশেষ যত্নশীল সাহিত্যিকেরা এবং অন্যান্য বুদ্ধিজীবিরা আরো একটি সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন। সংস্কৃতি, রাজনীতি আর যৌনতার মুক্তির অভিব্যক্তিতে গীনস্‌বার্গের উলঙ্গ ও প্ররোচনার ভাষা শালীনতাবোধকে বেশ কিছুটা কুণ্ঠিত ও বিব্রত করেছিলো। এই কুণ্ঠা - বিব্রতভাবের দোষদুষ্ট দৃষ্টির দায়ভাগ আমারও ছিল।

হেলেন ভেন্ডলার, যিনি বললেন গীনস্‌বার্গ আমেরিকার প্রশ্বাসকে মুক্ত করেছেন। তিনি একথাটিও লিখলেন যে এই কবি একই সঙ্গে ব্লক, হুইটম্যান, পাউন্ড এবং উইলিয়ামসকে তাঁর কবিতায় সম্পৃক্ত করেছেন। প্রশংসার উচ্ছ্বাসে এই উক্তিটি অতি সংযোজনা। এরকম সম্পৃক্ততা অতি সহজেই বোঝা যায়। আর এর কারণে তাঁর কবিতাগুলি অনুকরণে দোষযুক্ত হোতো এবং তাঁর কাব্যগুণও সম্পূর্ণ ব্যহত হত, আর অকিঞ্চিত বলে তাঁর কবিতাগুলি হারিয়ে যেতো বিস্মরণে।

ব্লেকের একমাত্র যা কিছু প্রেরণা তা সীমাবদ্ধ ছিল অগ্রজ কবির কবিতা পাঠেই মাত্র। একমাত্র উদাহরণটি যা চোখে পড়ে। এক নিঃশ্বাসে সম্পূর্ণ। ব্লেক পড়ে লেখা হ'ল 'কনটেস্ট অফ বার্ডস' (১৯৭৭) কবিতাটি।

দীর্ঘ কবিতায় কামদ বর্ণনা লিখলেন গীনস্‌বার্গ। তিনি তরুণ কবি। উলঙ্গ হয়ে এলেন তিরিশ দশক ধরে অবসররত একাকী জীবন-যাপনকারি বৃদ্ধ কবির কাছে। আর ঘোষণা করলেন ভবিষ্যতবাণীর। তার স্বপ্ন — বৃদ্ধ কবির ক্লীশে প্রবচন পাল্টে দেবেন তিনি। তাঁদের তর্কের বর্ণনায় এক চটকদার নির্মাণ পদ্ধতি আর মেজাজের আশ্রয় নিয়েছেন গীনস্‌বার্গ। আর কবিতাটির উপসংহারে এসে যখন কবিতার অন্য চরিত্র কিশোরটিকে বৃদ্ধ কবি শোনালেন তাঁর বাণী কেমন। বিড়ম্বনাময় সেই বাণী - 'আমেরিকা বাঁচাও' আপ্তবাক্য। উচ্চমার্গের এই বক্তৃতাকে গীনস্‌বার্গ নিজেই বলেছিলেন। ' ব্লেকের আবর্জনার মহাকাব্য'। এরই সঙ্গে কবিতাটিতে পাওয়া গেল নির্বাণ রাইন সঙ্গীতের একটি অসাধারণ লিরিক :

''দুঃখ আসে যখন যখন অনড় হয়ে থাকে জিভ
সুখ হয়ে থাকে স্থবির
জ্ঞানের সঙ্গে হাড়জিরে একটি শূন্য যোগফল
আমরা মরি আশীর্বাদ নেই অথবা অভিশাপ স্বীকারোক্তি
আমরা চাইছি পৃথিবীর শেষ হীনতা:
তবু ফিরবো এসে সুন্দরীরা সব বিশ্রাম নেয় সেইখানে।''

এর আগে, একবারই মাত্র ব্লেককে স্মরণ করেছেন গীনস্‌বার্গ। বব ডিলানের জন্য লেখা, ' সেপ্টেম্বর অন যেশোর রোড' (১৯৭১) কবিতাটি লেখা হয়েছিলো ব্লেকের কবিতার অন্তর্মিলের অনুকরণে।

'এ সুপার মার্কেট ইন ক্যালিফোর্ণিয়া' কবিতাটি লেখা হয়েছিলো ১৯৫৫ সালে যখন তার বয়স ৩০। কবিতাটি হুইটম্যানকে উদ্দেশ্য করে লেখা, তাঁদের উভয়ের 'সমকাম - প্রেম' একসূত্রতার স্মরণে, এবং তাঁর সামাজিক সমস্যার বিব্রততায়।

১৮৭১ সালে ডেমোক্রেটিক ভিসটাস-এ হুইটম্যান বলেছিলেন : ''গভীর এবং ভালবাসার

ভ্রাতৃত্ব, পুরুষের প্রতি পুরুষের আসক্তির বন্ধন .... যখন সম্পূর্ণ গড়ে উঠবে, আর তাকে প্রশ্রয় আর স্বীকৃতি দেওয়া হবে আমাদের সামাজিক ব্যবহারে এবং সাহিত্যে, তখনই এইসব রাষ্ট্রগুলির ভবিষ্যতের আশা আকাঙ্খা এবং বিপদমুক্তির পূর্ণ প্রকাশ ঘটবে।"

সমকামিতার পক্ষ সমর্থনে এই যুক্তি সন্দেহাতীত নয়। আর এই বিচার যে গীনস্‌বার্গকে জাতিয়তা বোধে উদ্বুদ্ধ করবে এরকম ভাবা সম্ভব নয়। তবু এই আসক্তি, যা তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে অবলম্বন হয়ে উঠেছিলো এবং যা তাঁর পূর্বসূরিকে চিন্তিত করেছিলো, তারই পরিপ্রেক্ষিতে গীনস্‌বার্গ প্রকাশ করলেন তাঁর ভাবনা। তাঁর সহমর্মী অগ্রজকে:

"আমরা কোথায় চলেছি ওয়াল্ট হুইটম্যান? দরজা বন্ধ হবে এক ঘন্টা পরে

....

তোমার দড়ি আজ রাতে কোনদিকে ইশারা করছে?

(তোমার বই ছুঁয়েছি আমি আর স্বপ্ন দেখছি আমাদের সুপার মার্কেটে যাওয়া আর বুঝতে পারছি সম্ভব নয় তা।)

আমরা কি সারারাত দুজনে হাঁটবো জনহীন পথে? ছায়ার পর ছায়া
গাছের, বাতি নিভেছে বাড়িগুলির, বড়ো একাকী আমরা দুজনে তখন
আমরা কি হাঁটবো প্রেমহারা আমেরিকার স্বপ্নের কথা ভেবে, গাড়ি বারান্দার
নীল গাড়িগুলির পাশ দিয়ে, আমাদের নিঃস্তব্ধ কুটির বাড়ির পথে।"

কাম - প্রেম- উদ্দামতা এবং তারই প্রসূত জীবনীশক্তির দ্বন্দ্বগুলি হুইটম্যানের কবিতায় কোন জটিলতার সৃষ্টি করেনি। তার প্রকাশের উষ্ণতা ছিল অনুতাপ। অন্যদিকে গীনস্‌বার্গের কবিতার আত্মজিজ্ঞাসা ছিল বড়ো স্পর্শকাতর এবং তাঁর অস্থির অবস্থানের যন্ত্রণার বহিপ্রকাশের সুরে ছিলো নির্মমতা। তাই পূর্ব প্রজন্মের কবির পক্ষে সম্ভব ছিল না অনুজ কবিকে হাতধরে নতুন পথের সন্ধানের। তাছাড়াও হুইটম্যানের ব্যক্তি-যন্ত্রণা নির্বাসিত হয়েছিলো তাঁর কবি-মনন থেকে।

আর, যে আমেরিকান কমিটি, পরে যিনি ব্রিটিশ নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছিলেন, এবং যিনি তাঁর পরবর্তী, এবং এমনকি সমকালিন প্রজন্মের কবিদের ওপর নিঃসন্দেহে স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, এবং যিনি ইংরেজী কবিতাকে উদ্ধার করেছিলেন জর্জিয় ক্লীবতা থেকে, কোন এক অজ্ঞাত কারনেই গীনসবার্গ অথবা তাঁর পৃষ্ঠপোষকেরা তাঁর উল্লেখ করেননি। সেই টি.এস. এলিয়টই কিন্তু ইংরেজী কবিতার অন্দরমহলের পাটরানীর আসনে, এবং ব্রিটিশ উন্নাসিকতার অবসানে, আমেরিকান কবিতাকে সম্পৃক্ত করেছিলেন মূল ইংরেজী কবিতার ধারায়।

যে কঠোরতা, প্রত্যক্ষ প্রকাশ আর লক্ষের প্রতি স্থিরতা, যা সংজ্ঞায়িত হয়েছে আধুনিক কবিতা হিসাবে, এবং এটসব গুণাবলী অথবা এইসব প্রণালীগুলি যা গীনসবার্গসহ তাঁর পরবর্তী প্রজন্মের উত্তর আধুনিক কবিরাও সযত্নে প্রকাশে ব্যাপ্রিত হয়েছেন, এসবই এলিয়ট প্রদর্শীত পথ।

তা মনে রাখতে হবে যে গীনসবার্গের অবস্থান ছিল এলিয়টের থেকে সম্পূর্ণ অন্য মেরুতে। আমেরিকান ভাবধারাকে এলিয়ট সম্পৃক্ত করেছিলেন মূল ইংরেজী কবিতার ধারায়। আর গীনসবার্গ তাকে বিচ্ছিন্ন করে প্রতিষ্ঠা করলেন একটি স্বতন্ত্র 'আমেরিকা' নামের জাতিগত চরিত্র।

তবুও সত্যের আবিষ্কারের প্রয়োজনে নতুন প্রকাশ আর নতুন ভাষার সন্ধানের যে পথ নির্দেশটি এলিয়ট দিয়েছিলেন। তাঁর সমসাময়িক কবিদের মতোই গীনসবার্গও সেই সন্ধানে প্রবৃত্ত ছিলেন। একথাটি বারেবারেই তিনি নিজেকে স্বরণ করিয়েছেন :

"আর সেই একাকী শকুন তুরস্কের মরুর বালিতে দেখছি বাসের জানালা দিয়ে
মনে হচ্ছে যেন ছল করছে। দুটি হীরা হাতে একটি কবিতা অন্যটি স্পষ্টতা
আমার স্বপ্ন দেখছি তার প্রমাণ আর বুদ্ধির লম্বা তরবারি
ঠোক্কর খেয়ে কেবলই পড়ছি যার ওপর যেমন আমার ছ বছর বয়সে প্যান্ট
খুলে যেতো লজ্জায় কেমন (ইগনু, ১৯৫৮)

এলিয়টের প্রতি কটাক্ষটি সুস্পষ্ট। এই যে 'বুদ্ধির আধারে আড়াল হয়ে পড়ে বাস্তবের সত্য', এ ভাবনাটি গীনসবার্গের পূর্ববর্তী কবিদেরকেও ভাবাতে শুরু করেছিলো, তিরিশ আর চল্লিশের দশকেই। পরিবর্তিত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তখন সন্ধান করছেন কবিতার ভিন্নতার প্রকাশ। সেই সন্ধানে কবিতার পরিবর্তন ঘটেছিলো একটি সামাজিক দায়বদ্ধতায়, আর সেই সন্ধানের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন অডেন, স্পেন্ডার,, সিসিল-ডি-লুইস। তাদেরই বক্তব্যের প্রতিধ্বনি শোনা গেল গীনসবার্গের কবিতায়।

তিরিশ চল্লিশের দশকের কবিতাতে কবিতা আবদ্ধ ছিল না বাস্তবরূপবাদের নির্দিষ্ট পথে। আর সমকালীন বিশ্বের জটিলতাকে উপস্থাপনের প্রচেষ্টায় তাঁরা চেষ্টা করলেন সমস্যাগুলিকে সরলীকরণের এবং জুয়া খেললেন তাঁদের ব্যবহারিক রূপের প্রকাশ। আর নতুন বিশ্বের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সঙ্কটে জাতি এবং ব্যক্তিজীবনে সুবিচারের জন্য এমনই মেতে উঠলেন, যে তাঁদের কবিতার সরলীকরণের দায়বদ্ধতায় কবিতা হয়ে উঠল ব্যঞ্জনাহীন, অতি সাধারণ। ডে লুইসের 'দ্য ম্যাগনেটক মাউন্টেইন' এই অকিঞ্চিত, বিশেষত্বহীন কবিতামালাগুলির মধ্যে প্রধানতম নিদর্শন হয়ে রইল।

আর মজার ব্যাপার, ডে লুইস-এর কবিতায় ব্যর্থতার যা কারণ, সেই কারণটিই বিশিষ্টতা দিল গীনসবার্গের কবিতাগুলিকে। 'সুবিচারের জন্য সামাজিক দায়িত্ববোধ' অন্য একটি পথের সন্ধান দিয়েছিলো গীনসবার্গকে। নতুন বিশ্বের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জটিলতাকে সরল করার প্রয়াসকে তিনি পরিহার করলেন। তাছাড়া জীবনের যে ভয়াবহতা এবং জটিলতায় তিনি নিজে নিমগ্ন হয়ছিলেন, কোন বিশ্লেষণে তার রূপকে পরিবর্তন না করে তিনি সেই সব অভিজ্ঞতাকেই অবিকৃত বর্ণনার চেষ্টা করেছেন।

এই বর্ণনার জন্য প্রয়োজন ছিল একটি নতুন অবয়ব এবং নতুন ভাষার। তার প্রয়োগও করলেন তিনি। এই নতুন আঙ্গিক আর বোধ অজ্ঞাত ছিল ডে লুইস-এর কাছে। সবাইকে শোনাবার জন্যই সরব হয়েছিলেন গীনসবার্গ, এবং চেঁচিয়েছেন উচ্চকণ্ঠে, নিজেকে শোনাবার জন্য। পথচারিদেরকেও শোনাবার জন্য, প্রতিদিনের সংবাদপত্রের ভাষায়। সেই ভাষার আর তার ব্যঞ্জনাকে অনুধাবন না করেই সমসাময়িক এবং পরবর্তী প্রজন্মের কবি, সাংবাদিকরা তাকে আখ্যা দিলেন হলুদ সংবাদপত্রের খবর বলে। এই অবজ্ঞা কবিকে বিশেষ বিচলিত করেছিলো বলে মনে হয় না। তিনি তো আগেই দ্বর্থহীনভাষায় ঘোষনা করেছেন :

আমি দেখেছি এ -প্রজন্মের শ্রেষ্ঠ মনগুলি সব ধ্বংস হয়েছে বিকারে
অভুক্ত হিষ্টিরিয়াগ্রস্থ উলঙ্গ

.....

তারা স্বপ্ন দেখেছিলো আর সময় ও আধারের মধ্যে তৈরী করেছিলো রক্তমাংসের ব্যবধান
তাদের দৃশ্যগুলি জড়িয়ে গিয়েছিলো সব। আর হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ পরী উড়তে না পেরে
আটকে ছিলো দুটি দৃশ্যত: ভাবনায়, আর সে দুটি জোড়া ছিল ক্রিয়াপদগুলিতে
আর বিশেষ্যপদ আর যতি-চিহ্নে, লাফাচ্ছে শুধু সর্বশক্তিমান দুটি
বিরক্তির মাঝে
পদগুলি নতুনভাবে সাজবে বলে, আর সাধারণ মানুষের গদ্যকে মাপতে, তারা
দাঁড়িয়ে আছে তোমার সামনে, আর বুদ্ধিমান, কাঁপছে, লজ্জায়, পরিত্যক্ত
তবু কেমন গুলিয়ে ফেলছে হৃদয়, তার উলঙ্গ এবং অসীম চিন্তায় মস্তিষ্কে
ছন্দ আনবে বলে। ('হাউল', ১৯৫৫)

পঞ্চাশের দশকের কবিতায় সামগ্রিকভাবেই একটি পরিবর্তন এসেছিলো। আত্মসচেতনতা আর বুদ্ধিবাদী ভাবনাকে প্রকাশের ভাষায় একটি রহস্য আর ধ্রুপদী প্রবণতা দেখা গেল কবিতায়, এর ফলে সমাজ ও রাজনীতির পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটকে প্রকাশ করা সম্ভব হচ্ছিল না।

আমলাতন্ত্র, মূল্যবোধের অবক্ষয়, হিরোসিমায় মানুষের গলে পড়া চোখ, কম্যুনিজিমের জুজু, পেন্টাগন, সরকারি প্রচার এবং তার অসত্যবার্তাগুলি, ওসবই বিব্রত ও ক্লান্ত করে তুলেছিল সবাইকে। উপলব্ধি আর সংস্কার মানস থেকে কবিতায় যে আশাবাদের সূচনা হয়েছিলো পাউন্ড, অডেনের কবিতায়, অল্প সময়েই যে সব পাল্টে গিয়ে কবিতায় ফুটে উঠল নিরাশা আর হতাশা। আর কবিরা তখন নতুন একটি সংজ্ঞার জন্য খোঁজ আরম্ভ করলেন।

ডিলান টমাস, জর্জ বেকার এবং তাঁদের সাথীরা একটি নতুন আন্দোলন শুরু করেছিলেন যাকে তাঁরা সংজ্ঞায়িত করেছিলেন 'ব্যক্তি উন্নতি' (ইন্ডিভিজুয়াল ডেভেলপমেন্ট) বলে।

এইসব নতুন নতুন আন্দোলন ও প্রচেষ্টায় সামগ্রিকভাবে কবিতা এবং সমাজবোধেরও নতুন রূপরেখার চেষ্টা হ'ল। ধর্ম (খৃষ্টিয় ধর্ম) নতুন করে আবার অবলম্বন হ'ল কবিতার। নতুন করে আবিষ্কৃত হলেন এলিয়ট, আর মার্ক্সকে বড়ো একঘেয়ে মনে হ'ল ফ্রয়েডের — তিনি নতুন করে বিবাহ-বন্ধনে ঘর বাঁধলেন ওল্ড টেস্টামেন্টের সঙ্গে। এ বিবাহটি অবশ্য অনেক বছর আগেই ডি.এইচ.লরেন্সের পৌরহিত্যে সম্পাদিত হয়েছিলো।

গীনসবার্গের গর্জনধ্বনি শোনা গেল তারও পরে। যে বছর 'হাউল' কবিতাগ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিলো সে বছরই প্রকাশিত হয়েছিলো ফিলিপ লারকিনের বিশিষ্ট কাব্যগ্রন্থ, 'দ্য লেস্ ডিসিভড'। নতুন দিগন্তের এই কবিতাগুলি এবং লারকিনের নেতৃত্বে 'নিউ লাইনস পোয়েটস'-দের কবিরা কিন্তু সন্তুষ্ট করতে পারলো না নতুন প্রজন্মের কবিদের। আশাহত সেই কবিরা ক্রমশই অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছিলেন। ডিলান টমাসের প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধা যে অনেক খানি কমে এসেছিলো, আর স্পষ্টতই তারা এডিথ সিটওয়েলের প্রতি ক্রোধান্বিত হয়ে উঠেছিলেন তা আর প্রমাণের অপেক্ষা রাখল না।

কবিতার নড়বড়ে রাজত্ব যেন নিজে থেকেই তৈরি হ'ল আবার একটি নতুন আক্রমণের জন্য। এই আক্রমণকারীর ভূমিকাটি নিয়েছিলেন গীনসবার্গ। তবে সে রাজ্যে তাঁর রাজার ভূমিকায় অভিষেক অবশ্যই এলিয়টের মত সর্বজনগ্রাহ্য হয়নি, তাছাড়াও রাজ্যশাসনে তাঁর

কৃতকর্মের সফলতা অবশ্যই সম্পূর্ণ নয়।

দুর্বল একটি আন্দোলনের প্রচেষ্টাও হয়েছিলো এই সময়ে। 'ইচ্ছাকৃত প্রাদেশিকতা'-র প্রতিবাদে সাহিত্যে আর্ন্তজাতিকতা', এরকম একটি রূপরেখার কথা ঘোষণা করলেন ডোনাল্ড ডেভি এবং তাঁর সাথীরা। কিন্তু এই আন্দোলনটি খুব একটা স্পষ্ট রূপ নিতে পারেনি। তাঁরা নিজেরাই ছিলেন শুধুমাত্র 'সুন্দর-পূজারী', আর বাতাবরণের কথা চিন্তা না করেই তারা উদ্যোগী হয়েছিলেন আবহাওয়া পরিবর্তনের প্রচেষ্টায়।

এই প্রচেষ্টায় কবিতার রক্তাল্পতা রোগটির যে নিরাময় হবে, এরকম কোন আভাষই পাওয়া যায়নি। আর তারই ফলে গীনসবার্গের পক্ষে তাকে উপেক্ষা করতে কোন অসুবিধাই হয়নি। তিনি অতি সহজেই বিশিষ্ট 'আমেরিকা চরিত্র'টিকে প্রতিষ্ঠা করলেন। এই চরিত্রায়নটি তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা প্রসূত।

সেই অভিজ্ঞতা কার্ল সলোমনের সাথে রক্ত-পূঁজ মাখা জীবনকে তাঁর প্রত্যক্ষ করার ব্যথা। নীল ক্যাসেডির সঙ্গে তাঁর সমকাম বিবাহের বিচ্ছেদের পীড়া, আর আপন শরীর আর সহমর্মিতা থেকে বিচ্ছিন্নতা বোধের দুঃখ, তিনি পরীক্ষা করলেন 'মন-বিভ্রান্তি-যান্ত্রিক' (এই শব্দ কয়েকটি কবি নিজেই করেছেন) সময়কে নিয়ে, আর আবিষ্কার করলেন, তিনি নিজে, তাঁর মা এবং তাঁর পৃথিবী বাঁধা পড়ে আছে নিःসঙ্গতা - "আমাদের চেতনার জগত, অক্ষতিকারক সংগ্রাম, তার বুকে আর তলপেটে শুধু আদিম স্বর্গসুখের কম্পন, আর তাদের ভীতির আবরণ পরিত্যাগ করে উলঙ্গ।"

স্বীকারোক্তি আর স্বপ্ন একত্রিত হয়ে তৈরী হয়েছে অতিবাস্তবতা। অথচ বিশেষ এক সচেতনায়—সেই উপাদান তাঁর কবিতার জগতকে তৈরি করেছে। আর তাই, মানুষের প্রতিমুহূর্তের প্রশ্বাসই কবিতায় ছন্দ, যেখানে স্তোত্র ভিজে আছে দুঃখের বর্ণনায়। স্বাভাবিকভাবেই, শরীরকে স্পর্শ করে কবিতাগুলি, আর সেই স্পর্শতায় কবিতাগুলি কেবলই কেড়ে নিতে চায় জীবনের শরীর এবং হৃদয়, উভয়কেই। নিজের অস্তিত্বেই কবি খুঁজেছেন জীবনের চাবিকাঠি :

"তোমাকে ভাবতে অবাক লাগে এখন, কাঁচুলি আর চোখ ছাড়া চলে গেছো তুমি
যখন গ্রীনউইচের গ্রামের ফুটপাথে রোদে হাঁটছি আমি
জীবনের মধ্যে দেখছি স্বপ্ন, তোমায় সময় - আর আমার,
শীঘ্র রহস্য উদঘাটনের দিকে
শেষের মুহূর্ত - ফুল জ্বলছে দিনে - কি এসেছে তারপর,
....
কিছু বলার নেই আর, কান্নায় নেই কিছু, শুধু স্বপ্নের মধ্যে আছে যারা
হারিয়ে গিয়ে বন্দী যারা,
শ্বাস নিচ্ছে জোরে, আর চেঁচাচ্ছে, কিনছে আর বিক্রি করছে
অলীকমূর্তির টুকরোগুলি, পূজো করছে একজন আর একজনকে
পূজো করছে এই সবের মধ্যে যে ঈশ্বর, তাকে - তাদের আকৃতি
অথবা অপরিহার্যতা?
যতক্ষণ শেষ না হয়, একটি কল্পনা — আর কিছু?"

(কাডিস, ১৯৬১)

রুদ্ধরূপ থেকে মুক্তরূপে বিস্তারিত হ'ল কাডিস-এর কবিতাগুলি, আর খুবই প্রভাবিত করল নতুন প্রজন্মের কবিদের। কবিতাগুলি সবকটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ছোট সাহিত্য এবং পত্রিকাগুলিতে। সেই পত্রিকাগুলির পাঠকসংখ্যা সীমিত হলেও, তাদের পাঠকেরা সবাই সাহিত্য এবং কবিতা অনুরাগী এবং অনেকেই প্রতিষ্ঠিত কবি। আর সে কারণেই প্রায় প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই কবিতাগুলি বিশেষ স্বীকৃতি পেয়েছিলে। অল্প সময়ের মধ্যেই এই কাব্যগ্রন্থটি প্রায় একটি বিপ্লবের সূচনা করল। আর কবিতা সম্পর্কে সাধারণ পাঠকের মনে একটি অনুসন্ধানের প্রয়াসকে প্রতিষ্ঠা করল। 'কাডিস' এই পাঠক অনুসন্ধিৎসাকে প্রচারিত করল তাদের স্থানীয় পরিচয়ে আগ্রহী হতে। কবিতায় সুপ্রতিষ্ঠিত হ'ল আমেরিকায় চরিত্র।

এ সময় থেকেই গীনসবার্গ অনুসন্ধান করলেন আধ্যাত্মিকতায়। তাঁর আধ্যাত্মিক জগত অবশ্য সাধারণ সংজ্ঞা থেকে ভিন্ন। আবরণহীন শরীর ও মনের একত্র অবস্থানের মধ্যেই তিনি সন্ধান করতে চেয়েছেন সত্যের। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার বৈষ্ণব কবিতার মতই তাঁর কবিতায় আধ্যাত্মিকতা সম্পৃক্ত হয়েছে কামে। আরো যোগ হয়েছিল রাজনৈতিক সচেনতা। এই সব প্ররোচনা একত্রে যেন গ্রাস করল মনুষ্য শরীর ও মন উভয়কেই। আর এরই কারণে সেই প্রকাশে দেখা গেল হতাশা আর ক্রোধ।

১৯৬০ থেকে আরম্ভ করে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত রচিত কবিতাগুলি স্থান পেয়েছে 'প্ল্যানেট নিউজ' কাব্যগ্রন্থে। সবকটি কবিতাতেই শরীর-মন-রাজনীতি সম্পৃক্ত আধ্যাত্মিক বাতাবরনের নগ্ন বাস্তবায়ন। এই গ্রন্থের কবিতাগুলিকে গীনসবার্গ নিজে চিহ্নিত করেছেন 'ইলেকট্রিনিক-রাজনীতি বিচ্ছেদ' এবং ত্রাণকর্তার মুক্তির প্রেরণা বলে। অবশ্য এ ধরণের অধ্যাত্মচিন্তা প্রায় সম্পূর্ণই আড়াল হয়ে আছে চিত্রপটের রুক্ষ জটিলতায়।

এ সময়েই দুটি বিশেষ অভিজ্ঞতা বারে বারেই তাঁর কবিতায় ছায়াপাত করেছে।

কবি সম্মেলনে বিচারক হিসাবে নিমন্ত্রিত হয়ে ১৯৬৫ সালে তিনি কিউবা এসেছিলেন। সমকামিতাকে অসমর্থন করে এবং নাটকের স্কুলগুলিকে বন্ধ করায় সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে তখন ফিডেল কাস্ত্রো একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। কাস্ত্রোর বক্তব্য সমালোচনার জন্য গীনসবার্গকে বিতাড়িত করা হ'ল কিউবা থেকে। সে বছরেই প্রাগে তাঁকে 'মে-কিং' সম্মানে ভূষিত করা হয়েছিলো। সে দেশ থেকেও বিতাড়িত হয়েছিলেন তিনি, আর তাঁর স্বদেশেও তিনি চিহ্নিত হলেন রাষ্ট্রের পক্ষে বিপজ্জনক ব্যক্তি হিসাবে।

তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতার আরো একটি বিশেষ ঘটনা আধ্যাত্মবাদের খোঁজে তাঁর ভারত ভ্রমণ, এবং তাঁর বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ।

এই সব অভিজ্ঞতা এবং স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পরে যে রাজনৈতিক বাস্তবতার সম্মুখীন হয়েছিলেন তিনি, তার মাধ্যমেই আধ্যাত্মিক চেতনায় যেন তিনি গড়ে তুললেন তার মন-কোলাজগুলি। কবিতায় চেতনায় স্বাভাবিকভাবেই দেখা গেল অনন্তের অনুসন্ধান। কিন্তু স্থানীয় চরিত্রের পারিপার্শ্বিকতা থেকে অবিচ্ছিন্ন থেকে। অনন্তের সন্ধান সত্ত্বেও 'দা ফল অফ আমেরিকা'-র এই স্থানীয় চরিত্র সামান্যটুকুও অমলিন হয়নি।

এই অনুসন্ধানে কবিতার উত্তরণ ঘটল স্বপ্ন-সচেনতায়, ভিয়েতনামের যুদ্ধের বিরুদ্ধে তীব্র এবং প্রায় হিংস্র প্রতিবাদ বিশেষ এক প্রেক্ষাপট তৈরি করেছিলো এ সময়ের কবিতাগুলিতে। ম্যাজিক প্লাজম-এর অতিবাস্তব বাগ্মিতা আর টি ভি টিবি-র ক্ষিপ্ত প্রকাশ

ক্রমশই পরিবর্তিত হ'ল কল্পনাপ্রবণ গবেষণাহীন ভাবনায়।

তাঁর ভারত ভ্রমণকে গীনসবার্গ চিহ্নিত করেছেন 'অনন্তের প্রতি তৃষ্ণায় মন:সমীক্ষনের প্রতিজ্ঞা'। এর প্রভাবেই পরিবর্তন হয়েছে কবিতার প্রকাশ। অবশ্য অবয়ব-পরিবর্তনটি চলছিলো পঞ্চাশ দশকের পরের কবিতাগুলি থেকেই। 'দ্য চেঞ্জ' (১৯৬৩)-এর রীতিটি ছিল একটি সুচিন্তিত সংযমী প্রকাশ। এই রীতিটি পাল্টে গিয়ে'টু ডে'(১৯৬৩), 'কিং অফ মে'(১৯৬৫) এবং 'হু বি কাইন্ড টু' (১৯৬৫) কবিতাগুলিকে যে প্রকাশ তাতে সমন্বয় ঘটেছে আবেগ ও বিরক্তি, রাজনীতি ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এবং কখনও অযুক্তি ও ধ্যানস্থতার। 'হু বি কাইন্ড' কবিতায় তিনি লিখলেন

"নিজের প্রতি দয়া দেখাও
জেনো দয়ালু একজন লোক এসেছে তাঁর স্বর্গদ্বারে
ঠান্ডা লড়াই ছিল তাঁর, সেই লড়াইকে শেষ করার জন্য
সে লড়ছে তার নিজের রক্ত-মাংসোর সঙ্গে
বাইবেলের সর্পের প্রথম দিনটি থেকে।"

সত্তরের দশকের তাঁর কবিতায় তার নিজস্ব ধ্যানের জগতে প্রবেশ করলেন তিনি, এ সেই জনহীন পেট্রোকেমিকাল মজার দেশ, আর সেই দেশে আসবেন বলে পেরিয়ে এলেন আমেরিকা নামের তার বিচরণের দেশটির গন্ডী পেরিয়ে। স্থানগত চরিত্রকে মনে রেখে কবিতায় যে আমেরিকা মার্কা ছাপটি সযত্নে তিনি রক্ষা করে এসেছিলেন এতদিন, এ সময়কার কবিতাগুলি থেকেই সেই মোটা দাগের ছাপটি সযত্নে তিনি রক্ষা করে এসেছিলেন এতদিন, এ সময়কার কবিতাগুলি থেকেই সেই মোটা দাগের চাপটি অস্পষ্ট হতে শুরু করেছিলো ষাটের দশকের শেষের দিকের বছরগুলি থেকেই। সত্তরের দশকের কবিতায় সেই চাপ প্রায় সম্পূর্ণ মুছে যায়।

নিজস্ব অভিজ্ঞতার গন্ডী পেরিয়ে জনমানসের সমস্যার সম্মুখীন হয়ে তিনি হোঁচট খেলেন রক্ত-মাংসের নগ্ন মানবতার সাথে। বাঙলা দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রত্যক্ষ রূপ দেখলেন লক্ষাধিক শরণার্থীদের নগ্ন বিহ্বলতায়। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে এই অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ অন্যরূপের, আর এই অভিজ্ঞতায় সম্মুখীন হতে ভয় পেলেন তিনি, তাঁর নিজস্ব সব দুঃখ, গ্লানি এবং হতাশা এই ভয়ংকর অভিজ্ঞতার জন্য কখনই প্রস্তুত করেনি তাকে। আর তাই মনুষ্য কঙ্কালের ক্ষুধার তাড়না এবং বেঁচে থাকার জ্বালাকে প্রত্যক্ষ করে। বিশ্বকে শোনানো যায় এমন কোন প্রতিবাদী ভাষাকে খুঁজে পান নি। শেষ পর্যন্ত 'সেপ্টে স্বর অন যেশোর রোড (১৯৭১) হয়ে উঠল মন্ত্রউচ্চারণের হাহাকার মাত্র - অর্থহীন, শুধুমাত্র বব ডিলানের কণ্ঠে পশ্চিমী সুরে গাইবার জন্য গান, এ মাইনর বি ফ্ল্যাট, ই ফ্ল্যাট, ডি ফ্ল্যাট।

গীনসবার্গের কবিতায় সঙ্গীতের প্রাধান্য সর্বজন স্বীকৃত। ভারত যাত্রা শেষে তিনি অব্যাহতি চেয়েছিলেন সঙ্গীতের জগতে। অস্ট্রেলিয়ার আদিবাদীদের বুনোগানের শরীরে বেজে উঠল রক-সঙ্গীতের সুর। 'আয়ারস রক' ' ভোজনেস্‌কি' শতাব্দীর চুপি স্বরের সিঁড়ি ভেঙে উঠে এল শহরের জনারণ্যে। ধ্বনিত হ'ল আলি মেগাওয়েট ধ্বনি যন্ত্রে। খোলা মাঠে আর নিউইয়র্কের অভিজাত সংস্কৃতিকেন্দ্রগুলিতে। গতিময় হয়ে উঠল ঢাকের কাঠির আওয়াজের বুনো গান-এ নতুন একটি সমাজ সংস্কারের ভূমিকা :

"নাকে কোকেন শুয়ে আমেরিকাকে বাঁচাবে কে
হাঁটু নাচিয়ে বোজা চোখে বৃষ্টিতে,
নাকে পড়বে বরফ, ঠান্ডা জমাবে মস্তিষ্কে"
(সো ব্লুউজ)

প্রাচ্য ধর্ম সংস্কৃতির যে অনুসন্ধান ছিল গীনসবার্গের, শেষ পর্যন্ত তার একটি লক্ষবিন্দুতে গিয়ে পৌঁছুলেন চোগিয়াল টুংপা রিনপোর সান্নিধ্যে। তিনি হয়তো খুঁজে পেতে চেয়েছিলেন বুদ্ধ প্রকৃতির শরীরের সত্যতা। আর মানব শরীর আবির্ভূত বুদ্ধের সৃষ্টির শরীর। এই খোঁজা 'দু:খ-পীড়া-আকাঙ্খা-জীবন' আর জীবনোত্তর আস্থানে। আর তাঁর স্বাভাবিক কৌতুক ও চাতুর্যে অনাস্থা ও রতি-আকাঙ্খা রূপ পেল একটি বিধ্বস্ত আবর্জনায়। যার আধার হল আধ্যাত্মিক বোধ ও ধর্মচেতনা।

চেতনাবোধের এই পরিবর্তন 'প্লুটোনিয়ান ওড্' (১৯৭৭-৮০) কবিতাগুলির আত্মজ প্রথমপুরুষ ভাবনা ও বিচারে। এই ভাবনাটি অতি স্পষ্ট। তাঁর দ্বিবিধ অবস্থানে ভীতির প্রকাশে। এই অবস্থানের প্রথমটি অভিজ্ঞতার রোমন্থনে রক্তচাপাধিক্য, আর দ্বিতীয়টি কামাস্পদ হৃদয়ের আকাঙ্খা, আর তাদের মিলিত সুরটি প্রকাশ পেল 'রক অ্যান্ড রোল' অভিজাত্যে।

তাঁর প্রথম কবিতা 'ইন সোসাইটি' (১৯৪৭) প্রকাশের পয়ত্রিশ বছর পরে প্রকাশিত 'হোয়াইট শ্রাউড'(১৯৮৩)-এর কবিতাগুলিতে যে সুরটি তিনি বেঁধে ছিলেন তা হয়ে উঠল তাঁর নিজস্ব আধ্যাত্মিক সাধনার ফসল। এই নামের স্বপ্নাবিষ্ট দীর্ঘ কবিতায় তিনি লিখলেন :

"আমাকে ডেকে নিয়ে এল আমার বিছানা থেকে
মৃতদের বিশাল নগরে
সেখানে গৃহ নেই আমার, ঘর নেই কোন
স্বপ্নের মধ্যে ঘুরেছি
পুরোনো ঘরটির খোঁজে
নরকভোগের ভয় মনের মধ্যে
বুড়ি দিদিমা শুয়ে আছেন সেখানে
তার শেষের দিনগুলির খাটে,
আর আমার চেয়ে প্রকৃতিস্থ আমার মা
হাসছেন আর কাঁদছেন এখনও বেঁচে আছেন তিনি।"

(পাঠকের সুবিধার জন্য জানাই। মনোবিকারগ্রস্থ হয়ে অনেকবছর চিকিৎসাধীন ছিলেন তাঁর মা, এবং গৃহ প্রত্যাবর্তনের কয়েকদিনের মধ্যেই মারা যান তিনি।)

এ সময় থেকে কবিতার সত্যকে তার জন্মরূপে উদ্‌ঘাটনের প্রচেষ্টা হয়নি আর, আর তাই, কবিতার প্রকল্পের বিকৃতির প্রয়োজনেও অনুভূত হয়নি, প্রয়োজন হয়নি অতিবাস্তব অতিরঞ্জনার। 'হোয়াইট শ্রাউড' কবিতায় যেন চেষ্টা করা হ'ল বিশুদ্ধ হয়ে ওঠার আর অমরত্বের চিন্তায় শান্তির বিশ্রাম। তিনি যুক্তি দেখালেন — 'অমরতা সময়ের সৃষ্টির সঙ্গে ভালবাসায়, অথবা হয়তো বা সময়ই একমাত্র জয় করতে পারে সময়কে — কোন চিন্তায় নয়, শুধু তার স্থিতিতে।" (মুখবন্ধ, স্বনির্বাচিত কবিতা, ১৯৯৬)। মনে হয় ধ্যানস্থ হতে চাইছেন কবি।

ধ্যানের অভিজ্ঞতা স্বাভাবিকভাবেই পরিবর্তন ঘটিয়েছে কবি-মননের, যায় সম্পূর্ণ প্রকাশ পেল 'কসমোপলিটন গ্রিটিংস'(১৯৮৬-১৯৯২) কবিতাগ্রন্থের কবিতাগুলিতে। জীবন দর্শনের নতুন একটি দিগন্তের আভাসও পাওয়া গেল এই কবিতাগুলিতে। 'আফটার লালন'(১৯৯২) বাংলার বাউল কবি লালন ককিয়ের ভক্তিগীতির প্রেরণায় লেখা কবিতা:

"ঘুম নেই, বসে আছি আমি, আর
ভাবছি আমার মৃত্যুর কথা
এখন অনেক এগিয়ে সেই সময়
আমার দশ বছর বয়স
সে সময়ের চেয়ে অনেক কাছে
তখন ভাবতাম কতবড়
এই পৃথিবী—
এখন বিশ্রাম না নিই যদি হয়তো আরো আগে মরবো
আর ঘুমোই যদি আমি নিশ্চয়ই হারাবো
মুক্তির সুযোগ
ঘুমিয়ে অথবা জেগে, অ্যালেন
গীনসবার্গ বিছানায়
মাঝরাতে।"

'দ্য ব্যালাড অফ স্কিলেটন' (১৯৯৫) সালের ফেব্রুয়ারিতে লেখা। রক-সঙ্গীতের সুরের এই কবিতাটিতে যেন আবার পেছন ফিরে তাকাবার তাগিদ। মনে হয়, সেই সামাজিক দায়িত্ববোধ আর রাজনীতি সচেতন কবির ভূমিকাটি আবার পালন করতে সচেষ্ট হয় উঠেছিলেন তিনি। তারই কারণে এই কবিতায় আবার জনপ্রিয় হয়ে ওঠার আকাঙ্খাও প্রকাশ পেল। যে শাশ্বততায় পরিণতির দিকে যাত্রা করেছিলেন তিনি, সে পথে বড়ো বাধা হয়ে দাড়ালো এই ইচ্ছা এবং তার কারণে সমঝোতা। অথচ, আগের বছরই দৃঢ়শীল প্রত্যয়ে তাঁর ধ্যানশীল আকাঙ্খায় লেখা কবিতা অমরত্ব-ভাবনায় সঙ্কুচিত হয়ে সুন্দর একটি কাব্যিক শৈলীকে প্রস্ফুটিত করেছিলো:

"আমি স্বপ্ন দেখলাম গৃহহীন কোন স্থানে আমার বাস
সেখানে হারিয়ে গেছি আমি, একেলা
লোকেরা আমায় শরীরের ভেতর দিয়ে চেয়ে আছে ব্রহ্মান্ডের দিকে,
পাথরের চোখ তাদের

তাই বড়লোক কিম্বা গরিব, সোনায় মোড়া কথা বলা নেই আর
তোমার মুখে হাসি
ঘর নেই যাদের তাদের সঙ্গে হয়তো হাঁটবে তুমি,
তারা পেয়েছে কিছু আশ্চর্য মাধুর্য।"

(নিউ ষ্ট্যাঞ্জা কর অ্যামেজিং গ্রেস, ১৯৯৪)

রেডিও-প্রচারে 'অশ্লীল ভাষা'-র ব্যবহারের ওপর নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করতে সিনেটার হেস্ হেলমস্ এবং তাঁর হেরিটেজ ফাউন্ডেশন সক্ষম হয়েছিলেন ১৯৮৮-র অক্টোবর মাসে।

পরে এই নিষেধ গীনসবার্গের 'সন্দেহজনক' কবিতার ওপরেও প্রযোজ্য হয়েছিলো। যদিও বেশ কয়েকটি আদালতের বিচারে, এই নিষেধাজ্ঞা তাঁর প্রতি প্রযোজ্য হ'লে তা আইনানুগ হবেনা প্রমাণিত হয়ছিলো,

আদালতের রায়েই তাঁর কবিতার প্রচার সময়কে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছিলো। সকাল দুটা থেকে রাত দশটা, এই সময়টাকে বাদ দিয়ে। এ সময়েই নাকি অল্পমতি এবং সুকুমারবৃত্তির শ্রোতারা রেডিও শোনেন এবং তাদের কর্ণে গীনসবার্গের কবিতা অস্থিরতা এবং বিতৃষ্ণার উদ্রেক করবে, যা সমাজের পক্ষে অপকারী। এবং অবশ্যই এই নিষেধটি এখনও বলবৎ আছে, এবং স্কুল পাঠ্যসূচিতে, এমনকি স্কুল লাইব্রেরিতে তাঁর স্থান নেই। ক্রোধ এবং দুঃখবোধে তিনি লিখেছেন:

"তাই, মে-সম্রাট, স্বর্গের ভিতর দিয়ে উড়ে এসেছি আমি
কাগজের মুকুটটিকে ফিরে পেতে
আর পড়ছি সেই বৃদ্ধ মুকুটি, অজানা নয় তার জ্ঞানীও নয়
ভয় নেই আর
আমি মে-সম্রাট ফিরে এসেছি একটি বড় হীরা নিয়ে
এই শূন্য চিন্তার পৃথিবীর মত বিশাল পাথর
আর আমি মে-সম্রাট ব্রুকলিনের বিশিষ্ট ইংরেজি অধ্যাপক
গান গাইছি
সব শেষ, শেষ হয়েছে সব, আকাশের উচুতে শেষ
এখন বৃদ্ধ মন, তাই আ:!"

(-রিটার্ন অফ কার্ল মাজালেস, ১৯৯০)

আমিও জানাচ্ছি আপনাদের, কিছুটা ধৈর্য ধরুন পাঠকেরা, আর আপনাদের শকুনের তীব্র দৃষ্টি কিছুক্ষণের জন্য জমা দিন ভিক্টোরিয়া আমলের পুরোহিতদের কাছে, আর মনোযোগ দিয়ে শুনুন এই কবির ঘোষিত প্রত্যয়গুলি। কেমন নগ্ন, ব্যথায় পীড়িত। ভাষায় অভিঘাতে বিহ্বল হবেন না আপনারা। আর তখনই সক্ষম হবেন কবি মানসের? মর্মস্থলে প্রবেশ করতে। এবং অবশ্যই সাবধান থাকবেন, এই কবির উঠোনে ছড়িয়ে আছে দেখবেন মানুষের দেহ বিনির্গত ক্লেদ, বিষ্ঠা এবং মূত্র। সেই সব পায়ে মাড়িয়ে প্রবেশ করতে হবে তাঁর গৃহে।

বিশেষ ক্রোড়পত্র

পুরাতনী

আমার খাতা
শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী প্রণীত

ভূমিকা

বই লিখলেই ভূমিকা লিখিতে হয়, কিন্তু এ আমার খাতা; তথাপি যখন লেখনী ধরিয়াছি, তখন কিছু লিখিতে হইবে এবং কিছু বক্তব্যও আছে। আমার মত ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র লেখিকার লেখা জনসমাজে প্রচার করিয়া যশাকাঙ্ক্ষা করি না, করিলেই বা তাহা পাইব কেন? সুতরাং আমি আমার এ খাতাখানিকে স্নেহের আবরণে ঢাকিয়া রাখিতে চাই।

সাধারণ পাঠকের প্রতি লেখিকার বিনীত নিবেদন এই যে, শত সহস্র বাধা ও বিঘ্ন সত্ত্বেও গৃহকর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে আমার এ খাতা লিখিতে আরম্ভ করি অল্পদিনে সে হৃদয় ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া গিয়াছে। এই সংসারের গতি দেখিয়া শীঘ্র শীঘ্র শেষ করিলাম।

ইচ্ছা ছিল গৃহিনীপনা একটু বিস্তারিত করিয়া লিখিব কিন্তু সময়াভাবে দুই কথায় শেষ করিতে হইল, তথাপি কার্য্যকরী মুষ্টিযোগ কয়টির জন্য উহাকে একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারিলাম না। হিন্দুস্থানীর মহাভারত বলার ন্যায় আমার গৃহিনীপনা শেষ হইয়াছে। এক হিন্দুস্থানী অপরকে বলিতেছিল — আরে ক্যা মহাভারত মহাভারত বোলতা হ্যায়, এক কুত্তী থা উসকা পাঁচ লড়কা, আউর এক গন্ধারী থা উসকা সও লড়কা। লেকিন থোড়া জমিনকা লিয়ে কাজিয়া হুয়া আউর দাঙ্গা করকে মার দিয়া - মহাভারত তো এহি হ্যায়।

অনেক লেখা হারাইয়া লেখিকার নিজ যোগ্যতা বুঝা উচিত ছিল, তথাপি লেখিকা লেখনী পরিত্যাগ করে নাই, তাহারই ফলে এ খাতা বাহির হইল। কিমধিকমিতি।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী প্রণীত "আমার খাতা" সম্বন্ধে অভিমত।

সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক ও কবি ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এই পুস্তক পাঠ করিয়া লিখিয়াছেন,—

"বাল্যজীবন" খানি আমার খুব ভাল লাগিল—তাহা দিব্য সরস মাধুর্য্যে পরিপূর্ণ এবং তাহার লেখা ঠিক যেন তোমার মন হইতে টাট্‌কা-টাট্‌কি উথলিয়া উঠিয়াছে। সরস্বতীর দেখাদেখি লক্ষ্মীও তোমার প্রতি প্রসন্ন হো'ন—এই আমার আশীর্ব্বাদ।"

বঙ্গসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রথী ভক্তি-ভাজন শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় লিখিয়াছেন,—

"আমার খাতা" আমার বেশ লাগ্‌ল।

একবার পড়িতে আরম্ভ করিলে, শেষ না করিয়া থাকা যায় না। ভাষাও সুন্দর।"

বঙ্গের প্রথম সিভিলিয়ান্, বম্বের ভূতপূর্ব্ব জজ ও বঙ্গসাহিত্যে সুপ্রথিত নামা ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় লিখিয়াছেন,

তোমার বাল্যকাহিনীর খাতাখানি পেয়ে খুসি হয়েছি। সহজ কথা সহজ ভাষায় বেশ সুপাঠ্য হয়েছে। তোমার এ বইও পাঠকদের হৃদয়গ্রাহী হবে, সন্দেহ নাই।"

মাজু উচ্চ ইংরাজী স্কুলের হেড্ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বিদ্যারত্ন মহাশয় কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছে ঃ—

"পরম ভক্তিভাজন মাতৃ-দেশীয়া শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী প্রণীত নব প্রকাশিত "আমার খাতা" নামক গ্রন্থখানির ভাষা বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জল। এই গ্রন্থে রচয়িত্রীর পিতৃদেব ও মাতৃদেবীর সংক্ষিপ্ত জীবনী, লেখিকা মহোদয়ার "বাল্যজীবন" "ভ্রমণ কাহিনী" মুষ্টিযোগ,

পাকপ্রণালী, ধর্ম্মবিষয়ক কতিপয় উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ ও ভগবদ্-বিষয়ক সুমধুর ও সুললিত সঙ্গীতাবলী বিচিত্র বর্ণপুষ্পরাজি গ্রথিত একটি সুশোভন মাল্যের ন্যায় বীণাপাণির অর্চ্চনায় নিয়োজিত হইয়াছে।

ছাপা ও কাগজ উৎকৃষ্ট। মূল্য বার আনা মাত্র। পুস্তকের উপকরণের' তুলনায় মূল্য অপেক্ষাকৃত অল্প বলিয়াই বিবেচিত হয়।"

উৎসর্গ।

পরমারাধ্যতম স্বর্গীয় শ্রীনাথ ঠাকুর—
পিতা ঠাকুর ও স্বর্গীয়া মাতৃদেবীর শ্রীচরণে
ভক্তি ও প্রণতির সহিত আমার এই খাতা
উৎসর্গীকৃত হইল।

পিতঃ—

তোমার স্নেহের সন্তান সন্ততিগুলিকে রাখিয়া কোন্ স্বর্গে গিয়াছ, জানি না; সেখানে আমার ভক্তি বিগলিত উচ্ছ্বাস-ধারা তোমার চরণ স্পর্শ করে কি না জানি না; কিন্তু তাহা স্বতঃ উচ্ছ্বাসিত হইতেছে। তুমি বাল্যকালে আমাদের কত উপদেশ দিতে ও ধর্ম্মকথা বলিতে, সে সব আমার হৃদয়ে গাঁথা রহিয়াছে; এখন যদি কিছু করিয়া থাকি বা পাইয়া থাকি তাহা তোমার কৃপায় ও আশীর্ব্বাদে। হৃদয়ের গভীর ভক্তির সহিত আমার খাতাখানি তোমার চরণে প্রদান করিলাম আর কাহারও কাছে ইহার কিছুই মূল্য নাই। তোমার স্নেহের দৃষ্টি যেমন আমাদের উপর আছে, সেইরূপ ইহারও উপর পড়িবে। তুমি যে লোকেই থাক তোমার করুণা-পূর্ণ আঁখি দুটি আমাদের প্রতি চাহিয়া আছে, আশীর্ব্বাদ কর, যেন কঠোর কর্ত্তব্যের পথ হইতে ভ্রষ্ট না হই। ইতি—

তোমার স্নেহের
কন্যা

আমার খাতা প্রসঙ্গে

'আমার খাতা' পুরোন দিনের লেখা একটি আত্মজীবনী। বই-য়ের গায়ে প্রকাশ তারিখ লেখা নেই। দর্শনিক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, সিভিলিয়ান সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও হাইস্কুলের হেডপন্ডিতের দেওয়া প্রশংসাপত্র দেখে মনে হয় এই লেখার বয়স অন্তত ৭৫ বছরের বেশি।

লেখিকা ইন্দিরা দেবী, তাঁর মা ও বাবার কথা, বাল্যজীবন, বিবাহ এবং ঐ সময়ের স্থান পরিবর্তন, পাকপ্রণালী, মুষ্টিযোগ চিকিৎসা, ধর্মসঙ্গীত ও আরও নানা বিচিত্র কথা লিখে গেছেন, এগুলি পুরোপুরি গোছানো না হলেও মোটামুটি সংবদ্ধভাবেই আছে. এর মধ্যে ব্যক্তিগত ও অনুভববেদ্য অংশটুকু ছাপা হলো। পাকপ্রণালী, মুষ্টিযোগ চিকিৎসা, ধরণের টুকরো টুকরো বিক্ষিপ্ত অংশগুলি বর্জিত হলো।

লেখিকার পিতা শ্রীনাথ, ঠাকুর বংশের সন্তান। লেখিকা ভাবপ্রবণ ও কোমল স্বভাব। নয় বৎসর বয়সে তাঁর বিবাহ হয়। বিবাহের বর্ণনা সরস। আনুমানিক পনেরো ষোল বছর থেকে "আমার খাতা" লেখার শুরু। লেখায় নির্ভুল প্রতিভার স্বাক্ষর আছে। ধর্মসঙ্গীতগুলি থেকে তাঁর উপনিষদ প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। জোড়াসাঁকোয় গিয়ে মহর্ষির কাছে তিনি উপদেশ গ্রহণ করতেন। মহর্ষিও তাঁকে দেবী বলে সম্বোধন করতেন।

কল্যাণী দত্ত

আমার পিতৃদেব

আমার পূজনীয় পিতৃদেব কলিকাতার ঠাকুর বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি শৈশবে ঐশ্বর্য্যের মধ্যে প্রতিপালিত হন, তাঁহার বাল্যযৌবন ভোগৈশ্বর্য্যের মধ্যেই কাটে, তথাপি তিনি সংস্কৃত ও ইংরাজি বিদ্যায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, এক কথায় বলিতে গেলে শিক্ষিত ছিলেন। মধ্য বয়েসে ঘটনাচক্রে তিনি বীত-বিভব হইয়াছিলেন। আমার যখন জ্ঞান হয় তখনও পিতার লক্ষ টাকার সম্পত্তি ছিল, কিন্তু তিনি শেষ জীবনে সব হারাইয়া অমূল্য রত্ন লাভ করিয়াছিলেন, নশ্বর ধন হারাইয়া আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। ঐ সময় তিনি থিয়োজফিষ্ট হন এবং জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশেষ দক্ষতা লাভ করেন। তিনি গণনা করিয়া যাহাকে যাহা ভবিষ্যৎ বাণী বলিতেন, তাহাই সফল হইত।

আমার পিতা দার্শনিক ছিলেন, বেদান্ত তাঁহার শেষ জীবনের সম্বল হইয়াছিল, তাঁর অনেকগুলি শিষ্যও ছিল। তিনি উপদেশসহাশ্রী নামে এক সংস্কৃত পুস্তক অনুবাদ করেন। তাহা তাঁর এক শিষ্যের নামে ছাপা হইয়াছিল। কারণ তিনি যশ আকাঙ্ক্ষা করিতেন না। তিনি সংস্কৃত কাব্যও অনেক পড়িয়াছিলেন; রঘু, কুমারসম্ভব, মাঘ, শকুন্তলা, ভবভূতি ও ভারবী প্রভৃতি কবির শ্লোক সকল তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। তিনি যখন আমাদের পণ্ডিত মহাশয়ের সহিত কাব্যালোচনা করিতেন তখন আমি কৌতূহলের সহিত সেই সকল শুনিতাম। আমি যা কিছু পাইয়াছি, তাহা পিতার আশীর্ব্বাদ ও উপদেশে। আমার হৃদয়ের তৃপ্তির জন্য তাঁহার অশেষ গুণের কথা দু একটি না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। তিনি অটল ধৈর্য্যের সহিত দরিদ্রতাকে হাস্যমুখে বহন করিতেন, তাঁহার শান্ত শ্রী দেখিলে সকলেরই ভক্তি হইত। তাঁহার কথা লিখিতে বসিয়া সেই ঋষিতুল্য কান্তি যেন দেখিতে পাইতেছি। পিতৃদেবের চরণে সভক্তি প্রণাম করিয়া তাঁহার কথা শেষ করিলাম।

পিতা ধর্ম্ম পিতা স্বর্গঃ
পিতাহিঃ পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে
প্রিয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ।।

আমার মাতৃদেবী

আমার পূজনীয়া জননী দেবী ঠাকুরবংশের দৌহিত্রীর কন্যা ছিলেন। তিনি শৈশবে পিতামাতাকে হারাইয়াছিলেন। আমার জননীকে ও আমার পূজনীয় মাতুল মহাশয়কে এক আত্মীয়া বিধবা রমণী লালনপালন করিয়াছিলেন, দুই ভাই ভগ্নির বাল্যজীবন তাঁহারই কাছে কাটিয়াছে আমার জননী দেবী সুন্দরী ছিলেন। তাঁহার সৌন্দর্য্যে এমন একটি কমনীয়তা ছিল যে তাঁহাকে দেখিলেই ভালবাসিতে ইচ্ছা হইত। মাতৃদেবীর যখন ৯ বৎসর বয়স তখন তাঁহার বিবাহ হয়, তিনি পিতার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী ছিলেন। শুনিয়াছি, যখন আমার বিমাতা জীবিত ছিলেন তখন একদিন কোন কর্ম উপলক্ষে তিনি আমার মাকে দেখিয়া পিতাকে বলেন — দেখ, কেমন একটি সুন্দরী মেয়ে এসেছে, ওকে বিয়ে করবে? তখন কে জানিত এই রহস্য-বাক্য একদিন সত্যে পরিণত হইবে? তাহার কিছুদিন পরেই আমার বিমাতা ইহলোক ত্যাগ করিলেন। এক বৎসর কি ততোধিক পরে আমার জননী দেবীর পিতার সহিত পরিণয় হইল। বিবাহের পরদিন যখন সকলে বধূ লইতে আসিল ও বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত করিল তখন সেই বাড়ীতেই আমার জননীর আর এক আত্মীয়া পূজায় উপবিষ্টা ছিলেন। আমার জননী তাঁহার কাছে পলাইয়া গিয়া বলিলেন — কর্ত্তা-মা উহাদের গহনা কাপড় লইয়া যাইতে বল; আমি উহাদের বাড়ী যাইব না। এই কথায় আমার জননীর লোভশূন্যতার পরিচয় পাওয়া যায়।

এই ৯ বৎসরের বালিকাকে পতিগৃহে আসিয়া শাশুড়ীর অভাবে অনেক লাঞ্ছনা ও কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল। বড়লোকের বধূ হইয়াও ভোগবিলাসের পরিবর্ত্তে দারিদ্রের কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল, তাঁহার বাল্যজীবন দুঃখেই কাটিয়াছিল। মধ্যজীবনে সুখ ভোগ আরম্ভ হইতে না হইতেই দারিদ্র ঘনাইয়া আসিয়া সে সুখটুকু হরণ করিয়া লইল; তথাপি সেই চিরপ্রফুল্ল মুখখানিতে কখনও বিষাদের ছায়া পড়ে নাই। আমার জননীর কোন্ গুণের কথা রাখিয়া কোন্ গুণের কথা বলিব। পতিভক্তি যেন মূর্ত্তিমতী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সমস্ত গৃহকর্ম্মে অসাধারণ দক্ষ ছিলেন। রুগ্ন ও দুর্ব্বল শরীরে সমস্ত সংসারের কর্ত্তব্য স্বহস্তে সুন্দররূপে অন্যের সাহায্য ব্যতিরেকে সম্পন্ন করিতেন। রন্ধনকার্য্য এত ভাল জানিতেন যে রোগীর পথ্য ও তাঁহার হস্তে অতি সুস্বাদু হইত। তিনি কখন বৃথা আমোদে সময় নষ্ট করিতেন না। যেটুকু সময় পাইতেন রামায়ণ ও মহাভারত পাঠ করিতেন। অমিতব্যয়ীও ছিলেন না কৃপণও ছিলেন না। স্ত্রীলোকের যে সকল গুণ থাকা উচিত সেই সকল গুণে তিনি ভূষিতা ছিলেন। অতি অল্প বয়সেই তিনি ইহলোক ত্যাগ করিয়াছিলেন। সংক্ষেপে তাঁহার জীবনের গুণাবলী লোকসমাজে প্রচার করিয়া জীবন সার্থক করিলাম।

আমার খাতা

আমার বাল্যজীবন

প্রথম পরিচ্ছেদ

অতি শৈশবে সামান্যমাত্র বুদ্ধির বিকাশ যখন হইয়াছে, তখন আমি আমার পিতার এঁড়েদহ কামারহাটিস্থ গঙ্গার ধারের বৃহৎ বাগানে বাস করিতাম, সুতরাং ঐ স্থান আমার শৈশবের লীলাভূমি ছিল। সেখানকার প্রত্যেক গাছপালার সহিত আমার শৈশবস্মৃতি জড়িত আছে। আমার সেই বাল্যকালের স্মৃতি এখনও আমার মনকে ব্যথিত ও আনন্দিত করে। আমার বাল্যকালের যে স্মৃতি হৃদয়ে আবদ্ধ রহিয়াছে, সেটুকু আমার সঙ্গে সঙ্গেই চলিয়া যাইবে। সেইজন্য বাল্যকালের কথা কিছু লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া যাইবার ইচ্ছা মনে অনেক দিন হইতে হইয়াছিল। এত দিনে তাহা কার্যে পরিণত হইল। আমি শৈশবে দুর্ব্বল, ভীত ও কৃশ ছিলাম এবং কঠিন কঠিন রোগ ভোগ করিয়া স্নায়বিক দুর্ব্বলতাও জন্মিয়াছিল, কিন্তু আমি বড় চিন্তাশীলা ছিলাম, আমার পাঁচ বৎসর বয়সের কথা বেশ মনে আছে। আমি গাছের ফুল দেখিয়া অবাক্ হইয়া চাহিয়া থাকিতাম, সুন্দর ফুল চিত্রবিচিত্র প্রজাপতি ও ছোট ছোট পাখীদের বড় ভালবাসিতাম। শৈশবে ইহারাই আমার সঙ্গী ছিল; আমি প্রত্যহ বৈকালে দাসীর সহিত বাগানে বেড়াইতে যাইতাম ও সযত্নে কুসুম চয়ন করিয়া গঙ্গার ধারে সোপানের উপর বসিয়া কি যে আনন্দলাভ করিতাম তাহা আর কি বলিব। ঊর্দ্ধে দিগন্ত বিস্তৃত আকাশ, নিম্নে ফলফুলসুশোভিত উদ্যান, সম্মুখে ধীরপ্রবাহিনী গঙ্গা, আমি এই সৌন্দর্য্যের মধ্যে আত্মহারা হইয়া বসিয়া থাকিতাম। পরে একটি একটি করিয়া ফুল গঙ্গাবক্ষে ফেলিতাম। ফুলগুলি নাচিতে নাচিতে যাইত, ভাবিতাম, ফুল কোথায় যাইতেছে, আকাশের দিকে চাহিয়া কি একটা ভাবে মোহিত হইতাম। আমার রাশীকৃত খেলনা ছিল। মেয়েরা রাঁধাবাড়া ও বৌ-বৌ খেলে, আমি কখনও সে খেলা করি নাই, পাড়ার মেয়েরা যদি কখনও আমাকে খেলিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিত, আমি একেবারে লজ্জায় মৃতপ্রায় হইতাম, তাহারা এক হাত ঘোমটা দিয়া গৃহিণীর ভান করিয়া খেলিত। তখন আমি আস্তে আস্তে সেখান হইতে সরিয়া যাইতাম, পাড়ার মেয়েরা আমায় বড় ভালবাসিত, তাহার মধ্যে ঘোষালদের একটি মেয়ের সহিত আমার বড় ভাব ছিল। মেয়েটি সুন্দরী ও রোগা ছিল। সে প্রত্যহ দ্বিপ্রহরের সময় আমাদের বাড়ী আসিত। একদিন সে অন্য মেয়েদের সঙ্গে খেলায় যোগ না দিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, ভাই, তোমার কি খেলা ভাল লাগে ? আমি ত কিছুক্ষণ ভেবে কিছুই ঠিক্ করিতে পারিলাম না। তথাপি তাহাকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত বলিলাম আমার ফুল-খেলা ভাললাগে। এস ভাই আমার খেলনাগুলিকে ফুল দিয়ে সাজাই। তখন সে ফুল তুলিয়া আনিল ও তাহাতে আমাতে পুতুলগুলিকে ফুল দিয়া সাজাইলাম। সেই দিন হইতে সে আমার ফুল তুলিয়া মালা গাঁথিয়া দিত। সে যতক্ষণ আমার কাছে থাকিত এই তার খেলা ছিল। পরে বাড়ী গিয়া সে তাহার একখানি ছোট ঘরে হাঁড়িকুঁড়ি লইয়া রাঁধাবাড়া খেলা করিত। একদিন তাহার বাড়ী গিয়া দেখি, সে বিবস্ত্রা হইয়া খেলা করিতেছে দেখিয়া বলিলাম, ছি ভাই, কাপড় না পরিয়া কেন খেলা করিতেছ? এই কথা বলিয়াই আমার মনে এত কষ্ট হইয়াছিল যে শত-চেষ্টাতেও তাহার সহিত কথা কহিতে পারি নাই। পরে বাড়ী আসিয়াও বারবার সেই কথা মনে হইয়াছে। পরদিন

সে আমাদের বাড়ি আসিলে তাহার নিকট ক্ষমা চাহিয়া তবে আমার মন স্থির হয়, আমার একটু সামান্য দোষ হইলে মন এত খারাপ হইত যে, সারাদিন তাহার জন্য মনের বিষণ্ণতা দূর হইত না। যদি কাহারও দুঃখের কথা শুনিতাম বা দেখিতাম, তাহা হইলে নির্জ্জনে বসিয়া ভয়ে ভয়ে কাঁদিতাম, পাছে কেহ দেখিতে পায়। আমার এই ভাব দেখিয়া মা বলিতেন, আমার এ মেয়ে বোধহয় পাগল হইবে। আমার ভাই বা বোন কেহ কোন দোষ করিলে তাহা আমার উপর আসিয়া পড়িত, কারণ আমি কোন কথার প্রতিবাদ করিতাম না, আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে কান্না ছাড়া আর আমার কিছুই সম্বল ছিল না। সেই জন্য আমার নাম ছিঁচকাঁদুনে হইয়াছিল, সুতরাং মা মনে করিতেন যে যত কিছু অকার্য্য আমার দ্বারাই সম্পন্ন হয়।

দাদা চঞ্চল প্রকৃতি ছিলেন। প্রায়ই মার সংসারের আবশ্যক সকল দ্রব্য লোকসান করিয়া ফেলিতেন, আর তিরস্কার ও প্রহার আমার উপর দিয়াই যাইত, — দাদার অসাবধানতার ফল আমাকেই ভোগ করিতে হইত। আমি মনকে প্রবোধ দিতাম যে, আমি ত অপরাধ করি নাই, ঈশ্বর জানেন, দাদার কথা মা জানিলে দাদাকেই ত মা তিরস্কার ও প্রহার করিতেন, এই আমার একমাত্র সান্ত্বনা ছিল, যখনকার কথা বলিতেছি, তখন আমার বয়স আন্দাজ ৬ কি ৭ বৎসর তখন আমি বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ শেষ করিয়া দ্বিতীয় ভাগ পড়িতাম।

একদিনের ঘটনা। পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমার মা সুগৃহিণী ছিলেন। তিনি একটা বাক্সে করিয়া ভাণ্ডার হইতে কিছু কিছু প্রয়োজনীয় দ্রব্য উপরে আনিয়া রাখিতেন। একদিন শীতকালে সকালে সেই বাক্সের উপর দাদা উঠিয়াছিলেন, যেমন তাহা হইতে অবতরণ করিতে যাইবেন অমনি ইটের উপর বসান বাক্স ইট হইতে সরিয়া যায় ও তন্মধ্যস্থ নারিকেল তৈল পড়িয়া যায়। দাদা সেখান হইতে আসিয়া আমার কাছে বলিলেন, আয় না, আমরা একটা খেলা করি, দাদা আমাকে খেলিতে ডাকিলেই ভয়ে আমার হৃৎকম্প হইত; কারণ দাদার দৌড়াদৌড়ি ভিন্ন অন্য খেলা ছিল না। আমি ভয়ে ভয়ে দাদার অনুসরণ করিলাম। দাদা ঘরের ভিতর যাইয়া খাটের উপর উঠিয়া একখানি জানেয়ার লইয়া তাঁহার ও আমার গায়ে জড়াইয়া দিয়া আমার কনিষ্ঠা ভগিনী সুষমাকে বলিলেন, তুই আমাদের ছুঁতে আয়, আমরা পালাই, সুষমা যেমন আমাদের ছুঁতে এল, অমনি দু এক পা সরিতে না সরিতেই আমরা জানেয়ার জড়াইয়া পড়িয়া গেলাম ও আমার কপালের কিয়দংশ ফুলিয়া উঠিল। দাদা আমার হাত ধরিয়া তুলিয়া বলিলেন, হাস, হাস; হাসি কি ছাই আসে। তখন চোখ দিয়া ঝর্‌ঝর্ করিয়া জল পড়িতেছে, অনেক কষ্টে চোখের জল মুছিয়া স্থির হইয়া বসিলাম ও বলিলাম, আমার কপাল যে ফুলেছে। মা জিজ্ঞাসা করিলে কি বলিব, তখন দাদা বলিলেন, বলিস্ বাক্সের উপর উঠিয়া খেলিতে গিয়া পড়িয়া গিয়াছি ও তেলও পড়িয়া গিয়াছে। আমি বলিলাম, মিথ্যা কথা কি করিয়া বলিব? তাহাতে দাদা বলিলেন তোর সত্য কথার জন্য আমি কি মার খাব, আমি অন্য উপায় না দেখিয়া সেখান হইতে উঠিয়া গাড়ীবারান্দায় গিয়া বসিলাম।

শীতকালের কুহেলিকাচ্ছন্ন আকাশ — গঙ্গার পরপার দেখা যাইতেছে না। গঙ্গাবক্ষে দুএকখানি নৌকা রহিয়াছে, নিশির শিশিরসিক্ত ফুলগুলি ফুটিয়া রহিয়াছে, কামিনী ফুলের গাছের উপর একটি মাছরাঙা পাখী বসিয়াছিল; আমি প্রকৃতির শোভা দেখিতেছিলাম; পাখী উড়িয়া গেল, আমার মনে আবার চিন্তা আসিল, কি করিয়া এই বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করিব। তাই একমনে ঈশ্বরকে ডাকিতে লাগিলাম, দয়াময়, তোমার দয়ার পরিচয় আমায়

দেও, এমন সময় মা আসিলেন, আসিয়া আমার বিষণ্ণ মুখ দেখিয়া আমাকে কাছে ডাকিলেনও আমার কপালের ফুলো দেখিয়া আমায় বলিলেন, কি হয়েছে মা, মাথা কি করিয়া ফুলিয়াছে? আমি কেবল দুটি কথা বলিলাম, যে আমি পড়ে গিয়েছি ও তেল পড়ে গেছে। তখন মা বলিলেন তেল পড়িয়া গিয়াছে, আর কোথাও তো লাগে নাই? দাদা তখন পড়িতে গিয়াছেন। সকাল বেলায় দাদার তখন মাষ্টার আসিত, আমি ঈশ্বরের দয়া তখন প্রত্যক্ষ করিয়া ঈশ্বরকে প্রণাম করিলাম। সকালে দাদা মাষ্টারের কাছে পড়িতেন, বিকেলে আমরা উভয়ে পণ্ডিত মহাশয়ের কাছে পড়িতাম। কোন কোন দিন পিতা আমাদের পরীক্ষা করিতেন, আমাকে আগে জিজ্ঞাসা করিয়া পরে দাদাকে জিজ্ঞাসা করিতেন, অবশ্য দাদা আমার চেয়ে অনেক বেশি পড়িতেন। তথাপি দাদা যেটা বলিতে পারিতেন না, আমি সেটা বলিতাম। এই রকম করিয়া দু একবার বলিলে পিতা আমাকে দাদার কান মলিয়া দিতে বলিতেন, আমি ভয়ে ভয়ে দাদার কানের কাছে হাত নিয়ে গেলে দাদা আস্তে আস্তে বলিতেন, দেখ, আমার কান মলে দিলে উপরে গিয়ে তোকে সাজা দেব, দেখ্‌বি তখন।

একদিন আমরা দুইজনে দুইখানা চেয়ারে বসিয়া আছি। সম্মুখে আর একখানি চৌকিতে পণ্ডিতমহাশয় বেত্রহস্তে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে পিতা আসিয়া বলিলেন যে, আজ যে নড়বে তাহাকে বেত মারবেন, বলিয়া চলিয়া গেলেন। বাগানে ভয়ানক মশা, আমার পায়ে একটি মশা বসায় আমি যেমন পা নাড়িয়েছি, আর অমনি পণ্ডিত মহাশয় বেত্র আস্ফালন করিয়া আমাকে যেমন ভয় দেখাইতে যাইবেন, আর সেই বেত সজোরে আসিয়া আমার পায়ে লাগিল ও পা কাটিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। আর আমি অমনি দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া নীরবে বসিয়া রহিলাম। পণ্ডিত মহাশয় অনেক করিয়া আমাকে পড়িতে বলিলেন, কিন্তু আমি কোন মতে মুখের হাত খুলিলাম না, তখন বাবা মহাশয় আসিয়া আমাকে তদবস্থায় দেখিয়া তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় পণ্ডিতমহাশয় বলিলেন, যে বেত দিয়ে ভয় দেখাইতে গিয়া পায়ে লাগিয়া গেছে। বাবা মহাশয় আমাকে কাছে ডাকিয়া যখন দেখিলেন, যে আমার পায়ে রক্ত পড়িতেছে, তখন আমায় যে মানুষ করিতেছিল সেই দাসীকে ডাকিয়া আমাকে লইয়া যাইতে বলিলেন। দাসী আমাকে বড় ভালবাসিত, সে আমার পায়ে রক্ত দেখিয়া পণ্ডিতমহাশয়কে গালি দিতে দিতে আমার পায়ে তেলজল দিয়া দিতে লাগিল। আমাদের একজন সরকার ছিল, সে পণ্ডিতমহাশয়ের তিন চারি গাছি বেত জলে ফেলিয়া দিয়াছিল। বাবা মহাশয় এই কথা জানিতে পারিয়া তাহাকে নিষেধ করিয়া দেন। আমাদের বাড়ীর পরিবারের মধ্যে পিতামাতা ও পিতার এক খুল্লতাত-পত্নী ও তাঁহার বৃদ্ধ পিতামাতা ছিলেন। দিদিমা আমাদের এক প্রকার খেলার সঙ্গী ছিলেন। আমরা পড়িয়া আসার পর হইতে রাত্রি ৯টার পর পর্য্যন্ত খেলা ও গল্প করিয়া আমাদের জাগাইয়া রাখিতেন। সে খেলায় একটুকু নূতনত্ব ছিল। কোন দিন আমি ও দাদা বাগানের গাছ হইতাম, দিদিমা গোড়া খুঁড়িতেন, জল দিতেন, ফুল তুলিতেন, মালা গাঁথিতেন, — সমস্ত কল্পনায়। কোন কোন দিন রামায়ণ ও মহাভারত গল্পচ্ছলে বলিতেন। এ ছাড়া আমাদের নূতন একটি খেলা ছিল। তাহা জ্যোৎস্নাময়ী রজনী না হইলে হইত না। সে খেলা জগন্নাথক্ষেত্রে যাওয়া, — সেইটিই আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় ছিল। আমাদের বারান্দায় একখানি জগন্নাথের পট টাঙ্গান ছিল। জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রে বারান্দায় একখানি মাদুর পাতিয়া দিদিমা বসিতেন, আর আমরা দুই ভাইবোন তাঁহার কোলে মাথা রাখিয়া কৃত্রিম নিদ্রায় নিদ্রিত

হইতাম। আর দিদিমা মুখে মুখে জগন্নাথক্ষেত্রে যাইবার আয়োজন করিতেন আর বলিতেন যে ইহারা নিদ্রিত হইয়াছে। ইহাদের রাখিয়া আমি যাইব আর আমরা অমনি জাগ্রত হইয়া বলিতাম যে আমরাও জগন্নাথক্ষেত্রে যাইব। আমরা যখন কিছুতেই থাকিতে চাহিতাম না। তখন দিদিমা বলিতেন অত দূরে হাঁটাপথ, একান্ত না থাক চল, এই বলিয়া সেই গাড়িবারান্দার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত দিদিমা বারবার আস্তে আস্তে যাওয়া-আসা করিতেন আর মুখে গান করিতেন।

"আঠার নালায় পড়ে যাত্রী,
তারে পার করহে শ্রীহরি,
সারারাত্র হেঁটে মলুম,
পোয়া বাট বই কয় না,
জয় জগন্নাথ দয়া কর
আর তো দুখ সয় না।"

তারপর জগন্নাথক্ষেত্রে আসিয়া বাসা লওয়া, জগন্নাথ দর্শন ইত্যাদি সব কল্পনায় চলিত। আর সেই জ্যোৎস্না বারান্দায় আসিয়া পড়িত, সেইটে আমাদের সমুদ্র হইত। কত আনন্দে আমরা সেই সমুদ্রে স্নান করিতাম, ঝিনুক কুড়াইতাম ও প্রসাদ ভোজন করিয়া গৃহে ফিরিতাম। এই আমাদের নিশীথের খেলা। তখন হইতে আমি আমার মার গৃহকর্ম্মে অল্প অল্প সাহায্য করিতাম। মার মাসকাবারের জিনিষপত্র আসিত বেলা দ্বিপ্রহরে। মা যখন সেই সব দ্রব্য গুছাইয়া যথাস্থানে রাখিতেন, আমিও তাঁহার সঙ্গে সাহায্য করিতাম। আমার কাছে সামান্য কাগজও বাদ যাইত না, তাহা কুড়াইয়া লইয়া তাহাতে কি লেখা আছে দেখিতাম। তাহার মধ্য হইতে কত গল্প, হেঁয়ালী, গান পাইয়াছিলাম। তাহার মধ্যে একটি এইখানে উদ্ধৃত করিলাম। এক রাজার দুই রাণী ছিল, দুই রাণী থাকিলে যাহা হয়, ক্ষেত্রেও তাহাই হইল। এক দুয়ো ও অপরটি সুয়ো; দুয়ো রাণী যে বড় রাণী, সেটা অবশ্য বলিয়া দিতে হইবে না। একদিন গোয়ালিনী রাজার বাড়ী দুগ্ধ দিতে আসিয়াছে, বড় রাণীকে বিষণ্ণ বদনে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল। হ্যাঁ রাণী মা, অমন মুখখানি ভার করিয়া কেন বসিয়া আছ? তখন রাণী বলিলেন, রাজা আমায় দেখিতে পারেন না, আমার যে কষ্ট, তাহা আঁর তোকে কি বলিব। গোয়ালিনী বলিল, ও মা আমায় এতদিন তা বলতে হয়। কেন তোকে বল্লে কি হত? — কেন? আমার কাছে এমন এক কবিরাজ আছে যে, তাহার ঔষধে আমার হারান গরু আমি ফিরিয়া পাইয়াছি। রাণী বলিলেন সে কি রকম? গোয়ালিনী বলিল, আমার ধবলি গরু হারিয়েছিল, সেই যেটার দুধ তোমাদের দিই, তা আমি বসে বসে কাঁদছিলাম, কবিরাজ আমাকে দেখিয়া বলিল, তোমার কি হয়েছে, বাছা, কাঁদছ কেন, তখন আমি বলিলাম, আমার গরু হারাইয়াছে, তাহাতে সে কবিরাজ আমাকে কতকগুলি হরিতকী পড়িয়া দিয়া গেল ও তাহা বাটিয়া খাইতে বলিল, আমি তাহা বাটিয়া খাইতে আমার পেট ছাড়িয়া দিল ও আমাকে বারবার বনের মধ্যে যাইতে হইল। সেখানে গিয়া দেখি আমার ধবলি ঘাস খাইতেছে, আমি তাহাকে তৎক্ষণাৎ ঘরে লইয়া আসি। আমি এখন গিয়া সেই কবিরাজকে তোমার কথা বলিব, রাণী বলিলেন, বলিস, তাহার পরদিন গোয়ালিনী রাণীর জন্য হরিতকীপড়া আনিল, রাণী তাহা খাইলেন; রাণীর ভেদ হইতে লাগিল, রাজার নিকট খবর গেল। বড় রাণীর আসন্নকাল উপস্থিত। রাজা কবিরাজ

লইয়া আসিলেন ও মনে করিতে লাগিলেন যে, আমারই অযতনে বুঝি রাণী মরিতে বসিয়াছেন। এই অনুতাপ রাজাকে বারবার বিদ্ধ করিতে লাগিল। তদবধি রাজা রাণীকে ভালবাসিতে লাগিলেন। রাণীও সুস্থ হইলেন। এমন সময় রাজার যুদ্ধ উপস্থিত হইল। নদীর পরপারে বিপক্ষের সেনা আসিয়া শিবির স্থাপন করিল, রাজা ম্লানমুখে রাণীর কাছে আসিলেন; রাণী তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন; রাজা বলিলেন, আমার যুদ্ধ উপস্থিত, বিপক্ষের সেনা অনেক, তাহাতে আমাদের যুদ্ধে জয়লাভ করা কঠিন। তখন রাণী বলিলেন, তাহার জন্য চিন্তা কি? আমি তাহার ব্যবস্থা করিতেছি। বলিয়া সেই গোয়ালিনীকে খবর দিলেন। গোয়ালিনী আসিয়া কবিরাজের নিকট হইতে পূর্ব্বের মত হরিতকীপড়া আনিয়া দিল। রাজার প্রত্যেক সৈন্যকে তাহা বাটিয়া খাওয়াইতে বলিল এবং নদীর ধারে মলত্যাগ করিতে বলিয়া দিল। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সমস্ত সৈন্য নদীর ধারে মলত্যাগ করায় অপর পক্ষ ভাবিল, যে-রাজার এত সৈন্য, ইহার সহিত আমরা যুদ্ধে পারিব না। তাহারা বিনাযুদ্ধে পলায়ন করিল। হরিতকীর এই গুণের জন্য কবিরাজ মহাশয় রাজার নিকট হইতে প্রভূত পারিতোষিক পাইলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

"যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী"

একদিন সকাল বেলায় বাবা মহাশয় দিদিমা ও মা তিনজনে বসিয়া কি কথোপকথন করিতেছিলেন, তারমধ্যে "যাদৃশী ভাবনা" এই কথাটি ছিল, এই কথা শুনিয়া আমি সেখান হইতে চলিয়া আসিয়া আমার দাদাকে বলিলাম যে, বাবা মহাশয় বলিতেছেন যা ভাবা যায় তাই সিদ্ধ হয় এস আমরা পরীক্ষা করি। তাই কিছুক্ষণ পরামর্শ করিয়া স্থির হইল যে, একজন সাহেব ও মেম তাহাদের ছেলেমেয়ে নিয়ে পথ ভুলে আমাদের বাগানে আসে এই বলিয়া আমরা দুজনে এক মনে ভাবিতে লাগিলাম, ঘড়ি দেখিলাম তখন বেলা ৮টা। ৮টা হইতে সেই গাড়িবারান্দায় বসিয়া ভাবিতে শুরু করিলাম কেবল আহারের সময় উঠিয়া গিয়া ভাবিতে ভাবিতেই আহার করিয়া আসিয়া পুনরায় সেইখানে বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম, যখন বেলা ২টা তখন আমাদের ভাবনা সত্যে পরিণত হইল। কোম্পগরে পাটের কলে যাইবার পথ ভুলিয়া ঐ সাহেব মেম ছেলেমেয়ে লইয়া আসিয়াছিল। তাহারা আমাদের বাগানে প্রবেশ করিবামাত্র প্রথমেই আমাদের চোখে পড়িল। আমাদের চিন্তার সফলতা দেখিয়া আমার হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইয়াছিল। আমি তাড়াতাড়ি বাবা মহাশয়ের নিকট যাইয়া বলিলাম যে আমরা বাগানে সাহেব মেম আনাইয়াছি, আপনি যাইয়া দেখুন। বাবা মহাশয় বলিলেন, সাহেব মেম আনাইয়াছিস কি রকম? তখন আমি বাবা মহাশয়কে আমাদের ভাবনার আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বিবরণ বলিলাম। বাবা মহাশয় এই কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়া নীচে নামিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় মালী আসিয়া সাহেবের আগমন সংবাদ দিল। বাবা মহাশয় নীচে যাইয়া সাহেবের সহিত দেখা করিয়া তাহাদের আসিবার কারণ অবগত হইলেন এবং আমাদের মালিকে সঙ্গে দিয়া তাহাদের গন্তব্য স্থানে পাঠাইয়া দিলেন।

আমাদের কোন আত্মীয়ার কন্যার বিবাহ উপলক্ষ্যে আমাদের কলিকাতায় আসিবার কথা হয়। তাহাতে আমার বড় আনন্দ হইয়াছিল। মা যখন যাত্রার আয়োজন করিতেছিলেন আমরা তখন আমাদের খেলনাগুলি এখানে ওখানে লুকাইয়া রাখিতেছিলাম। পরে গাড়ী আসিলে আমরা সকলে গাড়ীতে উঠিলাম। গাড়ীতে উঠিয়াই আমার মনে কষ্ট হইতেছিল যে আমরা

কত ভারী, ঘোড়ার কত কষ্ট হইতেছে, এই ভাবিতে ভাবিতে আমি সারাপথ বিষণ্ণ ও আড়ষ্ট হইয়া গাড়ীতে বসিয়াছিলাম। আমার এই প্রথম কোথাও যাওয়া বা গাড়ীচড়া। আমরা বেলা ২।।০টার সময় বাগান হইতে রওনা হইয়া সন্ধ্যা ৭টার সময় কলিকাতায় আত্মীয়ার বাড়ীতে আসিয়া পৌঁছিলাম।

পল্লীগ্রামের সেই শান্তভাব আর শহরের জনাকীর্ণতাও কোলাহল দেখিয়া ভয়ে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছিলাম। রাত্রি হইয়াছিল, আমরা আহারাদি করিয়া শয়ন করিলাম, পথে গাড়ীর ঘড়ঘড়ানির শব্দে বড়ই অশান্তি বোধ হইতে লাগিল পথশ্রমে আমরা ক্লান্ত হইয়াছিলাম, অল্পক্ষণ পরে নিদ্রিত হইয়া পড়িলাম পরদিন সকাল বেলায় উঠিয়া কলিকাতা আর এঁড়িয়াদহর তুলনা করিতে লাগিলাম। বিহঙ্গমের সুমধুর স্বরলহরীর পরিবর্ত্তে কাকের কা কা শব্দে ও গাড়ীর ঘড় ঘড় শব্দে এমন খারাপ বোধ হইতে লাগিল যে, আবার পল্লীর সেই শান্তিময় ক্রোড়ে ফিরিয়া যাইবার ইচ্ছা হইতেছিল। চরিদিকে কেবল বাড়ী, কোথাও একটি নয়নতৃপ্তিকর গাছ দেখিবার যো নাই। তারপর কয়দিন বিবাহের গোলমালে আমার আর অন্য চিন্তার অবসর ছিলনা। বিবাহ হইয়া গেল, আমাদের আত্মীয়গণ পশ্চিমে চলিয়া গেলেন, আমরা সেই বাড়ীতেই রহিলাম। তারপর আমাদের বাগানে ফিরিবার আর কোন আয়োজন না দেখিয়া ভয়ে ভয়ে মার কাছে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, আমরা কবে যাইব, তখন মা আমাকে কোলে করিয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে আমাকে বলিলেন যে আর আমরা সেখানে যাইব না। মার কথা শুনিয়া আমিও মার কোলে মাথা রাখিয়া অনেকক্ষণ কাঁদিলাম। মাও অশ্রুমোচন করিতেছিলেন, কাজেই আমাকে সান্ত্বনা দিতে পারেন নাই।

খানিক পরে হৃদয়ের ভার লঘু হইলে চোখ মুছিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কেন যাওয়া হইবে না। তখন তিনি বলিলেন যে, আমার পিতার সহিত কাকা মহাশয়ের মকর্দ্দমা হইতেছিল, তিনি তাঁহার প্রাপ্য অংশ বাগানটিকে বিক্রয় করিয়া লইবেন। কাজেই আর আমাদের যাওয়া হইবে না।

সেদিনটা আমার ভয়ানক কষ্টে কাটিল। বারবারই মনে হইতে লাগিল যে আসিবার সময় যদি জানিতাম যে এই আমাদের শেষ যাওয়া তাহা হইলে সেখানকার সকলের কাছে বিদায় লইয়া আসিতাম। সেখানকার ফুল ফলের গাছ, গঙ্গা ও বাড়ী আমাকে হৃদয়কে সহস্র স্নেহের বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছিল — তীব্র যন্ত্রণা দিয়া একে একে সেই সকল বন্ধন ছিন্ন হইয়া গেল। ভাবিলাম, শৈশবের সুখের স্বপ্নে মগ্ন ছিলাম তাহা ত ভাঙ্গিয়া গেল।

আগে নিজের জীবনকে যেমন করিয়া নিয়োজিত করিয়াছিলাম, জীবননদী যে দিকে প্রবাহিত হইতেছিল তাহা অন্য দিকে প্রবাহিত হইল। তখন হইতে আমার হৃদয়ে ধর্ম্ম ও কর্ম্মের ভাব ধীরে ধীরে প্রবেশ করিল। ঐ সময় হইতে আমার কর্ম্মের জীবন আরব্ধ হইল।

আমাদের আগে অনেক দাসদাসী ছিল, এখানে আসিবার পর তাহাদের সকলকে ছাড়াইয়া দিয়া কেবল একজন ব্রাহ্মণ, একটি দাসী ও একজন চাকর রাখা হইল। একজন চাকর অনেক দিনের পুরাতন ছিল সে বিনা বেতনে আমাদের বাড়ীতে রহিল তাহাকে আমরা দাদাভাই বলিতাম। বাবা মহাশয়ের সেবার জন্য যে সব লোক ছিল তাহাদের ছাড়াইয়া দিয়া সে ভার মা স্বয়ং গ্রহণ করিলেন। আমিও মার সঙ্গে বাবা মহাশয়ের সেবা করিতাম। ঐ সময় একখানি নিত্যকর্ম্মপদ্ধতি কিনিয়া শিবপূজা করিতাম।

অতি প্রত্যূষে সকলের আগে উঠিয়া স্নান করিতাম; মালিনী পূজার ফুল দিয়া যাইত; আমি চন্দন ঘসিয়া পূজার আয়োজন করিয়া লইয়া পূজায় বসিতাম। তখন আমার হৃদয় ভক্তিতে পূর্ণ হইত। পূজা শেষ হইলে আমি যাইয়া বাবা মহাশয়ের সেবা করিতাম। বাবা মহাশয়ের প্রয়োজনীয় সমস্ত কাজ শেষ হইলে বাবা মহাশয় যখন পাঠে নিযুক্ত হইতেন, তখন আমি যাইয়া মার জলখাবার পান ইত্যাদি দিয়া আসিতাম। মা গৃহকর্ম্মে যাইতেন। আমি আবার বাবা মহাশয়ের সেবায় নিযুক্ত হইতাম। আমার সকল কার্য্য শেষ হইলে দিদিমার কাছে যাইয়া পড়িতাম।

মা ও দিদিমা জয়মঙ্গলবার ও ইথুপূজা প্রভৃতি ব্রত করিতেন, আমিও তাঁহাদের সঙ্গে ঐ সব ব্রত করিতাম।

আমার পিতা সেখান হইতে অন্যত্র যাইবার জন্য অল্প ভাড়ায় একটি বাড়ী খুঁজিতেছিলেন। আহিরিটোলায় একটি দুমহল বাড়ী ৪০ টাকা মাসিক ভাড়ায় স্থির হইল। সেটা ভূতের বাড়ী বলিয়া কেহ ভাড়া না লওয়ায় তাহা "পড়ো" হইয়া পড়িয়াছিল। সেই বাড়ীটা বাবা মহাশয় ভাড়া লইয়া তাহার সংস্কার করিতে বলিয়া দিয়া বাড়ীতে ফিরিয়া মাকে বলিলেন, একটা বড় বাড়ী পাইয়াছি, তাহা ভূতের বাড়ী বলিয়া কেহ ভাড়া নিত না, সেইটেকে আমি সারাইতে বলিয়া দিয়া আসিয়াছি। সেই কথা শুনিয়া আমার মনে মনে বড় ভয় হইতে লাগিল। আমার অভ্যাস নয় যে মুখ ফুটিয়া কাহাকেও কিছু বলি, কাজেই সেই ভাব আমার মনে চাপিয়া রাখিলাম। তারপর আমরা সকলে সেই বাড়ীতে উঠিয়া গেলাম। বাড়ীটা বড়, স্বভাবতই একটু ভয় ভয় করিত তার উপর ভূতের কথা শুনিয়া সর্ব্বদাই আতঙ্কিত থাকিতাম।

আমরা যেদিন সে বাড়ীতে আসিলাম সেই দিন আমাদের বাগানের একটি চাকর আমাদের কাছে চাকরী করিবার জন্য কাঁদিতে লাগিল; বাবা মহাশয় তাহাকে বলিলেন, আমার এখন সে সময় নাই যে তোমাকে মাইনে দিয়ে রাখব, তবে তুমি অন্যত্র চাকরীর চেষ্টা কর যে কদিন না জোটে সে কদিন এখানে থাক, খাও।

বাহিরের ঘরে সে একাকী শয়ন করিত। তাহার কাছে ভূতের কোন কথা বলা হয় নাই, তাই সে একাকী শয়ন করিত। আমাদের এই বাড়ীর একটা বড় ঘরে প্রত্যহ রাত্রে ঢিল পড়িত, সেই ঘরের সার্সিটি ভাঙ্গা ছিল, তাহার ভিতর দিয়া ঢিল ঘরের ভিতর আসিয়া পড়িত। দুই তিন দিন এইরূপ ঢিল পড়ার পর বাবা মহাশয় সেই চাকরকে বলিলেন যে আজ তুই আর আমি ঐ ঘরে শুইব। তখন সেই চাকর কিছুতেই শয়ন করিতে চাহিল না। সে বলিল, ওহি ঘর মে শয়তান হ্যায় ইটা ফেকতা হ্যায় হাম উস্ ঘর মে নেহি সোয়েঙ্গে। বাবা মহাশয় তাহাকে অনেক করিয়া বলিলেন, তোর ভয় কি আমার কাছে থাকবি। তাহাতে সে রাজি হইল। বড় ঘরে, এক প্রান্তে বাবা মহাশয়ের শয্যা প্রস্তুত হইল। বাতি ও দেশলাই রাখিয়া বাবা মহাশয় সেই ঘরে শয়ন করিলেন। রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় দুড়দাড় শব্দে ঘরে ইঁট পড়িতে আরম্ভ হইল। তখন বাবা মহাশয় বাতি জ্বালিয়া এমনভাবে আনিলেন যে বাহির হইতে সে ঘরে যে আলো আছে জানা গেল না।

জানলার কাছে আলো আনিতেই দেখিতে পাইলেন, পাশের বাড়ীর পাইখানার ছাতে দাঁড়াইয়া উলঙ্গ হইয়া একজন ইঁট ফেলিতেছিল; বাবা মহাশয়কে দেখিয়া সে দৌড়িয়া পলাইয়া গেল। তাহার পর দিন অনুসন্ধানে জানা গেল যে বাড়ীর পাশের বাড়ীতে কতকগুলি

পতিতা স্ত্রীলোক থাকে, তাহারাই প্রেতাত্মা সাজিয়া এই বাড়ীতে ভাড়াটিয়া থাকিতে দিত না। সেই দিন বাড়ীওয়ালাকে ডাকাইয়া তাহাদের বিধিমত ভয় দেখানোর পর হইতে আর তাহারা ওরূপ করিত না। কিন্তু তাই বলিয়া সে বাড়ীতে যে ভূত ছিল না তাহা নহে, কারণ ভূত অনুগ্রহ করিয়া একদিন আমাকে দেখা দিয়াছিলেন। একদিন সন্ধ্যার সময় একাকী একটা ঘরে ছিলাম, সে ঘরটা তিনটি কাঠের সিঁড়ি দিয়া উঠিতে হয়; দেখিলাম, আমার ছোট বোনের মত কিম্বা তাহার অপেক্ষা কিছু বড় হইবে এলোচুলে কে হিঃ হিঃ শব্দে হাসিয়া চকিতে পলাইয়া গেল। কাঠের সিঁড়ি দিয়া নামিবার শব্দ শুনিলাম। আমি ভাবিলাম আমার বোন সুষমা বুঝি আমায় ভয় দেখাইয়া গেল, তাই আমি ভীত না হইয়া দিদিমা দিদিমা বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে দিদিমার কাছে গিয়া দেখি দিদিমা আহ্নিক করিতেছেন, সুষমা তাঁহার কাছে বসিয়া আছে। আমি দিদিমাকে বলিলাম, সুষমা আমাকে ভয় দেখাইয়া আসিয়াছে। দিদিমা বলিলেন, কখন? আমি বলিলাম এই মাত্র। তাহাতে দিদিমা অতিমাত্র বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিলেন, ওমা ওতো আধ ঘন্টা আমার কাছে বসিয়া আছে ও তোমায় ভয় দেখায় নাই। দিদিমা যেই ঐ কথা বলিলেন তখনই আমার এত ভয় হইল যে বুকের মধ্যে গুর্ গুর্ করিয়া উঠিল, আমি সেখানে বসিয়া পড়িলাম, সর্ব্বশরীর দিয়া ঘর্ম্ম বাহির হইতে লাগিল। দিদিমা তাঁহার জপের মালা আমার মাথায় দিয়া বলিলেন, রাম নাম কর, ঈশ্বরের নামে কোন ভয় থাকে না। ঈশ্বরের নাম করিতে করিতে মনে বল আসিল। মার কাছে গিয়া ভয় পাবার কথা বলিলে মা বলিলেন, ও কিছুই নয়, সন্ধ্যার সময় একলা ছিলি তাই মনে মনে ভয়ে ঐরূপ দেখিয়াছিস্, আর কখন একলা থাকিস্‌নে। মা আমায় সাহস দিবার জন্য ঐ কথাগুলি বলিলেন। সেই অবধি আমি আর সন্ধ্যা বেলায় মার ও দিদিমার কাছছাড়া হইতাম না।

তখন আমি ও দাদা আর আমাদের দুটি ভাই হইয়াছিল। সেই সময় হইতে মা আমায় গৃহকর্ম্ম শিক্ষা দিতেন। তিনি রান্নাঘরে একটি আসনে আমাকে বসাইয়া রাখিতেন ও যে সকল অন্নব্যঞ্জন রন্ধন করিতেন আমি সেই সকল দেখিয়া দেখিয়া শিখিতাম। পরে মা জিজ্ঞাসা করিয়া আমার পরীক্ষা লইতেন। এইরূপে ছয় মাসে সমস্ত গৃহকর্ম্ম শিক্ষা দিয়া পড়িবার জন্য অবসর দিলেন। একদিন বৈকালে আমাদের সেই এঁড়েদহস্থ বাগানের পণ্ডিত মহাশয় অনেক অনুসন্ধান করিয়া আমাদের বাড়ী আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া আমাদের সকলেরই আনন্দ হইল। তিনি আমাদের পরিবারভুক্ত হইয়া রহিলেন। অন্য যায়গায় গৃহ শিক্ষকতা করিয়া যাহা পাইতেন তাহা পাঠাইয়া দিতেন। ঐ সময় আমি বাংলা ব্যকরণ সীতার বনবাস মেঘনাদবধ কাব্য প্রভৃতি পড়িতাম। ঐ সময় হইতে আমি কাব্য পাঠ করিয়া কিছু কিছু রসবোধ করিবার শক্তি লাভ করিয়াছিলাম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

এই সময় আমি জগতে ঈশ্বরের চক্ষু নামে একটি কবিতা লিখিয়া ভয়ে ভয়ে পণ্ডিত মহাশয়কে দেখাইতে লইয়া যাই। ঐ ভয়টা আমার প্রকৃতিগতই ছিল। পণ্ডিত মহাশয় বড় রহস্যপ্রিয় লোক ছিলেন। আমার কবিতা দেখিয়া আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন, এ যে তোমার গুরুমারা বিদ্যে হয়েছে। বলিয়া হাসিতে হাসিতে বাবা মহাশয়কে আমার কবিতাটি দেখাইয়া বলিলেন, দেখুন গুরুর রচনা শক্তি নাই শিষ্যের হইয়াছে। বাবা মহাশয়ের কাছে উৎসাহ পাইয়া আরো অনেক কবিতা লিখি। তন্মধ্যে কতকগুলি এইখানে উদ্ধৃত করিলাম।

অতি প্রত্যুষে সকলের আগে উঠিয়া স্নান করিতাম; মালিনী পূজার ফুল দিয়া যাইত; আমি চন্দন ঘসিয়া পূজার আয়োজন করিয়া লইয়া পূজায় বসিতাম। তখন আমার হৃদয় ভক্তিতে পূর্ণ হইত। পূজা শেষ হইলে আমি যাইয়া বাবা মহাশয়ের সেবা করিতাম। বাবা মহাশয়ের প্রয়োজনীয় সমস্ত কাজ শেষ হইলে বাবা মহাশয় যখন পাঠে নিযুক্ত হইতেন, তখন আমি যাইয়া মার জলখাবার পান ইত্যাদি দিয়া আসিতাম। মা গৃহকর্ম্মে যাইতেন। আমি আবার বাবা মহাশয়ের সেবায় নিযুক্ত হইতাম। আমার সকল কার্য্য শেষ হইলে দিদিমার কাছে যাইয়া পড়িতাম।

মা ও দিদিমা জয়মঙ্গলবার ও ইথুপূজা প্রভৃতি ব্রত করিতেন, আমিও তাঁহাদের সঙ্গে ঐ সব ব্রত করিতাম।

আমার পিতা সেখান হইতে অন্যত্র যাইবার জন্য অল্প ভাড়ায় একটি বাড়ী খুঁজিতেছিলেন। আহিরিটোলায় একটি দুমহল বাড়ী ৪০ টাকা মাসিক ভাড়ায় স্থির হইল। সেটা ভূতের বাড়ী বলিয়া কেহ ভাড়া না লওয়ায় তাহা "পড়ো" হইয়া পড়িয়াছিল। সেই বাড়ীটা বাবা মহাশয় ভাড়া লইয়া তাহার সংস্কার করিতে বলিয়া দিয়া বাড়ীতে ফিরিয়া মাকে বলিলেন, একটা বড় বাড়ী পাইয়াছি, তাহা ভূতের বাড়ী বলিয়া কেহ ভাড়া নিত না, সেইটেকে আমি সারাইতে বলিয়া দিয়া আসিয়াছি। সেই কথা শুনিয়া আমার মনে মনে বড় ভয় হইতে লাগিল। আমার অভ্যাস নয় যে মুখ ফুটিয়া কাহাকেও কিছু বলি, কাজেই সেই ভাব আমার মনে চাপিয়া রাখিলাম। তারপর আমরা সকলে সেই বাড়ীতে উঠিয়া গেলাম। বাড়ীটা বড়, স্বভাবতই একটু ভয় ভয় করিত তার উপর ভূতের কথা শুনিয়া সর্ব্বদাই আতঙ্কিত থাকিতাম।

আমরা যেদিন সে বাড়ীতে আসিলাম সেই দিন আমাদের বাগানের একটি চাকর আমাদের কাছে চাকরী করিবার জন্য কাঁদিতে লাগিল; বাবা মহাশয় তাহাকে বলিলেন, আমার এখন সে সময় নাই যে তোমাকে মাইনে দিয়ে রাখব, তবে তুমি অন্যত্র চাকরীর চেষ্টা কর যে কদিন না জোটে সে কদিন এখানে থাক, খাও।

বাহিরের ঘরে সে একাকী শয়ন করিত। তাহার কাছে ভূতের কোন কথা বলা হয় নাই, তাই সে একাকী শয়ন করিত। আমাদের এই বাড়ীর একটা বড় ঘরে প্রত্যহ রাত্রে ঢিল পড়িত, সেই ঘরের সার্সিটি ভাঙ্গা ছিল, তাহার ভিতর দিয়া ঢিল ঘরের ভিতর আসিয়া পড়িত। দুই তিন দিন এইরূপ ঢিল পড়ার পর বাবা মহাশয় সেই চাকরকে বলিলেন যে আজ তুই আর আমি ঐ ঘরে শুইব। তখন সেই চাকর কিছুতেই শয়ন করিতে চাহিল না। সে বলিল, ওহি ঘর মে শয়তান হ্যায় ইটা ফেকতা হ্যায় হাম উস্ ঘর মে নেহি সোয়েঙ্গে। বাবা মহাশয় তাহাকে অনেক করিয়া বলিলেন, তোর ভয় কি আমার কাছে থাকবি। তাহাতে সে রাজি হইল। বড় ঘরে, এক প্রান্তে বাবা মহাশয়ের শয্যা প্রস্তুত হইল। বাতি ও দেশলাই রাখিয়া বাবা মহাশয় সেই ঘরে শয়ন করিলেন। রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় দুড়দাড় শব্দে ঘরে ইঁট পড়িতে আরম্ভ হইল। তখন বাবা মহাশয় বাতি জ্বালিয়া এমনভাবে আনিলেন যে বাহির হইতে সে ঘরে যে আলো আছে জানা গেল না।

জানলার কাছে আলো আনিতেই দেখিতে পাইলেন, পাশের বাড়ীর পাইখানার ছাতে দাঁড়াইয়া উলঙ্গ হইয়া একজন ইঁট ফেলিতেছিল; বাবা মহাশয়কে দেখিয়া সে দৌড়িয়া পলাইয়া গেল। তাহার পর দিন অনুসন্ধানে জানা গেল যে বাড়ীর পাশের বাড়ীতে কতকগুলি

পতিতা স্ত্রীলোক থাকে, তাহারাই প্রেতাত্মা সাজিয়া এই বাড়ীতে ভাড়াটিয়া থাকিতে দিত না। সেই দিন বাড়ীওয়ালাকে ডাকাইয়া তাহাদের বিধিমত ভয় দেখানোর পর হইতে আর তাহারা ওরূপ করিত না। কিন্তু তাই বলিয়া সে বাড়ীতে যে ভূত ছিল না তাহা নহে, কারণ ভূত অনুগ্রহ করিয়া একদিন আমাকে দেখা দিয়াছিলেন। একদিন সন্ধ্যার সময় একাকী একটা ঘরে ছিলাম, সে ঘরটা তিনটি কাঠের সিঁড়ি দিয়া উঠিতে হয়; দেখিলাম, আমার ছোট বোনের মত কিম্বা তাহার অপেক্ষা কিছু বড় হইবে এলোচুলে কে হিঃ হিঃ শব্দে হাসিয়া চকিতে পলাইয়া গেল। কাঠের সিঁড়ি দিয়া নামিবার শব্দ শুনিলাম। আমি ভাবিলাম আমার বোন সুষমা বুঝি আমায় ভয় দেখাইয়া গেল, তাই আমি ভীত না হইয়া দিদিমা দিদিমা বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে দিদিমার কাছে গিয়া দেখি দিদিমা আহ্নিক করিতেছেন, সুষমা তাঁহার কাছে বসিয়া আছে। আমি দিদিমাকে বলিলাম, সুষমা আমাকে ভয় দেখাইয়া আসিয়াছে। দিদিমা বলিলেন, কখন? আমি বলিলাম এই মাত্র। তাহাতে দিদিমা অতিমাত্র বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিলেন, ওমা ওতো আধ ঘন্টা আমার কাছে বসিয়া আছে ও তোমায় ভয় দেখায় নাই। দিদিমা যেই ঐ কথা বলিলেন তখনই আমার এত ভয় হইল যে বুকের মধ্যে গুর্ গুর্ করিয়া উঠিল, আমি সেখানে বসিয়া পড়িলাম, সর্ব্বশরীর দিয়া ঘর্ম্ম বাহির হইতে লাগিল। দিদিমা তাঁহার জপের মালা আমার মাথায় দিয়া বলিলেন, রাম নাম কর, ঈশ্বরের নামে কোন ভয় থাকে না। ঈশ্বরের নাম করিতে করিতে মনে বল আসিল। মার কাছে গিয়া ভয় পাবার কথা বলিলে মা বলিলেন, ও কিছুই নয়, সন্ধ্যার সময় একলা ছিলি তাই মনে মনে ভয়ে ঐরূপ দেখিয়াছিস্, আর কখন একলা থাকিস্‌নে। মা আমায় সাহস দিবার জন্য ঐ কথাগুলি বলিলেন। সেই অবধি আমি আর সন্ধ্যা বেলায় মার ও দিদিমার কাছছাড়া হইতাম না।

তখন আমি ও দাদা আর আমাদের দুটি ভাই হইয়াছিল। সেই সময় হইতে মা আমায় গৃহকর্ম্ম শিক্ষা দিতেন। তিনি রান্নাঘরে একটি আসনে আমাকে বসাইয়া রাখিতেন ও যে সকল অন্নব্যঞ্জন রন্ধন করিতেন আমি সেই সকল দেখিয়া দেখিয়া শিখিতাম। পরে মা জিজ্ঞাসা করিয়া আমার পরীক্ষা লইতেন। এইরূপে ছয় মাসে সমস্ত গৃহকর্ম্ম শিক্ষা দিয়া পড়িবার জন্য অবসর দিলেন। একদিন বৈকালে আমাদের সেই এঁড়েদহস্থ বাগানের পণ্ডিত মহাশয় অনেক অনুসন্ধান করিয়া আমাদের বাড়ী আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া আমাদের সকলেরই আনন্দ হইল। তিনি আমাদের পরিবারভুক্ত হইয়া রহিলেন। অন্য যায়গায় গৃহ শিক্ষকতা করিয়া যাহা পাইতেন তাহা পাঠাইয়া দিতেন। ঐ সময় আমি বাংলা ব্যাকরণ সীতার বনবাস মেঘনাদবধ কাব্য প্রভৃতি পড়িতাম। ঐ সময় হইতে আমি কাব্য পাঠ করিয়া কিছু কিছু রসবোধ করিবার শক্তি লাভ করিয়াছিলাম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

এই সময় আমি জগতে ঈশ্বরের চক্ষু নামে একটি কবিতা লিখিয়া ভয়ে ভয়ে পণ্ডিত মহাশয়কে দেখাইতে লইয়া যাই। ঐ ভয়টা আমার প্রকৃতিগতই ছিল। পণ্ডিত মহাশয় বড় রহস্যপ্রিয় লোক ছিলেন। আমার কবিতা দেখিয়া আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন, এ যে তোমার গুরুমারা বিদ্যে হয়েছে। বলিয়া হাসিতে হাসিতে বাবা মহাশয়কে আমার কবিতাটি দেখাইয়া বলিলেন, দেখুন গুরুর রচনা শক্তি নাই শিষ্যের হইয়াছে। বাবা মহাশয়ের কাছে উৎসাহ পাইয়া আরো অনেক কবিতা লিখি। তন্মধ্যে কতকগুলি এইখানে উদ্ধৃত করিলাম।

জগতে ঈশ্বরের চক্ষু

হে মানব পাপ করি কোথা লুকাইবে ?
জগতে তাঁহার চক্ষু দেখনা ভাবিয়ে!
অন্ধকার গিরিগুহা খনির ভিতর
যেখানে যাইবে তুমি সেখানে ঈশ্বর।
পাপ করি মনে মনে রাখ লুকাইয়া
মনেতে আছেন তিনি লবেন জানিয়া।
অনিল আনিয়া গন্ধ
করিছে অকুল।
জলেতে ফুটিয়া আছে
কুমদিনী বালা
পবন তাহার সহ
করিতেছে খেলা
হেরিয়া নিশীথ শোভা
মুগ্ধ প্রাণমন,
শান্ত শিব রূপে তুমি
দিলে দরশন।

ফুল।

তুইলো কাননবালা
কুসুম সুন্দরী,
ফুটে থাক যবে তুমি
বন আলো করি,
হেরে তোর বিমোহিনী
রূপ মনোহর,
কত যে আনন্দ হয়
হৃদয়ে আমার।
কোমলতা পবিত্রতা
একাধারে পাব কোথা
তোর মত এমন সুন্দর।
বঙ্গ বালা কম-করে
দেবতা পূজার তরে
তোমারে চয়ন করে
হরিষ অন্তর প্রজাপতি
মনসুখে ঘুমায়
তোমার বুকে , মধু

দিয়া তুমি তারে
করলো আদর।
বর বধূ দুইজনে বাঁধে
যবে প্রেমের বাঁধনে
সেখানেও আছ তুমি
কুসুমের হার।

ঐ সময়ে আমি আমার পিতার কাছে কাব্য সম্বন্ধে আমার স্বাধীন মত ব্যক্ত করিতাম।এক এক দিন সন্ধ্যাবেলায় বাবা মহাশয় কাব্য আলোচনা করিতেন। আমিও তাঁহাদের কাছে থকিয়া সেই আনন্দের ভাগী হইতাম। মা ও দিদিমারা অনন্ত প্রভৃতি ব্রত করিতেন আমাদের কুল-পুরোহিত ব্রত কথা সংস্কৃতে বলিতেন। আমি তাহা মা ও দিদিমাকে বাংলাতে বুঝাইয়া দিতাম। আমি সংস্কৃত না পড়িয়া বুঝিতে পারিতাম । আমাদের পুরোহিত এই দেখিয়া আমায় অত্যন্ত স্নেহ করিতেন ও মাকে বলিতেন যে তোমাদের এ মেয়ে শাপ ভ্রষ্টা।

একদিন সকাল বেলায় মা ও বাবামহাশয় আমার বিবাহের কথা বলিতেছিলেন শুনিয়া আমার মনে ভয়ানক কষ্ট হইল ও কান্না আসিল। আমি একাকী বাহিরের ঘরে যাইয়া নির্জ্জনে কাঁদিতেছিলাম এবং ভাবিতেছিলাম যে মা আমাকে বাড়ী হইতে বিদায় করিবার জন্য এত ব্যস্ত কেন? কিয়ৎক্ষণ পরে আমি চোখ মুছিয়া ফিরিয়া দেখিলাম, একজন অল্প বয়সের সুন্দর চেহারার লোক আমার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার পরণে কালাপেড়ে ধবধবে ধুতি ও গায়ে পরিষ্কার পাঞ্জাবি ও উড়ানি। পায়ে কালো বার্ণিস করা জুতা, মাথার চুল কোঁকড়ান সিঁথিকাটা। আমি ফিরিলেই সে হাসিয়া বলিল, তুমি যে জন্য কাঁদিতেছ আমি সেই জন্য আসিয়াছি। আমি তোমার বিবাহের সম্বন্ধ করিতে আসিয়াছি, বলিয়া মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল। আমি হঠাৎ একটা লোককে দেখিয়া ভয় পাইয়া বলিলাম, আপনি সরুন, আমি বাবা মহাশয়কে ডেকে দিচ্ছি। তাহাতে সে আমাকে কিছু না বলিয়া সেইখানে সেইভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। আমি তখন তাহাকে পুনরায় মিনতি করিয়া বলিলাম আপনি সরুন, আমি গিয়া বাবা মহাশয়কে ডাকিয়া দিই। তখন সে দুইহাত প্রসারিত করিয়া আমার পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল। তখন আমি মনে মনে ভাবিলাম যে এখান হইতেই চিৎকার করি। মুখে কিছু বলি নাই যেই এই কথা ভাবিয়াছি অমনি সে হাত সরাইয়া আমাকে যাইতে বলিল। তখন আমি সংকোচের সহিত আমার কাপড় সামলাইয়া বাড়ীর ভিতর ছুটিয়া গিয়া বাবা মহাশয়কে তাড়াতাড়ি বলিলাম বাহিরে কে একজন লোক আসিয়াছে আপনি যাইয়া দেখুন। বাবা মহাশয় এই কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ বাহিরে আসিলেন, আসিয়া কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া বরাবর সিঁড়ি দিয়া রাস্তার মোড় অবধি দেখিয়া আসিলেন। কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। বাহির হইতে কেহ আসিয়া এত শীঘ্র চলিয়া যাইতে পারে না, আর যদি বা বাহির হইতে কেহ আসিত; তবে সে আমার মনের কথা কিরূপে জানিতে পারিবে? ইহা অলৌকিক ঘটনা ভিন্ন আর কিছুই নহে, মা ও বাবামহাশয় এই সিদ্ধান্ত করিলেন।

আর একটি হাস্যকর ঘটনা। একদিন আমাদের বাড়ীতে বৈকালে অপরিচিতা তিনটি স্ত্রীলোক আসিলেন। আমরা তাহাদের অভ্যর্থনা করিয়া বাড়ীর ভিতর লইয়া আসিয়া বসাইলাম। তাঁহারা কিছুতেই আপনাদের পরিচয় দিলেন না তবে তাঁহাদের মধ্যে একজন বলিলেন, এইটি

আমার মাসী ও দ্বিতীয়টি আমার পুত্রবধূ। তখন আমরা সেই ভূতের বাড়ী ছাড়িয়া চোর বাগানে একটি বাড়ীতে বাস করিতাম। নবাগতা রমণীগণ যদিও তাঁহাদের নিজের পরিচয় দিলেন না কিন্তু তাঁহাদের কথা-বার্ত্তায় বোঝা গেল যে তাঁহারা আমাদের সকলকেই চেনেন। নানা প্রকার গল্প সল্প ও কথাবার্ত্তার পর আমাদের সেদিন কি রান্না হইয়াছিল সেই বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। রান্নার কথা বলিবার সময় মা বলিয়াছিলেন যে ইঁচোড়ের দালনা হইয়াছে। মার মুখ হইতে ইঁচোড় কথাটি বাহির হইবা মাত্র ই-ই-চোড় আবার কি বলিয়া হি হি করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। মা ও অপ্রস্তুত হইয়া চুপ করিয়া রহিলেন। মাকে তদবস্থায় দেখিয়া আমার মনে আঘাৎ লাগিল। আমি তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনারা কি বলেন? তাহাতে তিনি তৎক্ষণাৎ বলিলেন আমরা বলি এঁচোড়! আমিও তাঁহারই মতন সুরে বলিলাম এ্যাঁ-এ্যাঁ-চোড় আবার কি? — বলিয়া না হাসিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। তিনিও কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আবার কথাবার্তা আরম্ভ করিলেন। পরে তাহারা বিদায় লইয়া গাড়ীতে উঠিয়া তবে নিজেদের পরিচয় দিলেন তখন আমরা বুঝতে পারিলাম যে, তাঁহারা বাবা মহাশয়ের এক বন্ধুর পরিবারের লোক।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

এখন হইতেই আমার বিবাহের চেষ্টা চলিতে লাগিল। মা ইহাকে উহাকে বলিয়া যত সম্বন্ধে আনিতেন বাবা মহাশয় নানা ওজর আপত্তি তুলিয়া তাহাদের ফিরাইয়া দিতেন। এই রকম করিয়া তের বৎসর কাটিয়া গেল। ঐ সময়ের মধ্যে আমি রামায়ণ, মহাভারত, সুশীলার উপাখ্যান প্রভৃতি ভাল ভাল বই অনেক পড়িয়াছিলাম। ঋজুপাঠ নামে সংস্কৃত বইখানিও পড়িয়াছিলাম।

একদিন আমার পিসতুত ভগিনী আসিয়া মাকে বলিলেন যে এবার আমি একটি ভাল পাত্রে সন্ধান পাইয়াছি। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রিয় শিষ্য, তিনি তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন, চরিত্র খুব ভাল ও কবি। এমন আর পাওয়া যাইবে না। এবার আর যেন মামা মহাশয় অমত না করেন। তুমি বলিয়া কহিয়া মত করিও। এই কথা বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। পরে বাবা মহাশয় বাড়ীতে আসিলে মা তাঁহাকে দিদি যাহা বলিয়াছিলেন সেই কথা বলিলেন। বাবা মহাশয় সমস্ত শুনিয়া চুপ করিয়া রহিলেন! তাহা দেখিয়া মা বলিলেন, তুমি যে চুপ করিয়া রহিলে? কত পাত্র এল কাহাকেও মনে ধরিল না, তবে তুমি কি মনে করিয়াছ মেয়ের বিবাহ দিবেনা? বাবা মহাশয় বলিলেন, আমি ত সব শুনিলাম তার পর ভাবিয়া দেখি, যাহা হয় করিব। তাহার পর দিন দিদি আসিয়া খবর দিলেন যে সে পাত্রটি মাঘোৎসব করিতে চুঁচুড়া হইতে জোড়াসাঁকোয় আসিয়াছে ইহা শুনিয়া মা বাবামহাশয়কে সেই দিনই জোড়াসাঁকো যাইয়া পাত্র দেখিয়া আসিলেন এবং তাহার পরদিন পাত্রটি আমাকে দেখিতে আসিবেন এইরূপ কথা ছিল কিন্তু সেদিন কোন সঙ্গী না পাওয়ায় একাকী আসিতে পারিলেন না। তাহার পরদিন বৈকালে আমার পিসেমহাশয়ের সঙ্গে আসিবেন বলিয়া একখানি চিঠি লিখিলেন — এই চিঠি পাইয়া অবধি ভয় ও লজ্জায় আমার বুকের ভিতর ধড়ধড় করিতে লাগিল ও আমি কি করে সম্মুখে বাহির হইব এই ভাবনাই বার বার মনে হইতে লাগিল। সেদিন বৈকালে খুব ঝড় হইয়াছিল। বাহিরেও ঝটিকা আর আমার হৃদয়ের মধ্যেও ভাবনার ঝটিকা বহিতেছিল। যাহা

হউক কিছুক্ষণ পরে ঝড় থামিলে মেঘও কাটিল তখন তিনি আমার পিসেমহাশয়কে সঙ্গে লইয়া আমাদের বাড়ী আসিলেন।

আমি ভাবিতেছিলাম যে আমার এই দর্শনরূপ বিপদ হইতে উদ্ধার হইতে পারিলেই বাঁচি। পরে তিনি উপরে আসিলেন, দিদিমা আমাকে লইয়া সেইখানে গেলেন, তিনি আমাকে দু একটি পদ্য ও গদ্য পড়িতে দিলেন, এবং আর দু একটি প্রশ্ন করিবার পর আমি অব্যহতি পাইলাম। তিনি জলযোগ করিতে বসিলেন সেখানেও দিদিমা আমাকে ডাকিয়া বসাইলেন — কি দায়! তিনি জলযোগের পর নিচে যাইয়া বাবা মহাশয়কে বলিলেন যে আমি মহর্ষির কাছে যাইয়া পরে আসিয়া দিন স্থির করিব। এই বলিয়া ১১ই মাঘ সারিয়া চুঁচুড়ায় ফিরিয়া গেলেন, তাহার পরে আসিয়া ৯ই ফাল্গুন দিন স্থির করিয়া জোড়াসাঁকোস্থ সকলকে এবং বাবামহাশয় ও দাদাকে নিমন্ত্রণ করিয়া পুনরায় চুঁচুড়ায় চলিয়া গেলেন। মহর্ষি সমারোহ করিয়া তাঁহার দীক্ষা দিলেন, এই দীক্ষার দিনে মহর্ষি তাঁহাকে যে উপদেশ দেন তাহা অনুষ্ঠান পদ্ধতিতে ছাপা রহিয়াছে। দীক্ষা হইয়া যাইবার পর তিনি একবার দেশে যান পরে দেশ হইতে কলিকাতায় আসেন। আমার বিবাহের আয়োজন হইতে লাগিল, চিন্তার তরঙ্গের পর তরঙ্গ আসিয়া আমার হৃদয়ে আঘাৎ করিতে লাগিল, মনে হইতে লাগিল যে আমার মতন একটা অপদার্থকে কিভাবে গ্রহণ করিবেন। আমি এক স্বতন্ত্র প্রকৃতির লোক, খেতে ভুলে যাই, কাজ কর্ম করিতে ভুলে যাই, যদি কেহ আমাকে বলে কাঁদিস্ না আমি অমনি কাঁদিয়া ফেলি, কাহারও কষ্টের কথা শুনিলে কাঁদিয়া আকুল হই, আকুল ক্রন্দনেও হৃদয়ে শান্তি আসিত না। কেহ জোরে কথা কহিলে আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হইত — এই সব দেখেশুনে মা আমায় বলিতেন তোর দুঃখে শেয়াল কুকুর কাঁদিবে — সেই কথা মনে হইয়া আমার ভাবনা হইতেছিল।

একটি বড় বাড়ীতে বিবাহের জন্য বাবামহাশয় আমাদের লইয়া যান। বিবাহের দিন সকাল বেলায় গাত্র হরিদ্রা হইবার পর তিনি আমাকে একখানি পুস্তক উপহার দিয়া বহির্ব্বাটিতে চলিয়া গেলেন। উৎসব আনন্দে আত্মীয় স্বজনে বাড়ী পূর্ণ — আমি একাকী নির্জ্জনে বসিয়া চিন্তায় মগ্ন ছিলাম, ভাবিতেছিলাম যে এই উৎসব আনন্দের মধ্যে আমার হৃদয় কেন বিষাদে পূর্ণ, সকলেরই ত বিবাহ হয়, সকলকেই ত পিতা মাতাকে ছাড়িয়া যাইতে হয়, তবে আমার হৃদয় কেন বিষাদে পূর্ণ? এইরূপ কিছুক্ষণ চিন্তা করিবার পর যেমন উঠিলাম অমনি মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া দেওয়ালে মাথায় আঘাৎ পাইলাম। পরে মার কাছে যাইয়া দেখিলাম যে মা ও আমার ভগিরা সকলে মোনা মুনি ভাসাইতে ব্যস্ত। মোনা মুনি এক প্রকার ক্ষুদ্র ফল, ফল দুটি জলে ভাসাইয়া নব দম্পতির ভবিষ্যৎ জীবনের সুখ-দুঃখের সম্ভাবনা জানিবার চেষ্টা করা হয়, ফল দুটি জলে ভাসিয়া একত্রিত হইলে শুভ ও তাহার বিপরীত অশুভ। মা ও ভগিরা জলে মোনা মুনি ভাসাইয়া সতৃষ্ণ নয়নে দেখিতেছিলেন যে জোড়া লাগে কিনা, মোনা মুনি জোড়া লাগিল। তখন সকলে হাইআমলা প্রভৃতি অন্যান্য অনুষ্ঠানে মনোনিবেশ করিলেন। এতক্ষণ আমাকে ছাড়িয়া অন্যান্য অনুষ্ঠান হইতেছিল সন্ধ্যা হয় হয় এমন সময় মা আমাকে ডাকিলেন, এইবার আমার পালা আরম্ভ হইল। কনে সাজান নাওয়ান ইত্যাদি শেষ করিয়া আমাকে সকলে মিলিয়া ঘিরিয়া বসিলেন ও নানাপ্রকার রহস্যালাপ চলিতে লাগিল। মা আমাকে পূর্ব্ব হইতে বিশেষ করিয়া সতর্ক করিয়া দিলেন যে শুভ কর্মে আমি যেন চোখের জল না ফেলি, কারণ মা জানিতেন যে চোখের জল আমার কাছে বড় সুলভ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

এমন সময় বর আসিতেছে, বর আসিতেছে বলিয়া একটা গোলযোগ উঠিল, যাহারা আমার কাছে বসিয়াছিল তাহারা সকলে বর দেখিতে চলিয়া গেল ও বর দেখিয়া ফিরিবার সময় বলিতে বলিতে আসিতেছিল বর বড় অন্ধকার, কারণ তাহারা মনে করিয়াছিল যে, আলোকমালায় সজ্জিত নানাবিধ বাজনা বাদ্য সহযোগে বর দেখিতে পাইবে, তাহার বিপরীত দেখিয়া তাহারা নিরুৎসাহে বলিতেছিল বর বড় অন্ধকার।

পরে স্ত্রী-আচার শুভদৃষ্টি মাল্যবিনিময় আদি যথা নিয়মে সম্পন্ন হইল। এইবার সম্প্রদান হইবে। তখন আমার হৃদয় স্পন্দিত হইতে লাগিল, পা আর চলে না, আমার এক ভগিনীপতি আমার হাত ধরিয়া লইয়া গেলেন। আমরা যথা নিয়মে আসন গ্রহণ করিবার পর সম্প্রদান আরম্ভ হইল, আমার শীতল ও লজ্জাকম্পিত হস্ত উঁহার হাতে স্থাপন করাতে আমার প্রাণে একটা নির্ভরের ভাব আসিল। পরে সম্প্রদান শেষ হইলে আমরা উভয়ে উপরের একটি সজ্জিত কক্ষে বসিলাম। আমার ভগিনীরা উঁহার চারিদিকে ঘিরিয়া বসিলেন। নানাপ্রকার রহস্যাদি হইবার পর আমরা নিদ্রিত হইলাম। পরদিন প্রাতে উদীচ্য ক্রিয়াদি করিয়া তৎপরদিন চুঁচুড়ায় চলিয়া গেলেন ও তাহার ৫।৭দিন পরে আমাকে লইয়া যাইবার জন্য আসিলেন। বাবা মহাশয় কাপড় বাক্স ইত্যাদি আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া আনিলেন, মা বাক্সেতে এটা সেটা দিয়া সাজাইতেছেন ও এক একবার আমার দিকে স্নেহ-বিগলিত নয়নে চাহিতেছেন। আমার সে সব দিকে লক্ষ্য নাই, কেবল ভাবিতেছি কি করিয়া সকলকে ছাড়িয়া থাকিব।

দিন সুখেরই হউক আর দুঃখেরই হউক দিন কাহারও মুখাপেক্ষা করে না! সেদিন গেল, প্রভাত হইল, আমার ভগিনী ছলছল নেত্রে আমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, আমি নীরবে বক্ষে ধরিলাম। ঝর্‌ঝর্ করিয়া চোখে জল পড়িতে লাগিল কিছুক্ষণ পরে প্রকৃতস্থ হইয়া সুষমাকে বলিলাম — ভাই, বাবামহাশয়ের সেবা করো ও মায়ের সাহায্য করিও আমার অভাব যেন ওঁরা না বোধ করেন। স্ত্রীলোক যাহার জন্য সৃষ্ট, যেখানে তাহার গতি, আমি সেইখানে চলিলাম; এতদিন এখানে আমার যাহা কর্ত্তব্য ছিল আজ তাহা শেষ হইল, আশীর্ব্বাদ করি তুমি সুখী হও।

আহারাদি করিয়া বেলা দুইটার ট্রেণে আমাদের যাইতে হইবে, পণ্ডিতমহাশয় আমাদের পৌঁছাইতে যাইবেন। কিছুক্ষণ পরে আমরা যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম, প্রণাম ও আশীর্ব্বাদের পর চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে গাড়ীতে যাইয়া বসিলাম। গাড়ী জনাকীর্ণ হাবড়া ষ্টেশনে আসিয়া থামিল, আমি ইতিপূর্ব্বে কখন রেলে চড়ি নাই বা ষ্টেশনেও আসি নাই সুতরাং ভিড় দেখিয়া আমার বড় লজ্জা করিতেছিল। কিছুক্ষণ পরে রেল আসিতে আমরা তাহাতে উঠিলাম ও চুঁচুড়ার ষ্টেশনে আমরা নামিলাম। সেখানে ঘোড়ারগাড়ী লইয়া মহর্ষির সরকার অপেক্ষা করিতেছিল আমরা সেই গাড়ীতে আরোহণ করিয়া মহর্ষির বাড়ীর ফটকে গাড়ী হইতে অবতরণ করিলাম, নিস্তব্ধ বাড়ী আমাকে নীরবে বরণ করিয়া লইল।

উনি আসিয়া চারি টাকা আমার হাতে দিয়া পণ্ডিত মহাশয়কে প্রণাম করিতে বলিলেন, পণ্ডিত মহাশয় সেই চারি টাকা পাইয়া গঙ্গা পার হইয়া বাড়ী গেলেন।

পরদিন সকালবেলায় কর্তাদাদামহাশয় বেড়াইয়া আসিয়া আমাদিগকে ডাকিলেন আমরা

প্রণাম করিলে আশীর্ব্বাদ করিয়া পূর্ব্বে রক্ষিত পাশাপাশি দুইখানি চৌকিতে বসিতে অনুমতি করিলেন। আমরা বসিবার পর সস্নেহে আমাদের সহিত কথা কহিতে লাগিলেন। তাঁহার শান্ত উজ্জ্বল মূর্ত্তি দেখিয়া আমার হৃদয় ভক্তিবিগলিত হইয়া তাঁহার চরণ স্পর্শ করিল! তাঁহাকে আমি একবার খুব ছোটবেলায় দেখিয়াছিলাম আর এই দেখিলাম। সেই দিন থেকে তিনি আমাকে দেবী বলিয়া সম্বোধন করিতেন ও আমাকে বলিয়া দিলেন — প্রতি বুধবার সন্ধ্যার সময় আমার কাছে আসিবে আমি তোমাকে ধর্ম উপদেশ দিব ও কথাবার্তা কহিব।

সেই হইতে এক বুধবার আমাকে মন্ত্র দেন। আমি একদিন তাঁহাকে পুনর্জন্ম সম্বন্ধে প্রশ্ন করি তাহাতে তিনি এই কথা বলেন যে মনুষ্য মরিয়াই যে ইহলোকে আসিতে হইবে একথা আমার মনে হয় না, অনন্ত লোকালোকান্তর মধ্যে যে কোন লোকে হউক জন্ম লইবে।

আমি যখন চুঁচুড়ায় ছিলাম তখন আমার কাছে একজন দাসী ছিল, তাহার বর্ধমানে বাড়ী, তাহার নিকট অনেক ছড়া শিখিয়াছিলাম তাহার মধ্যে দু-একটি এইখানে লিখিলাম। তাহাদের দেশে ভাঁজু ও ভাদু বলিয়া দুই রকম পূজা হয় একটা নিশীথে ও একটা দিনে। ভাঁজুটা নিশীথের পূজা সেই ভাঁজুর ছড়া এইখানে উদ্ধৃত করিলাম। ভাঁজু পূজায় পুরুষেরা কেউ যেতে পারে না, মেয়েরা নাচে ও গান করে। তবে পুরুষেরা যে লুক্কাইত ভাবে সেই উৎসবে যোগ না দেয় তা নয়, তবে প্রকাশ্যে যোগ দিতে পারে না, কারণ সেটা মেয়েদের উৎসব।

ভাঁজুর ছড়া

এক কলসি গঙ্গাজল
এক কলসি ঘি।
বৎসর অন্তর আসেন ভাঁজু,
নাচব না ত কি।। ১
ভাঁজু লো কলকলানি,
মাটির লো সরা।
ভাঁজুর গলায় দেব আমি
পঞ্চ ফুলের মালা।। ২
পূর্ণিমার চাঁদ দেখে
তেঁতুল হল বঙ্ক।
গড়ের গুগলি বলে
আমি হব শঙ্খ।।
ওগো ভাঁজু
কি করতে পারো।
আইবুড়ো ছেলের
বিয়ে দিতে নারো।। ৩

তার পরদিন সকালে ভাঁজুর বিসর্জ্জন হয় তার ছড়া—

এই পথে যেও ভাঁজু,
এই পথে যেও।

বেনা গাছে কড়ি আছে,
দুধ কিনে খেও।। ১
ঐ পথে যেও ভাঁজু,
ঐ পথে যেও।
বেনা গাছে কড়ি আছে
সন্দেশ কিনে খেও।। ২
ইত্যাদি—ইত্যাদি—ইত্যাদি।।

এই গেল ভাঁজুর ছড়া। আর ভাদুর ভাদ্র মাসের সংক্রান্তির দিন, কি অন্য কোন দিন, পূজা হয় তাহা ঠিক আমার মনে নাই, তবে তাহাদের মধ্যে দুই দলে ছড়া কাটাকাটি হয় তাহার দুই একটি নমুনা দিলাম —

আমার ভাদু নেয়ে এল,
পরতে দেব কি?
ঘরে আছে পাটের শাড়ি,
বার করে দি।
ওদের ভাদু নেয়ে এল,
পরতে দেব কি?
ঘরে আছে ছেঁড়া কানি,
বার করে দি।। ১

অপর পক্ষের লোক গাহিল —

আমার ভাদু নেয়ে এল,
খেতে দেব কি?
ঘরে আছে খাসা মণ্ডা,
বার করে দি।।
ওদের ভাদু নেয়ে এল,
খেতে দেব কি?
ঘরে আছে পচা মণ্ডা,
বার করে দি।।২

আর ভাদুর দু-একটা গানও লিখিলাম বোধ হয় পাঠকের নিতান্ত অপ্রীতিকর হইবে না -

গীত

নীচে কোটা উপর কোটা,
মধ্যে কোটা ইঁদারা।
আমার ভাদু দালান দিচ্ছে,
সুরকী কুটতে যাস তোরা।।
সুরকী কোটা যেমন তেমন,
ইটে কোটা ভার হল।

কেমন করে ঘর যাব ভাদু,
মেঘ নেমে আঁধার করে এল।।১
চালে ধরে চালকুমড়ো,
ভুয়ে ধরে কদু।
হাট-তলা দিয়ে ডাক ডাকছে,
সেই পরাণের বঁধু।।২
ঠাকুরবাড়ির কাল তুলসী,
পাতা ঝরঝর করে।
ঠাকুর গেছেন পরবাস,
মনটি কেমন করে।।
কেষ্ট গেছেন বিষ্ণুপুর,
না বলা করিয়ে।
আদেক রাতে এলেন,
কেষ্ট পাঁচুনি হারায়ে।।
সে কেষ্ট ফেরেন বনে বনে।
রক্তকুশেরী কাঁটা ফুটিল চরণে।।
হাতে কম্বল তেলের বাটি,
কানে কদম ফুল।
আমার কেষ্ট নাইতে যাবেন,
কালিদহের কূল।। ৩

ভাঁজু ও ভাদু পূজাতে বর্ধমানের গ্রাম্য স্ত্রীলোকেরা এই সব ছড়া গান করে।

এইরূপ করিয়া একমাস কাটিয়া যাবার পর উনি আমাকে আমার পিত্রালয়ে লইয়া আসেন। আমি আসিবার দিন কর্তাদাদামহাশয়কে প্রণাম করিয়া বিদায় লইলাম তিনি আমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন — যাও, আবার শীঘ্র আনিব। উনি আমায় কলিকাতায় আমাদের বাড়ীতে রাখিয়া ১লা বৈশাখ নববর্ষের উপাসনা শেষ করিয়া চুঁচুড়ায় লইয়া গেলেন। এবার আমাকে আর একটা স্বতন্ত্র বাড়ীতে লইয়া গেলেন। আমরা যে বাড়ীতে ছিলাম তাহা তখন সংস্কার হইতেছিল, বাড়ীর বাগানটি নানা জাতীয় ফুল ফলে সুশোভিত ছিল, উদ্যানে নানাজাতীয় ফুল ফুটিয়া বাগানটি আলো করিয়া থাকিত, আমি দিনের বেলায় ফুল তুলিয়া এগাছের ওগাছের ধারে ধারে ঘুরিতাম, ক্লান্ত হইলে গাছের ছায়ার বসিতাম, ও বৈকাল হইলে গাছের ছায়ার বসিতাম, ও বৈকাল হইলে ফুলময় সাজে সাজিতাম, উনি আবার সেই ফুল সাজা দেখে আমাকে বনদেবী বলিতেন। সেখানে একমাস বড় সুখেই কাটিয়াছিল কারণ সেখানে আমার ভালবাসার দুইটি জিনিষ পাইয়াছিলাম — গঙ্গা ও ফুল। একমাস পরে আমরা পুনরায় মাধব দত্তের বাড়ীতে ফিরিয়া যাইলাম এবং সেখান হইতে শ্বশুরবাড়ী ১লা শ্রাবণ রওনা হইলাম। যাবার দিন অতি প্রত্যুষে কর্তাদাদামহাশয়কে প্রণাম করিতে যাইয়া দেখি একখানি ইজিচেয়ারে আবক্ষ বস্ত্রের দ্বারা আবৃত করিয়া সূর্য্যের উদয় দেখিতেছিলেন, আমরা প্রণাম করায় সময়োচিত দুই একটি উপদেশ দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় দিলেন। আমরা গঙ্গা পার হইয়া নৈহাটিতে

ট্রেণে উঠিলাম। হৃদয়পুরে আমার শ্বশুরবাড়ী যাইতে হইলে রামনগর ষ্টেশনে নামিতে হয়, সেখান হইতে পাল্কি বা গরুর গাড়ীতে যেতে হয়। বেলা দুই প্রহরের সময় আমাদের ট্রেন রামনগর ষ্টেশনে পৌঁছিলে আমরা দেখি যে দুইখানি পাল্কি আমাদের জন্য পূর্ব্ব হইতে অপেক্ষা করিতেছে। আমরা দুইজনে দুইখানি পাল্কিতে উঠিলাম এবং দাসীকে ও জিনিষপত্রগুলিকে একখানি গরুর গাড়ীতে চড়াইয়া দিয়া যাত্রা করিলাম। দুইখানি পাল্কি পাশাপাশি চলিল তখন মধ্যাহ্নকাল প্রখর সূর্য্যকিরণে নিস্তব্ধ প্রান্তরে কাকের কা কা শব্দ ভিন্ন আর কিছুই শ্রুতিগোচর হইতে ছিল না। এইরূপে আমরা মাঠের পর মাঠ, গ্রামের পর গ্রাম, পার হইয়া চলিলাম। একটি গ্রামের কাছে যখন পাল্কি যাইতেছিল রৌদ্রাভাস্ত কতকগুলি গ্রাম্য বালক রৌদ্রে দৌড়াদৌড়ি করিতেছিল, বাহকদের শব্দে — ঐ বর কনে আসিতেছে - বলিয়া ছুটিয়া আসিল, আমার আপাদমস্তক দেখিল, ও আমার পরণের লাল কাপড় দেখিয়া বলিল — এই কনে যাইতেছে, আর একজন আমার পায়ে জুতা দেখিয়া বলিল - ওরে কনে নয়রে, দেখছিস্‌না পায়ে জুতা আছে, ও বর! তাহাদের বিচার শক্তি দেখিয়া আমি মনে মনে হাসিলাম। কিছুদূর যাইতে না যাইতে ঘুঘুর করুণস্বরে প্রাণ করুণরসে পূর্ণ হইয়া গেল, বাহকদিগের প্রতি চাহিয়া দেখি দারুণ গ্রীষ্মে তাহারা গলদ্‌ঘর্ম হইয়াছে, তাহাদের দেখিয়া বড় কষ্ট হইল, ভাবিলাম — দয়াময়, তোমার রাজ্যে মানুষ কষ্ট পায় কেন? আমি দিব্য পাল্কিতে আরামে যাইতেছি, আর বেচারারা পেটের দায়ে এত ক্লেশ ভোগ করিতেছে; কেহ যদি ইহাদিগকে অমনি টাকা দিত তাহা হইলে ইহাদের আর তে ক্লেশ ভোগ করিতে হইত না। আমি আমার পাল্কির দরজা বন্ধ করিয়া দিলাম ও নিজেও তাহাদের ক্লেশের ভাগী হইবার জন্য চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম।

অনেকক্ষণ পরে একটা গ্রামে বড় গাছের ছায়ায় তাহারা বিশ্রামের জন্য পাল্কি নামাইল, উনি আমার পাল্কির দ্বার বন্ধ দেখিয়া খুলিয়া দিলেন ও আমাকে ঘর্মাক্ত কলেবর দেখিয়া ভাবিলেন আমি ভয় পাইয়া থাকিব; বলিলেন — ভয় কি এখানে নাব, এস আমরা প্রকৃতির শোভা দেখি। তখন রৌদ্রের তেজ কমিয়াছে ও মৃদু মন্দ উষ্ণ সমীরণ বহিতেছে, বৃক্ষ অন্তরালে একটি বউ কথা কও পাখী বসিয়া ডাকিতেছে। আমি পাল্কি হইতে নামিয়া দেখিলাম দূরে নীলের ক্ষেত্রসকল নীল সতেজ গাছে পূর্ণ, আমরা সেই নীলের ক্ষেত্রে কিছু পদচারণা করিয়া পুনরায় পাল্কিতে উঠিলাম। বাহকেরা আমাদের লইয়া চলিল, আমরা গ্রাম্য শোভা দেখিতে দেখিতে চলিলাম।

ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল, তখন অন্ধকারের মধ্য দিয়াই আমরা চলিলাম। এই অন্ধকারে অচেনা পথে অপরিচিত স্থানে যাইতে কে জানে কেন আমার মহাযাত্রার কথা স্মরণ হইল সঙ্গে সঙ্গে একটি দীর্ঘ নিশ্বাসও পড়িল ও সেই অন্ধকারের মধ্যে আমাদের প্রিয়তমের সুন্দর হস্ত দেখিতে পাইলাম। সেই হস্ত ধারণ করিয়া আমরা জীবনের পথে ও মরণের পরপারে চলিয়া যাইব মনে করিয়া আমার হৃদয়ে শান্তি ও নির্ভর আসিল। তখন আমি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া আমাদের প্রাণের প্রাণকে ভাবিতে ভাবিতে চলিলাম। কতক্ষণ এই অবস্থায় ছিলাম জানি না — চাহিয়া দেখি পাল্কি আমার শ্বশুর গৃহের দ্বারে আসিয়া প্রবেশ করিল ও বাহকগণ পাল্কি নামাইল।

আমার ভাশুরঝি ও মাসশাশুড়ি আসিয়া আমাকে বাড়ির মধ্যে লইয়া গেলেন। ১৫ দিন আমি সেখানে ছিলাম। আমার সমবয়সি ভাশুরঝির সহিত আমার বড় ভাব হইয়াছিল সে বড়

ভাল মেয়ে, বড় সরলা ছিল, সে আর ইহলোকে নাই আমাকে পাইয়া তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়খানি আমার কাছে উন্মুক্ত করিয়াছিল তাহার সাহচর্য্যে আমার হৃদয় বিশেষ আনন্দ পাইয়াছিল। সেই জন্য তাহার দুই একটি কথা আমার বাল্যজীবনের স্মৃতির সহিত আজও জড়িত আছে।

ফিরিয়া চুঁচুড়ায় আসিয়া আবার মার কাছে আসিলাম — কে জানিত এই আমার শেষ মার কাছে যাওয়া। সেই অতীত কালের স্মৃতি আজও যেন আমার প্রত্যক্ষ বোধ হইতেছে। ভবিষ্যৎ তুমি যদি বর্তমানে পরিণত না হইতে, তবে অতীতে স্মৃতির মর্মপীড়া আমাকে ভোগ করিতে হইত না। স্মৃতির তীব্র বেদনায় যখন প্রাণে জ্বালা আসে তখন বিস্মৃতির সলিলে তাহা নিবারণ করিতে ইচ্ছা হয় না বিস্মৃতির অতল সলিলে ডোবা, এবং স্মৃতির মর্ম জ্বালা সহ্য করা এই দুয়ের মধ্যবর্তী পথ আর নাই; এই দুয়ের অতীত পথ আছে, তাহা ভগবান। মার কাছে ভাদ্র মাসে আসিয়াছিলাম অগ্রহায়ণ মাসে উনি মহর্ষির সহিত ভ্রমণে বাহির হইলেন। উনি যখন বাহির হন তখন আমার জ্বরবিকার হইয়াছিল। ভ্রমণে যাইবার পূর্ব্বে আমার সঙ্গে দেখা করিয়াছিলেন ও রওনা হইবার দিন আমাকে একখানি পত্র দিয়া গিয়াছিলেন, তখন আমার জীবন মরণের অভিনয় হইতেছিল, চিঠির একবর্ণ ও পড়িতে পারি নাই। পরে আমার স্বামী বম্বে গিয়া তার করিয়া আমার সংবাদ লন, একমাস কি দেড়মাস পরে তবে আমি আরোগ্য লাভ করি। জীবনের যে অংশ সুখে কাটিয়াছে তাহা বাল্যকালের পরবর্তী শোকের প্রবল আঘাতে ভগ্ন হইয়া গিয়াছে, ও সেই ভগ্নতরী এখনও ধীরে ধীরে চলিতেছে, করে কুল পাইব তাহা বিধাতাই জানেন। মাঘও গেল, ফাল্গুনও যায় যায়, উনি বম্বে হইতে আসিয়া দেশে যান। ২৩ ফাল্গুন রাতে আমার একটি কন্যা সন্তান হয়, আমি মা হইলাম, রমণী জীবনের এই শেষ পরিণতি, ইহাতেই রমণী মহিমাময়ী, এইখানে প্রেম পূর্ণতা লাভ করে, দুইটি হৃদয়কে এক করিয়া দেয়। পরদিন উনি আসিলেন, মা কত আনন্দে তাঁর সেই ছোট নাতনিটিকে ওনার কোলে দিলেন, সেই সুন্দর ফুলের মত ছোট কন্যাটিকে দেখিয়া আমারও যে আনন্দ হয় নাই তাহা নয়। শিশুর সুন্দর মুখশ্রীতে আমি বিশ্বসৌন্দর্য্যের আভাস পাইতাম, মনে মনে স্বর্গসুখ ভোগ করিতাম। আমি আমার সুখস্বপ্নে মগ্ন আছি এমন সময়ে ১৬ চৈত্রে জননীকে অশেষ ক্লেশ দিয়া তাঁর এক পুত্র ভূমিষ্ট হইল। পরে ২১ দিনে যথাবিহিত ষষ্ঠী পূজা হইয়া গেলে একদিন নিশীথে মার গায়ে হাত দিয়া দেখি ভয়ানক গরম। সেই গরম আমার হৃদয়ে যেন বৈদ্যুতিক আঘাত করিল আমি বলিলাম — মা, তোমার গা এত গরম কেন? মা বলিলেন - আমার বড় জ্বর হইয়াছে ও ঘাড়ে এত ব্যথা যে আমি উঠিতে পারিতেছি না। আমার ভগ্নীকে উঠাইয়া আগুণ করিয়া তাপ দিতে দিতে ক্রমে নিশা অবসান হইল, প্রভাত সমীরণের শীতল স্পর্শে চিন্তাক্লিষ্ট প্রাণে শান্তি আসিল। মার ব্যথা একটু উপশম হওয়ায় মা উঠিয়া হাত মুখ ধুইলেন। পরে ডাক্তার আসিয়া মায়ের হাত দেখিয়া বলিল — নাড়ীর গতি বড় এলোমেলো তোমরা ভাল ডাক্তার ডাকাও - এই বলিয়া হোমিওপ্যাথিক ঔষধ দিয়া চলিয়া গেল। ঔষধও পথ্য খাওয়ান হইল, বৈকালে ঘর্ম হইয়া জ্বর ত্যাগ হইয়া গেল। পরদিন একটু ডালের জুস ও ঔষধ খাওয়ান হইল সন্ধ্যার সময় পুনরায় জ্বর প্রবল হইল ও বড় ডাক্তার ডাকান হইল। ডাক্তার আসিয়া বুক পরীক্ষা করিয়া নিউমোনিয়া হইয়াছে বলিয়া ঔষধ দিয়া চলে গেলেন। আমি মার কাছে আসিয়া দেখি মা প্রলাপ বকিতেছেন, আমাকে জোরে ডাকিয়া ওনার নাম করিয়া বলিলেন — সে আসিয়াছে তাহার খাবার দেখিয়া দেও। আমি কপালে করাঘাত

করিলাম, কে যেন আমার মনের ভিতর বলিতে লাগিল মা আর বাঁচিবেন না। এই মনের ভাব কিছুতেই মন হইতে দূর করিতে পারিলাম না। চিকিৎসা চলিতে লাগিল রোগ উপশম না হইয়া ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ১২ দিনের দিন সকাল বেলা মার কাছে বসিয়া আছি এমন সময় মার জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। মা আমাকে আরও নিকটে ডাকিয়া হাত তুলিলেন। হাত কাঁপিতেছে দেখিয়া মার হাত আমার হাতের ভিতর লইলাম, আমার চোখের জলে মার হাত ভিজিয়া গেল, মা আমাকে বলিলেন — তুমি কাঁদিতেছ কেন আবার আমি সেরে উঠব, আবার বল পাব, তুমি জল খেয়ে এসে আমার কাছে বস। আমি বলিলাম - আমি খেয়েছি। মা বলিলেন - কেন মিথ্যে কথা বলিতেছ তোমার মুখ শুখনো, যাও খেয়ে এস। অগত্যা উঠিয়া গিয়া যৎকিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া আবার মার কাছে আসিয়া বসিলাম। ক্রমে বেলা বাড়িতে লাগিল। একে বৈশাখ মাস, তাহাতে বেলা দ্বিপ্রহর, মা জ্বালায় ছটফট করিতে লাগিলেন। উত্তাপ পরীক্ষা করায় দেখা গেল ১০৭ ডিগ্রি জ্বর। জ্বালায় মা অস্থির হইয়া বলিতে লাগিলেন — এ দাহ জ্বালা সহিতে পারে না বালা।

তখন মা অর্দ্ধ জ্ঞানশূন্য। কিছুক্ষণ এই জ্বালা সহ্য করিবার পর যখন রৌদ্রের তেজ কমিয়া আসিল তখন মার জ্বালাও কথঞ্চিৎ উপসম হওয়ায় তিনি নিস্তব্ধ হইলেন। ক্রমে যখন রাত ৮টা বাজিল তখন ডাক্তার জ্বর পরীক্ষা করিয়া বলিলেন ১০৮ ডিগ্রি - দেখিতে দেখিতে তাহা ৯ ডিগ্রিতে পরিণত হইল। তখন সব ডাক্তাররা বসিয়া বলাবলি করিতে লাগিলেন যে এত উত্তাপে লোকের প্রাণ থাকে না, এই জ্বর ত্যাগের সময় প্রাণ বিয়োগের আশঙ্কা। আমি এই কথা শুনিতে শুনিতেই অবসন্ন হইয়া ঘরের মেজের উপর শুইয়া পড়িলাম। সেই ঘরে মা খাটের উপর ছিলেন।

কিছুক্ষণ পরে আমার ভগিনীর আকুল ক্রন্দনে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, তাড়াতাড়ি উঠিয়া দেখি মার চোখের তারা ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে পেটও ফাঁপিয়াছে, ডাক্তার সেই জন্য টারপেনাণ্টাইন খাওয়াইতেছিল কিন্তু মা সেটুকু তখন গলধঃকরণ করিতে পারিতেছেন না। বাবামহাশয় তাড়াতাড়ি ডাক্তার বেহারি বাবুকে ডাকিতে গেলেন। ডাক্তার আমাকে মার পা ধরিতে বলিলেন। ঐরূপ দুই তিনটা ফিটের পর মার শ্বাস আরম্ভ হইল। তখন ডাক্তার নীচে নামিয়া গিয়া বলিলেন — দেখি বেহারি বাবু আসছেন কিনা - এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

আমরা ভাই ভগ্নি কজনে প্রাণের কাতরতায় কেবল ঘর বাহির করিতেছি এমন সময় বাবামহাশয় বেহারি বাবুকে লইয়া আসিলেন। ডাক্তার মাকে দেখিয়াই ঘর হইতেই বাহির করিতে বলিয়া চলিয়া গেলেন। আমার ছোট ভাই বোনেরা সব চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। যখন বাবামহাশয় ও দাদা মাকে খাট হইতে নামাইতেছিলেন তখন আমার চোখে জল নাই, ঠিক যেন যন্ত্রচালিতের ন্যায় মায়ের শয্যার এক অংশ ধরিয়া মাকে ছাদে উন্মুক্ত আকাশের তলে লইয়া শোয়াইলাম। মুখের দিকে চাহিয়া দেখি মার চক্ষু তখন অর্দ্ধ নিমিলিত, প্রাণ দেহ পরিত্যাগের জন্য ঊর্দ্ধে উঠিতেছে। আমি তখন রোরুদ্যমানা ছোট ভগ্নিটিকে বলিলাম — আয় কাঁদবার অনেক সময় আছে এখন মার আত্মার কল্যাণের জন্য ঈশ্বরকে প্রাণ ভরিয়া ডাকি — এই বলিয়া করযোড়ে কাতরে মায়ের মাকে ডাকিয়া তাঁর কোলে আমার মাকে দিলাম। ফিরিয়া আসিয়া দেখি তখন মার প্রাণ দেহ পরিত্যাগ করিয়া অমর ধামে চলিয়া

গিয়াছে, আর শূন্য দেহ পড়িয়া আছে। তখন আকুল হইয়া আমার বুক ফাটিয়া চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল, কোনমতে কম্পিত হস্তে আলতা সিঁদুর প্রভৃতি দিয়া মার মৃতদেহ সাজাইয়া দিলাম, মাকে লইয়া গেল। স্বর্গপ্রতিমা দগ্ধ হইতে চলিল, আমি দগ্ধ হৃদয়ে গৃহে পড়িয়া রহিলাম। দুই দিন শোকে দুঃখে কাটিয়া গেল। আমাদের কাঁদিতে দেখিলে বাবামহাশয় নিষেধ করিয়া বলিতেন — কাঁদিও না, কাঁদিলে মৃত আত্মার ক্লেশ হয়।

মার মৃত্যুর পর তিন দিনের দিন রাত্রে আমি এক আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম তাহা পর অধ্যায়ে স্বপ্ন কাহিনীতে লিপিবদ্ধ করিয়াছি, সেইজন্য আর এখানে তাহার পুনরুল্লেখ করিলাম না। পরদিন চতুর্থী; কন্যার কর্ত্তব্য শেষ করিলাম। পাঁচ দিনের দিন আমি একটি কবিতা লিখিয়াছিলাম তাহা এইখানে উদ্ধৃত করিলাম —

পাঁচটি দিবস গত হইল জননি
দেখিনে তোমার মাতঃ চরণ দুখানি।
ক্ষণেক তোমার কাছে হইলে অন্তর
মনে করিয়াছ মাগো যুগযুগান্তর।
এখন মোদের ছাড়ি, হইয়ে অন্তর
কেমনে রয়েছ মাগো বল নিরন্তর?
কত অপরাধ মাগো করিয়াছি আমি
তাই কি মোদের ছেড়ে চলে গেলে তুমি?
এজনমে আর কি মা করিব শ্রবন
স্নেহ মাখা তোমার সে মধুর বচন?
আর কি কোলেতে শুয়ে জুড়াব জীবন,
আর কি দেখিতে পাব তোমার আনন?

২

দুখেতে কাতর হলে সান্ত্বনাদায়িনী
এমন কাহারে আর পাইব জননী?
অধম তনয়া মাগো আমি যে তোমার
কৃপা করি অপরাধ ক্ষমিও আমার।
যতদিন রবে মাগো এদেহে জীবন
তাবৎ পূজিব মাগো তোমার চরণ।
বসাইয়া তব মূর্ত্তী মানস আসনে
ভক্তি ফুলহার দিয়া পূজিব যতনে।

মাতৃ বিয়োগে আমার বিবাহিত জীবনের আনন্দ ও সুখ অর্দ্ধেক চলিয়া গেল। তখন বুঝিলাম যে মানব এ সংসারে কখন নিরবচ্ছিন্ন সুখ ভোগ করে না। চতুর্দ্দশ বৎসরের বালিকার হর্ষোৎফুল্ল জীবনকে শোকের আঘাতে বিপর্য্যস্ত করিয়া দিল। এই সময় হইতে প্রায়ই আমি শোকের আঘাত পাইয়া চলিলাম, আমার শৈশব জীবনের স্মৃতিও এইখানে শেষ করিলাম। আমার জীবনের আর সব অধ্যায় অপরের কোন কাজে আসিবে না তাহা আমাতেই রহিয়া গেল। সেই দুঃখময় অপূর্ণ কৃষ্ণ-অধ্যায় খুলিয়া কাহার নিকট ধরিব, তাই এইখানে ইতি করিলাম।

আমার হৃদয়ের গভীর ভক্তি ও প্রণতির সহিত স্বর্গীয় পতিদেবতার চরণে আমার রচনা ও স্বপ্ন কাহিনী উৎসর্গীকৃত হইল —

দেব !

তুমি স্বর্গে আমি মর্ত্তে, আমি ইহলোকে তুমি পরলোকে, বাহির হইতে দেখিতে গেলে তোমাতে আমাতে বহুদূরে অবস্থান করিতেছি কিন্তু আমার অন্তরের নিভৃত আসনে তুমি চির বিরাজিত, বাহিরের কোলাহল সেখানে পশেনা।

তুমি আমার আরাধ্য দেবতা ও আমি তোমার চির সেবিকা এই সম্পর্ক আমাদের কেহই ছিন্ন করিতে পারিবে না। আমরা যখন দুইজনে ইহলোকে ছিলাম তখন কোন কথা বলিতে হইলে বাক্যের দ্বারা প্রকাশ না করিলে তুমি জানিতে পারিতে না, আর এখন মনের কথা মনে না উঠিতেই তুমি তাহা জানিতে পারিতেছ। আমার ইচ্ছা ছিল আমার এই খাতা হাসিতে হাসিতে তোমার হাতে দিব কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ। এখন এ খাতা তোমার হাতে দিব সে শক্তি আমার নাই, তাই অশ্রু জলের সহিত আমার এই খাতাখানি শেষের সম্বল তোমার চরণে উপহার দিলাম। মূল্যহীন জিনিষ মূল্যবান হয় যখন তাহা ভালবাসায় উজ্জ্বল হয়।

আমার স্বপ্নকাহিনী

(১)

আমার মাতৃবিয়োগের দুই দিনের পরের রাত্রে আমি যখন কাঁদিয়া কাঁদিয়া ক্লান্ত হইয়া নিদ্রিত হইয়াছিলাম সেই সময়ে স্বপ্ন দেখিলাম যে একজন কৃষ্ণ পরিচ্ছদে আপাদমস্তক আবৃত লোক আসিয়া আমার হাতে একখানি পত্র দিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। আমি কাগজখানি উল্টাইয়া পাল্টাইয়া তাহাতে কিছুই লেখা দেখিতে পাইলাম না, তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম -

আমি ত এতে কিছু দেখিতে পাইলাম না, তুমি কে?

তদুত্তরে সে জলদগম্ভীর স্বরে বলিল -

তোমার মা তোমাকে ডাকিয়াছেন তাই তোমাকে জানাইতে আসিয়াছি।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম - আমার মা কোথায়?

তাহাতে সে উত্তর করিল -

আমার সঙ্গে এস!

আমি তখন বিনা বাক্যব্যয়ে তাহার অনুগমন করিলাম। ঘরের বাহির হইয়া আমার দেহে একটা প্রবল আকর্ষণ অনুভব করিতে লাগিলাম, তখন বুঝিলাম সে আমাকে লইয়া শূন্যে উঠিতেছে।

অনন্ত নক্ষত্রখচিত নীলাকাশের মধ্য দিয়া আমাকে লইয়া চলিতে চলিতে হঠাৎ সে উর্দ্ধ হইতে নিম্নে অবতরণ করিবার ভাবে দাঁড়াইল। সম্মুখে এক প্রকাণ্ড শ্বেত প্রস্তরের অট্টালিকাও এক সূক্ষ্ম কৃষ্ণবর্ণের রেশমি বস্ত্রের যবনিকা দেখিতে পাইলাম। সে যবনিকার মধ্যে প্রবেশ করিল, আমি দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া রহিলাম। সে অল্পক্ষণ পরে আসিয়া দুই হস্তে যবনিকা সরাইয়া দিলে দুইভাগে বিভক্ত হইয়া গেল এবং অট্টালিকার মধ্যস্থিত কক্ষ প্রকাশ পাইল। দেখিলাম তাহা মর্ম্মর প্রস্তর নির্ম্মিত ও তাহার মধ্যস্থলে লাল মখমল মণ্ডিত সিংহাসন সদৃশ একখানি

কৌচ। সেই কৌচের উপর আলুলায়িত কুন্তলা শুভ্রবসনা জ্যোতির্ম্ময়ী জননী দেবী — বামপার্শ্বে এক জ্যোতির্ম্ময়ী রমণী উপবিষ্টা এবং দক্ষিণ পার্শ্বে আর এক তদ্রূপ রমণী দণ্ডায়মানা; উভয়ই অপরিচিতা। এই দৃশ্য আমি অবাক হইয়া দেখিতেছি এমন সময়ে মা আমায় হাসিয়া বলিলেন —

. তুমি কাঁদ তাতে আমার বড় ক্লেশ হয়, দেখ আমি এখন কেমন সুখে আছি আর আমার কোন কষ্ট নাই, আগে আমি রোগে বড় কষ্ট পাইয়াছিলাম দেখ এখন আমি কেমন শরীর পাইয়াছি। তুমি আর কাঁদিও না, তুমি কি মনে কর তুমি আমার জন্য কাঁদ? তা নয়, তুমি তোমারই জন্য কাঁদ এখন বুঝিলে ত, যাও —

মার মুখ হইতে যেই - যাও - কথাটি বাহির হইল আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।

(২)

একরাত্রে স্বপ্ন দেখিলাম যে একটি সুন্দরী স্ত্রীলোক লৌহনির্ম্মিত এক গেটের ধারে দাঁড়াইয়া আছে। সে গেটটির এমন ভীষণ আকৃতি যে তাহা দেখিলেই ভয় হয়, তাহার ভিতর দিয়া প্রবেশ ত দূরের কথা। সে গেটের লম্বা লম্বা শিকের আগাগুলি খুব ধারাল এবং তাহা এত ঘন-সন্নিবিষ্ট যে তাহার ভিতর একটা হাতও প্রবেশ করান যায় না। সেইখানে আমি কিছুক্ষণ দাঁড়াইবার পর সেই স্ত্রীলোকটি আমায় বলিল - মা, তুমি এর মধ্যে যাও।

আমি তাঁহাকে নাম জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন - আমার নাম সুখদা।

কিন্তু ভয়ে আমি কিছুতেই ভিতর যাইতে চাহিলাম না, তিনিও ছাড়িবেন না। অবশেষে তিনি বলিলেন - দেখ উপরে কত লোক আছে, সকলেই এই পথে গিয়াছেন তুমিও যাইতে পারিবে, যাও।

তখন আমি ভয়ে ভয়ে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া তাহার ভিতরে প্রবেশ করিলাম এবং পরে চাহিয়া দেখিলাম যে অক্লেশেই তাহা পার হইয়া আসিয়াছি। সম্মুখে দেখিলাম একটি সরল সোপানশ্রেণী, তদুপরি আর একটি স্ত্রীলোক দণ্ডায়মানা রহিয়াছেন। তিনি অপেক্ষাকৃত কৃশ ও আরও সুন্দরী; আমায় দেখিয়া হাসি মুখে উপরে যাইতে বলিলেন। আমি সেই সোপান অতিক্রম করিয়া যখন উপরে পৌঁছিলাম তখন তিনি সাদরে আমার হাত ধরিয়া লইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া আমার ভক্তি হইল, আমি তাঁহাকে প্রণাম করিয়া নাম জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন - আমার নাম মোক্ষদা। উপরে যাইয়া এমন একটা আলো দেখিলাম তাহার কাছে বিজলিও হার মানে, তাহা যেমন উজ্জ্বল, তেমনি স্নিগ্ধ, এক কথায় বর্ণনা হয় না। নানাজাতীয় ফুলের গন্ধ ও সুখস্পর্শ সমীরণে আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। আমি যে শয্যায় সেই শয্যায় রহিয়াছি, তখন আমার মনে হইল -

"আমি যে তিমিরে
আমি সে তিমিরে"

(৩)

আর একদিন নিশীথে স্বপ্ন দেখিলাম যে একজন লোক কৃষ্ণ পরিচ্ছদে আপাদমস্তক ঢাকিয়া আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছে।

তুমি কে? কেন আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছ।

তাহাতে সে উত্তর করিল -

আমি মৃতকে লই ও জীবিতের পশ্চাৎ পশ্চাৎ থাকি, আমাকে চিনিতে পারিতেছ না?

আমি বুঝিতে না পারিয়া তাহার দিকে অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলাম। তখন সে আবার বলিল - আমায় চিনিতে পারিতেছ না? আমি কাল!

বলিয়াই হাসিল। তাহার সে হাস্যধ্বনি আমার বক্ষে আসিয়া বাজিল, আমি নীরবে চলিতে লাগিলাম, সেও আমার পশ্চাতে চলিল। কিয়দ্দূর যাইয়াই জনতার কোলাহলের শব্দ শুনিতে পাইলাম। আমি সবিস্ময়ে চাহিতে সে আমাকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া এক কৃষ্ণবর্ণের যবনিকা দেখাইল। আমি তাহার নিকট অগ্রসর হইয়া দেখিলাম যবনিকার অন্তরালে কত লোক আসিতেছে যাইতেছে। উর্দ্ধে চন্দ্রাতপ, নিম্নে এক উচ্চাসন, আসনে একজন উপবিষ্ট, তাহার আশেপাশে কত জনসমাগম। চতুর্দ্দিক এক অপূর্ব্ব আলোকে আলোকিত। অর্থ কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল তখন স্বপ্ন রহস্য বুঝিতে পারিলাম - মানুষের চিত্ত মোহনিদ্রায় অচেতন থাকে বলিয়াই এ বিশ্বরহস্য সুপ্তাবস্থায় বুঝিতে পারা যায়।

(৪)

আর একদিন স্বপ্নে দেখি - এক বিশাল প্রান্তরের একটি বড় বৃক্ষের ছায়ায় আমরা দুইটি প্রাণী, আমি ও একটি অপরিচিত রমণী বসিয়া ধর্মালোচনায় প্রবৃত্ত আছি। একথা সে কথার পর সে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আমাকে বলিল -

তুমি যাই বল আর তাই বল, ঈশ্বরকে কি জানা যায়, না বোঝাযায়? না দেখিয়া আমরা কি করে জানিতে বা বুঝিতে পারিব?

আমি বলিলাম - এই যে বৃক্ষের ছায়ায় বসিয়া আছি ইহার শাখাপ্রশাখা সবইত দেখিতে পাইতেছ?

তাহাতে সে বলিল - হাঁ ইহা ত আমি চোখের সামনে দেখিতেছি, ইহাকে আমি কি করিয়া বলিব - নাই?

আমি বলিলাম - ভাল, এই যে বৃহৎ বৃক্ষ রহিয়াছে ইহার মূল কি তুমি দেখিতে পাইতেছ?

সে বলিল - না!

আমি বলিলাম - বেশ, এই গাছের যে মূল আছে তা তুমি জান ত, এবং এটাও বেশ বোঝ যে গাছ থাকিলে তাহার মূল থাকিবেই। তেমনি এই জগতের কার্য্য দেখিয়া ও নিজের আত্মাকে উপলব্ধি করিয়া আমরা কারণরূপে মূলে ঈশ্বরকে বুঝি, এই বোঝাই আমাদের ঈশ্বরকে দর্শন করা।

সে বলিল - এই গাছের গোড়া খুঁড়িলেই মূল দেখিতে পাইব, কিন্তু ঈশ্বরকে কি করিলে পাইব? তখন আমি বলিলাম যে তুমি কি এই গাছের গোড়া খুঁড়িয়া মূল বাহির করিবার শক্তি ধর?

তাহাতে সে বলিল - না।

আমি বলিলাম - তবে?

তাহাতে সে বলিল - যদি সে শক্তি লাভ করি তবে ত পারিব।

আমি বলিলাম - নিশ্চয়, আমি তাহা স্বীকার করি। আমরা এই জগতের তাবৎ পদার্থের

মূল যদি জ্ঞানের দ্বারা খনন করিতে পারি তখন দেখি যে সকলেরই মূলে ঈশ্বর। তবে আমাদের খননের শক্তি নাই বলিয়া আমরা কেন বলিব যে ঈশ্বরকে জানা যায় না বা দেখা যায় না।

আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। অবাক হইয়া ভাবিলাম - স্বপ্নে আমাকে এসব যুক্তি কে দিলে? - ভাঙ্গিয়া হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইল।

জ্ঞান ও প্রেমের মিলন

জ্ঞান ও প্রেম উভয়ই আমাদের মনুষ্যজীবনের সাধনার বস্তু। প্রেম প্রথম স্তর। প্রেম মানুষকে জ্ঞানেতে পৌঁছাইয়া দেয়। প্রেম প্লাবন আনে, সেই প্লাবনে হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতা ও পাপ মলিনতা ধুইয়া হৃদয়কে পবিত্র করে ও জ্ঞানসাগরে মিশিয়া যায়। তখন আর প্রেমের পৃথক অস্তিত্ব থাকে না। এই জ্ঞানে ও প্রেমে যোগ সাধন করিতে হইলে আমাদের প্রথম অবলম্বনীয় প্রেম। প্রেমই আমাদিগকে ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করায়। পশুতে মনুষ্যোচিত চিত্তবৃত্তি অল্প বিস্তর দেখা যায়, তবে পশুতে ও মানুষে পার্থক্য কোথায়? পশুরা লক্ষ্যশূন্য যন্ত্রচালিত ভাবে বিশ্বনিয়মের অধীন জন্ম মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়। আর আত্মজ্ঞান লাভ করাই মনুষ্য-জীবনের লক্ষ্য এবং সফলতা। মনুষ্য হইয়া যদি আত্মজ্ঞান লাভ করা না যায় তবে মনুষ্যতে আর পশুতে পার্থক্য থাকেনা। প্রেমের মত এমন হিতকর বন্ধু আর আমাদের কে আছে? পাপ মলিনতাকে ধুইয়া, পথের লোককে বুকে তুলিয়া লইতে, সঙ্কীর্ণতাকে প্রসারিত করিতে, গর্ব্বিত মস্তককে সকলের কাছে নত করিতে, কেবল বিশুদ্ধ প্রেমই পারে। শক্তির ন্যায় প্রেম অপূর্ণ থাকিতে পারে না কেবলই পূর্ণতার দিকে চলিয়াছে। তড়িৎ যদি একটা মেঘে বেশি থাকে ও অপরে কম থাকে দুইটা মিশিয়া এক হইতে চায় - তখন বিজলী চমকিতে দেখিতে পাই। প্রেমেও সেইরূপ দুটা হৃদয়কে এক করিয়া দেয় ও সেই মিলন দেখিয়া লোকে চমকিত হয়। যেখানে প্রেমের বন্য আসে তাহার আশে পাশে সকলকেই ভাসাইয়া লইয়া চলিয়া যায়। চৈতন্যকে প্রেমের অবতার বলা হয় কারণ চৈতন্যই প্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি যেখানে যেখানে গিয়াছিলেন সেই সেই স্থানের সকলকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিলেন। পাপী পুণ্যবান সকলেই তাঁহার বক্ষে স্থান পেয়েছিল। তাঁহার গতি ছিল জ্ঞান সাগরে, তিনি তাহাতেই মিশিয়াছিলেন।

প্রেমেতে আত্মহারা করে, এই আত্মহারা ভাবই যোগের চরম উৎকর্ষতা। প্রেমের বেগ কেহই রোধিতে পারে না। মত্তমাতঙ্গসদৃশ আমাদের ইন্দ্রিয় বৃত্তির সাধ্য কি প্রেমের গতিকে রোধ করিতে পারে? অন্যান্য সদ্‌বৃত্তির অনুশীলনে অল্পে অল্পে চিত্তশুদ্ধি হইয়া থাকে কিন্তু প্রেমে অতি শীঘ্রই পাপ মলিনতাকে ধুইয়া পুঁছিয়া লইয়া যায়। তাই প্রেমের পথ সরল। প্রেমকে বিশুদ্ধ করাই প্রেমের সাধনা প্রেমেতে যাহাতে স্বার্থপরতার খাদ না মেশে তাহাই করা উচিত; আর যদি মিশিয়া থাকে তবে তাহাকে নিবৃত্তির আগুণে গলাইয়া খাঁটি করিতে হয়। প্রেমের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিলে নিঃসন্দেহ আত্মজ্ঞানলাভ করিবে ও আত্মার অন্তরতম জ্ঞানস্বরূপ ঈশ্বরের বিমলানন্দে মগন হইবে।

ফুল

ফুল! আমি তোমায় বড় ভালবাসি, এত সৌন্দর্য্য আর কিছুতেই দেখিতে পাই না। ঈশ্বর তোমাকে কোমলতা ও পবিত্রতার আধার করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন? আমার হৃদয় মনের কান্তি আমি তোমাতেই দেখিতে পাই, তাই তোমার দিকে আমি অবাক হইয়া চাহিয়া থাকি; তোমার

রূপে আমায় মোহিত করিয়াছে। আমার আরাধ্য দেবতার কণা মাত্র রূপ তোমাতে আছে কিনা সন্দেহ, এতেই তুমি এত সুন্দর, না জানি তোমার সৃষ্টিকর্তার কত রূপ! ফুল তুমি কেমন নীরবে ফুটিয়া বিশ্বস্রষ্টার কাজ করিয়া যাইতেছ আমার বৃথা আড়ম্বর পূর্ণ জীবনকে তোমার মত ফুটাইয়া তাঁহার কার্য্য করিয়া মরিতে ইচ্ছা করিতেছি। ফুল! তুমি আমার শিখাও কি করিলে তোমার মত জীবন পাইব। তোমাকে আমি বালিকাকাল হইতে ভালবাসি, তখন তুমি আমার সঙ্গিনী ছিলে তখন তোমায় লইয়া কত খেলাই করিয়াছি। ফুল লইয়া তরঙ্গিনী বক্ষে ফেলিয়া দিতাম ঢেউয়ে যখন ফুলটিকে নাচাইতে নাচাইতে লইয়া যাইত তখন মনে এই প্রশ্ন হইত যে, ইহারা কাহার উদ্দেশে কোথায় যাইতেছে; এখনও সেই প্রশ্ন ধ্বনিত হইতেছে অনল, অনিল, গিরি, নদী, বন বক্ষে লইয়া কাহার উদ্দেশে পৃথিবী ধাবিত হইতেছে। আমাদের আত্মা প্রেম ভক্তি উপহার লইয়া কাহার চরণ উদ্দেশে যাইতেছে? ফুল! তুমি কি বলে দিতে পার যে ইহারা কাহার উদ্দেশে কোথায় যাইতেছে, তুমি ছেলেবেলায় আমার সঙ্গিনী ছিলে এখন আমার জীবন সঙ্গিনী হইয়াছে আমাকে তোমার মত হইতে শিখাও। ফুল! তুমি আমায় বলে দিতে পার আমার হৃদয়েশ্বর কোথায় লুকাইয়াছেন? যখন দেখি প্রভাতের সূর্য্য অরুণ রাগে রঞ্জিত হইয়া পূর্ব্বাকাশে উদিত হইয়াছে অমনি ছুটিয়া যাই ও মনে করি বুঝি আমার হৃদয়রাজকে চুরি করিয়া রাখিয়াছে তাই এত সুন্দর দেখাইতেছে। সূর্য্য আমার দিকে চক্ষু রাঙ্গাইয়া বলিতেছে -

নতত্র সূর্য্যোভাতি ন চন্দ্র তারকম্
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোহয়মগ্নিঃ
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাষা সর্ব্বমিদং বিভাতি

এমনি করিয়া যাহার কাছে যাই সেই আমায় বলে - কাহার সাধ্য তাঁহাকে দেখা, তিনি আমাদের সকলের মূলে থাকিয়া আমাদিগকে প্রকাশ করিতেছেন। ফুল! তুমি আমায় বলে দেও আমার জীবন সর্ব্বস্ব কোথায় আছেন। কৈ, তুমি আমায় কিছু না বলিয়া কেবল হাসিতেছ; হাস, আমি পাগলিনী আমার হৃদয়মণি আমায় পাগল করিয়া কোথায় লুকাইয়া আছেন তাই খুঁজিতে আসিয়াছি; দেখি তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারি কি না, চিরজীবন খুঁজিয়া দেখি মৃত্যুকালে দেখা পাই কিনা।

পূর্ণিমার ইন্দু

পূর্ণিমার ইন্দু সকলেরই আনন্দপ্রদ। প্রেমিকের, ভক্তের, কবির সকলের হৃদয়ে আনন্দ প্রদান করে। শশাঙ্ককে দেখিলে কবির হৃদয়ের রুদ্ধদ্বার মুক্ত হইয়া কল্পনার উৎস খুলিয়া যায়, ভাবের প্রস্রবন ছুটিতে থাকে। দম্পতির হৃদয়ের রুদ্ধ ভালবাসা উভয়ের হৃদয়ে নীরবে কার্য করিতে থাকে; পূর্ণিমার ইন্দুকে দেখিয়া প্রণয়ীর পবিত্র প্রণয় একের হৃদয় হইতে অপরের হৃদয়ে বিদ্যুৎগতিতে মিশিতে চায়। তাহাতে এক উচ্ছাসময়ভাবে উভয়ে মোহিত হইয়া ওঠে। তখন তাহারা স্বপ্নরাজ্য রচনা করিয়া তাহাতে বাস করে এবং মুহূর্ত্তের জন্য পবিত্র স্বর্গসুখ ভোগ করিয়া থাকে। ভক্তের হৃদয় চন্দ্রের বিমল জ্যোৎস্নায় পুলকিত হইয়া ওঠে তখন তাহার হৃদয় সৌন্দর্য্যের খনি হৃদয়মণি ঈশ্বরকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া ওঠে। তখন সে বাহ্যদৃষ্টি

পরিত্যাগ করিয়া অন্তরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, তখন সে হিরণ্ময়ে পরে কোষে নিষ্কলঙ্ক প্রেমচন্দ্র নিরীক্ষণ করিয়া কৃতার্থ হয়। (১)

কিন্তু ইন্দু বিরহী হৃদয়ে বিচ্ছেদ জনিত দুঃখ দ্বিগুণিত করিয়া তোলে। পূর্ণিমার চন্দ্রকে দেখিলে প্রিয়জনের প্রেমপূর্ণ আনন বিরহীর হৃদয়ে জাগিয়া উঠে, তখন তাহার মন ব্যাকুল হইয়া পড়ে তড়িতের মত ভাব হৃদয় হইতে বাহির হইবার জন্য আঘাত করিতে থাকে, প্রিয়জন কাছে নাই একাকী আনন্দ ভোগ দুখভোগের কারণ হইয়া উঠে - তখন তাহার হৃদয় হইতে এই বাক্য বাহির হয় : —

আমারি মত হৃদয় ব্যথা তার কিগো হয়
কাছে নাহি প্রিয়জন সুধাইব যায় —

মনুষ্যের স্বভাবতঃ এমন একটি গুণ আছে সে ভালবাসার পাত্রকে ছাড়িয়া একাকী কোন আনন্দ ভোগ করিতে চায় না, এইজন্য চন্দ্রমা বিরহীর বিচ্ছেদ ব্যথা আরও জাগাইয়া দেয়। চন্দ্র তাহার ধার করা রূপে এত লোককে মুগ্ধ করিয়া থাকে। কিন্তু যে হৃদয়ে নিষ্কলঙ্ক প্রেম-চন্দ্র দেখিয়াছে তাহাকে আর বাহিরের চন্দ্র মুগ্ধ বা ব্যথিত করিতে পারে না।

ধ্রুবতারা

তারা! তুমি অনিমেষ লোচনে চাহিয়া আছ কার দিকে? কত অসংখ্য নিশা কালের গর্ভে গিয়াছে ও যাইবে, কে তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে? কত জীব আসিতেছে ও যাইতেছে তাহারও নির্ণয় করা যায় না। পৃথিবীর সকল ঘটনা তুমি দেখিয়াছ ও দেখিতেছ, এখনও প্রতি নিশায় ফুটিয়া মৃদু স্নিগ্ধ আলোক বিকীর্ণ করিয়া দিবাসমাগমে উষার অঞ্চলে মুখ লুকাইয়া কাহার সাধনায় মগ্ন থাক? তুমি কি আমার আরাধ্য দেবতা হৃদয়েশকে দেখিতে পাও? আমি বুঝিয়াছি, তুমি আমার সর্ব্বস্ব আমার জীবনমরণের সম্বল দরিদ্রের রত্নকে দেখ, আমার তাঁকে যে দেখিয়াছে তার কি আর চোখ পালটিবার শক্তি আছে? তাই তুমি স্থির নিশ্চল অনিমেষ লোচনে তাহারি দিকে চাহিয়া আছ। তারা! আমি জলে স্থলে ফুলে ফলে আমার প্রিয়তমের হাতের কার্য্য, তাঁহার সৌন্দর্যের আভাস পাইয়া চারিদিকে ছুটিতেছি, কোথাও তাঁর দর্শন মিলিতেছে না; তাঁহাকে যে দেখিয়াছে সেই আত্মহারা হইয়াছে তাহার কি আর নড়িবার শক্তি আছে সে স্থিরভাবে সেই করুণাময় পরমেশ্বরে আত্মসমর্পণ করিয়া থাকে তার কি আর সংসারের দিকে লক্ষ্য থাকে, সে তোমারি মত স্রষ্টার মুখের দিকে তাকাইয়া ঈশ্বরের কর্ত্তব্য কর্ম সমাধান করিয়া শেষে ঈশ্বরের চরণে আশ্রয় লাভ করিয়া থাকে। তিনি আত্মাতে পরমাত্মা রূপে, পূর্ণভাবে বিরাজ করিতেছেন। তারা! তুমি যখন মেঘের আবরণে - আচ্ছাদিত হও তখন তোমার স্নিগ্ধ জ্যোতি আর দেখা যায় না। মেঘ কাটিয়া যাইলে আবার তোমার অমল ধবল রূপ প্রকাশ পায়। মেঘ তোমায় কিছুই করিতে পারে না। তুমি যাহা তাহাই থাক, মেঘ কেবল আমাদের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করিয়া থাকে মাত্র। আমার এ হৃদয় মোহ মেঘে আচ্ছন্ন করিয়াছে আমি আর আমার হৃদয়রাজকে দেখিতে পাইতেছি না। আমার এ মোহ মেঘ কবে কাটিবে দয়াময়ের কৃপা পবন কবে প্রবাহিত হইবে, সেই আশাকেই সম্বল করিয়া যেন দয়াময়ের নাম করিতে করিতে শেষ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে পারি।

Price Rs 20
Vol 19. No 3

BIVAV
Special Winter issue 97
Published in Feb'98
INTERNATIONAL STANDARD
SERIAL NO ISSN 0970 -1885

Reg No. 30017/76
70th Issue

সংসদ- এর সেরা সংগ্রহ

বঙ্কিম রচনাবলী ১ (সমগ্র উপন্যাস)	১৩০.০০
বঙ্কিম রচনাবলী ২ (সমগ্র প্রবন্ধ ও রচনা)	৮০.০০
বঙ্কিম রচনাবলী ৩ (সমগ্র ইংরেজি রচনা)	৫০.০০
মধুসূদন রচনাবলী	১২৫.০০
দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী ১	৮৫.০০
দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী ২	১৫০.০০
গিরিশ রচনাবলী ১	৭৫.০০
গিরিশ রচনাবলী ২	৭৫.০০
গিরিশ রচনাবলী ৩	৮০.০০
গিরিশ রচনাবলী ৪	১৩০.০০
গিরিশ রচনাবলী ৫	৫০.০০
তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ ১	৮০.০০
তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ ২	৮০.০০
তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ ৩	১০০.০০

সাহিত্য সংসদ

৩২ এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড কলকাতা- ৭০০০০৯
ফোন:- ৩৫০৭৬৬৯/৩১৯৫